ডিজনেল্যাণ্ড

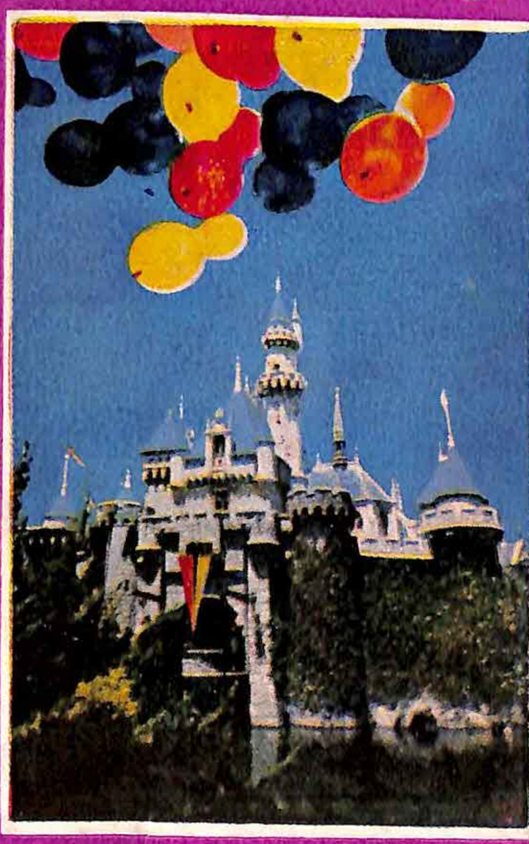


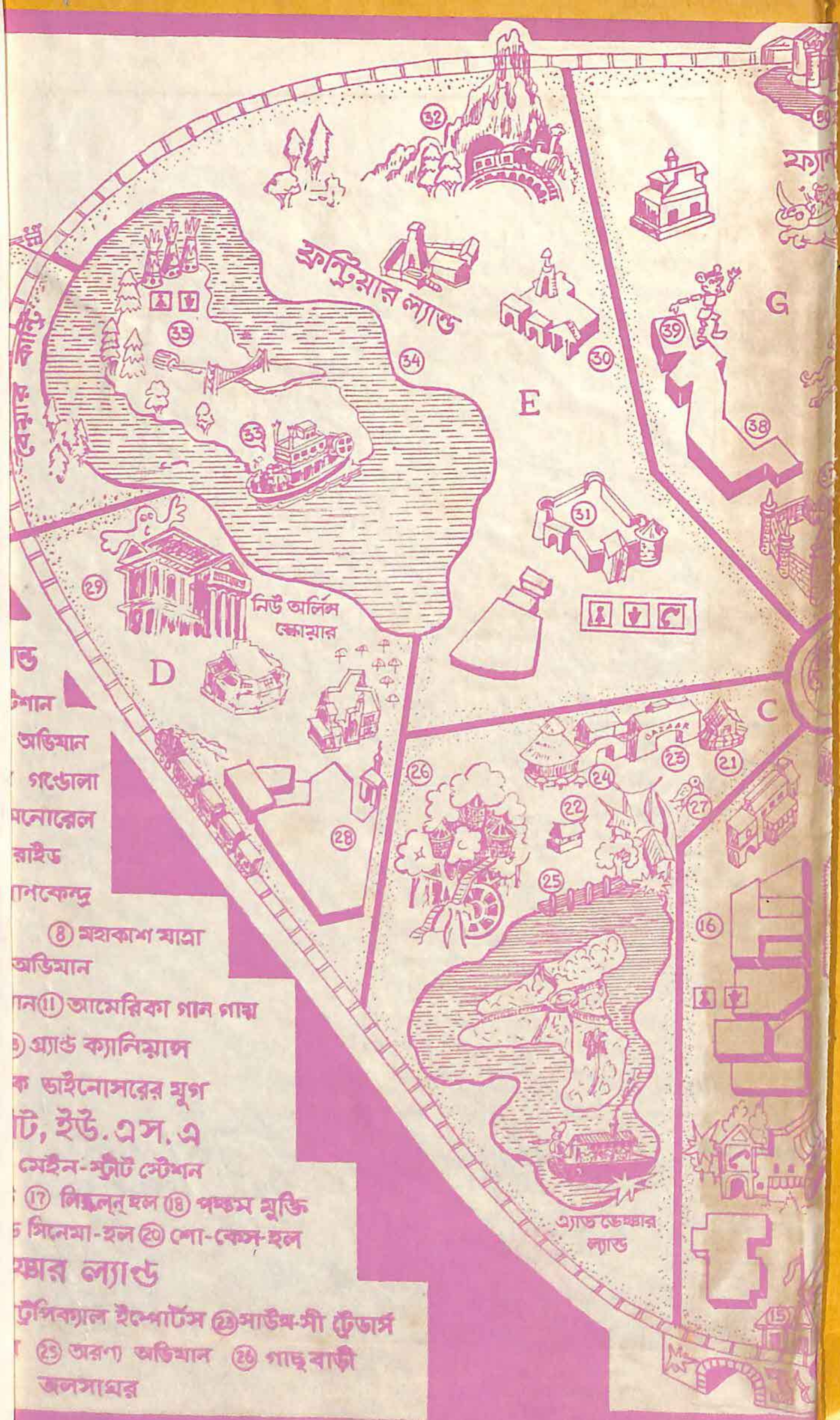
নারায়ণ সান্যাল



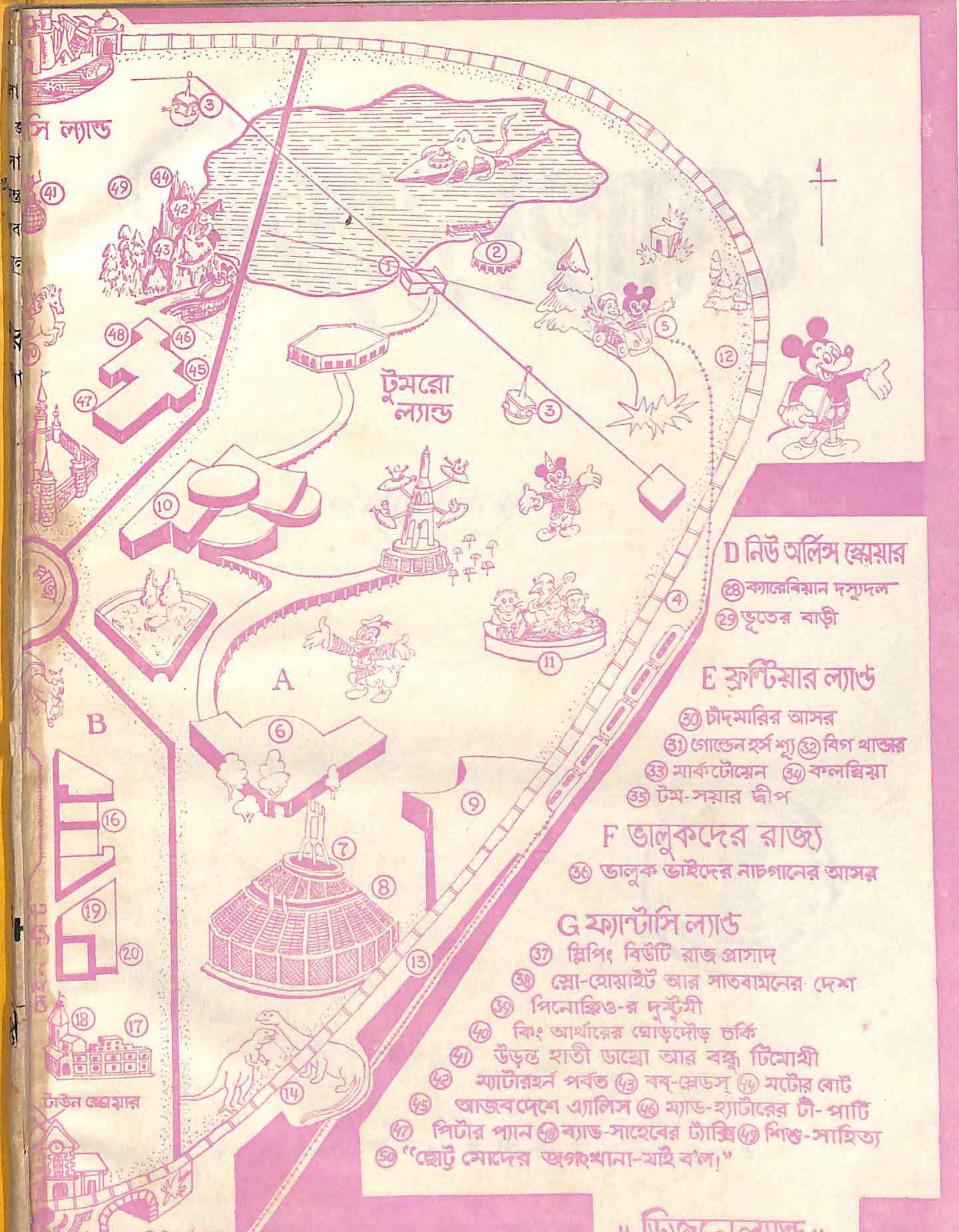








ফ্রন্টিয়ার ল্যান্ড
নিউ অর্লিন্স স্কোয়ার
এ্যাডভেঞ্চার ল্যান্ড
G
E
D
C
ন্ড
শান
অভিযান
গণ্ডোলা
মনোরেল
রাইড
াপকেন্দ্র
(8) মহাকাশ যাত্রা
অভিযান
ান (11) আমেরিকা গান গায়
গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন্স
ক ডাইনোসরের যুগ
াট, ইউ.এস.এ
মেইন-স্ট্রীট স্টেশন
(17) লিঙ্কন্ হল (18)
সিনেমা-হল (20) শো-কেস-হল
ঞ্চার ল্যাণ্ড
ট্রপিক্যাল ইম্পোর্টস (23) সাউথ-সী ট্রেডার্স
(25) অরণ্য অভিযান (26) গাছবাড়ী
জলসাগর


সি ল্যান্ড
টুমরো ল্যান্ড
A
B
টাউন স্কোয়ার
D নিউ অর্লিন্স স্কোয়ার
(28) ক্যারেবিয়ান দস্যুদল
(29) ভূতের বাড়ী
E ফ্রন্টিয়ার ল্যাণ্ড
(30) চাঁদমারির আসর
(31) গোল্ডেন হর্স শ্যু (32) বিগ থাণ্ডার
(33) মার্কটোয়েন (34) কলম্বিয়া
(35) টম-সয়ার দ্বীপ
F ভালুকদের রাজ্য
(36) ভালুক ভাইদের নাচগানের আসর
G ফ্যান্টাসি ল্যাণ্ড
(37) স্লিপিং বিউটি রাজ প্রাসাদ
(38) স্নো-হোয়াইট আর সাতবামনের দেশ
(39) পিনোক্কিও-র দুষ্টুমী
(40) কিং আর্থারের ঘোড়দৌড় চর্কি
(41) উড়ন্ত হাতী ডাম্বো আর বন্ধু টিমোথী
(42) ম্যাটারহর্ন পর্বত (43) বব্-স্লেডস্ (44) মটোর বোট
(45) আজব দেশে এ্যালিস (46) ম্যাড-হ্যাটারের টী-পার্টি
(47) পিটার প্যান (48) ব্যাঙ-সাহেবের ট্যাক্সি (49) শিশু-সাহিত্য
(50) "ছোট্ট মোদের অগৎখানা-যাই ব'ল।"

॥ ডিজ্‌নেল্যান্ড ॥

ডিজনেল্যাণ্ড

১৮

নারায়ণ সান্যাল

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
বইমেলা
জানুয়ারী, ১৯৮৬

রচনাকাল ঃ 1985

প্রকাশক ঃ
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ঃ
গৌতম দাসগুপ্ত

অলঙ্করণ ঃ
লেখক এবং
গৌতম দাসগুপ্ত

মুদ্রাকর ঃ
অশোককুমার চৌধুরী
চৌধুরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
পি-২১, সাত্যি পরিষদ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ-পরিচয়

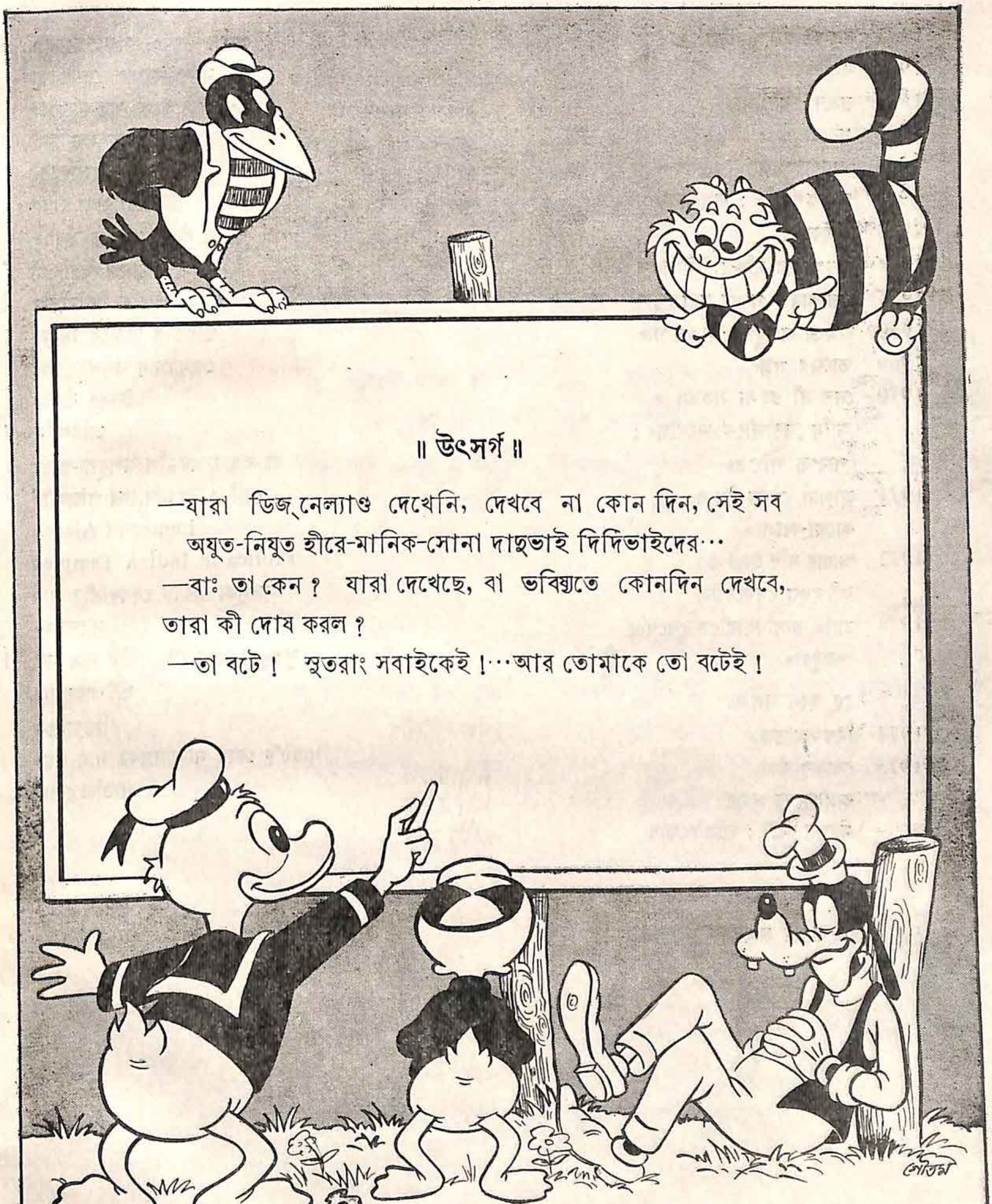
সামনের কভার ঃ

মিকি-মিনির মেইন স্ট্রীটে মার্কেটিং ; স্লিপিং-বিউটি প্যালেস ; ডিজ্‌নে।

পিছনের কভার ঃ

(উপরে) কলোরেডোর খাদ ; (মাঝে) ভূতালয়, আকাশ-চর্কি ; (নিচে) রেলরোডে জুরাসিক যুগ, মার্ক-টোয়েন জাহাজ।

দাম ঃ ২৫ টাকা


॥ উৎসর্গ ॥
—যারা ডিজ্‌নেল্যাণ্ড দেখেনি, দেখবে না কোন দিন, সেই সব
অযুত-নিযুত হীরে-মানিক-সোনা দাদুভাই দিদিভাইদের···
—বাঃ তা কেন ? যারা দেখেছে, বা ভবিষ্যতে কোনদিন দেখবে,
তারা কী দোষ করল ?
—তা বটে ! সুতরাং সবাইকেই !···আর তোমাকে তো বটেই !

'ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে'-এর অগ্রজ

1955 বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প
1958 বল্মীক
1858 ব্রাত্য ; বাস্তুবিজ্ঞান
1960 মনামী
1961 অরণ্যদণ্ডক
1962 দণ্ডকশবরী* ; অন্তর্লীনা*
1963 অলকনন্দা
1964 মহাকালের মন্দির, নীলিমায় নীল
1965 সত্যকাম ; পথের মহাপ্রস্থান*
1968 অজন্তা অপরূপা ; নাগচম্পা*
1969 তাজের স্বপ্ন*
1970 নেতাজী রহস্য সন্ধানে ;*
" আমি নেতাজীকে দেখেছি* ;
" পাষণ্ড পণ্ডিত*
1971 জাপান থেকে ফিরে*
কালো-কালো*
1972 আবার যদি ইচ্ছা কর
" কলিঙ্গের দেবদেউল
1973 আমি রাসবিহারীকে দেখেছি
" গজমুক্তা*
" হে হংস বলাকা
1974 বিশ্বাসঘাতক*
1975 সোনার কাঁটা
" অশ্লীলতার দায়ে
" মাছের কাঁটা ; লালত্রিকোণ

পথের কাঁটা*, পঞ্চাশোর্ধ্বে* 1976
নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা "
আজি হতে শতবর্ষ পরে "
চীন ভারত লঙ মার্চ 1977
হংসেশ্বরী "
প্যারাবোলা স্যার "
ঘড়ির কাঁটা* কুলের কাঁটা* 1978
আনন্দ স্বরূপিণী "
তিমি তিমিঙ্গিল 1979
ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন 1980
গ্রামোন্নয়ন কর্মসহায়িকা "
উলের কাঁটা* "
অরিগামি 1982
লা-জবাব্‌ দেহলি-অপরূপা-আগ্রা "
রোদ্যাঁ* না-মানুষের পাঁচালী* "
Immortal Ajanta "
Erotica in Indian Temples "
সুতনুকা একটি দেবদাসীর নাম "
রাস্কেল* "
সুতনুকা কোন দেবদাসীর নাম নয় 1985
ষাট-একষট্টি* "
মিলনান্তক "
নাটঘুঁচু কোন না-মানুষের নাম নয়* 1986
লাডলি বেগম "

* চিহ্নিত বই আমাদের প্রকাশনা



॥ এক ॥

মা ! পড়া হয়ে গেছে ।
এবার খেলতে যাই ?
অ্যাঁ ? কী বললে ?
...পড়া ধরবে ?
সেরেছে !



॥ দুই ॥

পড়া পারিনি বলে অত
বকছ কেন ?
বেশ তো —আবার না হয়
সবটা মুখস্থ করছি !



॥ তিন ॥

না, না— খেলার কথা তো
বলিনি ! বাঃ !
পড়া হয়নি, এখনি খেলা
কিসের ?...
এই তো, পড়তেই তো যাচ্ছি !



॥ চার ॥

"করালদংষ্ট্রা শৃগাল অথবা
শিকারী কুক্কুরে পশ্চাদ্ধাবন
করিলে..."
অ্যা...অ্যা...করিলে...



॥ পাঁচ ॥

কী করিতে হয় যেন ?
য্যাঃ ! আবার ভুলে গেছি !
বার বার ভুলে যাচ্ছি ! এত
গুব্‌লেট হয়ে যাচ্ছে কেন রে ?



॥ ছয় ॥

আবার না-দেখে মুখস্ত
বলি, "করালদংষ্ট্রা শৃক্কুর, অথবা
শিকারী কুগাল"—হেত্তেরি !
সব গুলিয়ে গেছে !



॥ সাত ॥

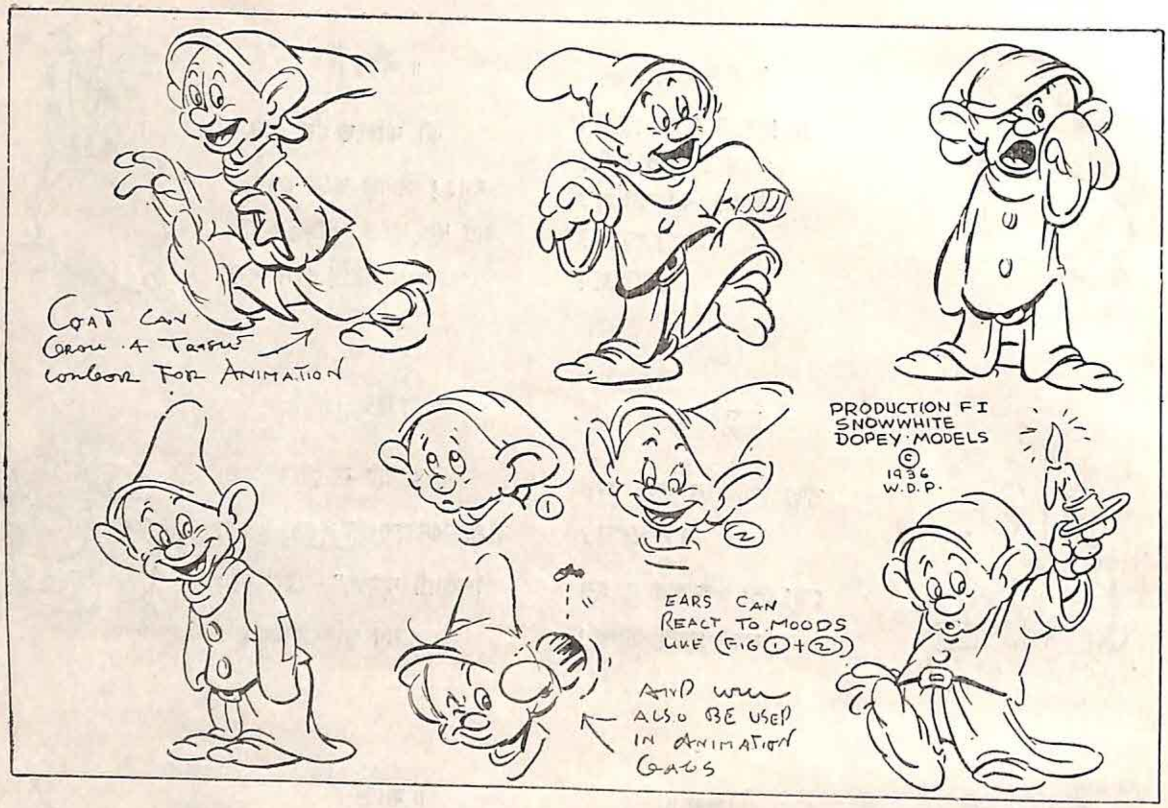
পড়বে ! ঠিক মনে পড়বে !
চোখ বুজে ভাবতে থাকি !
হ্যাঁ ! শৃক্কুর নয়, শৃগাল !
কুগাল নয়, কুক্কুর···

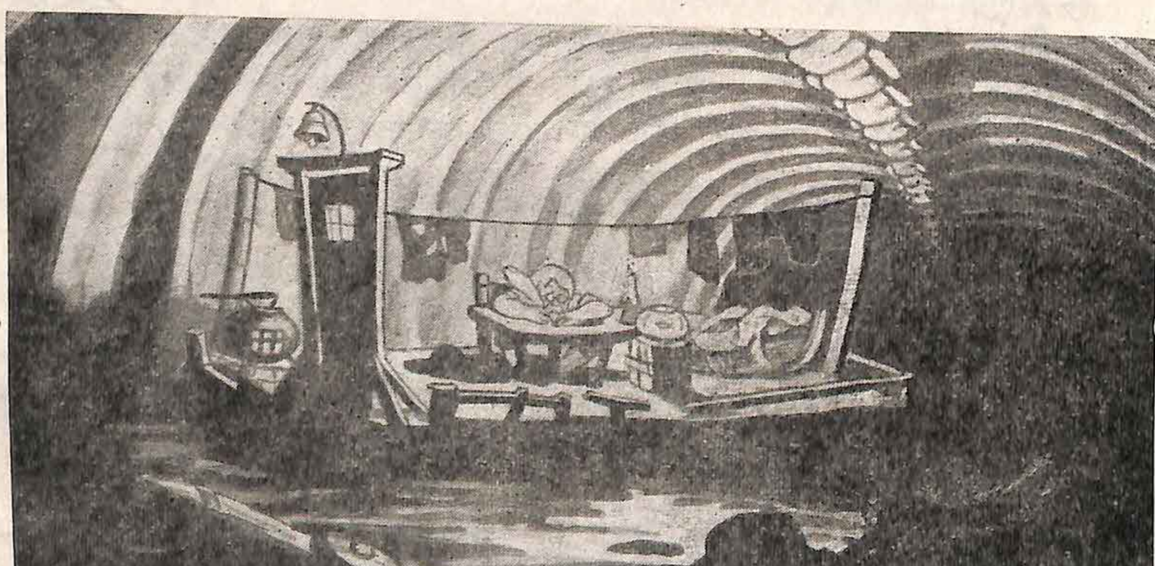


॥ আট ॥

পড়েছে ! মনে পড়েছে !
"গর্তে সাঁদাইতে হয় !!"
...মা ! সবটা মুখস্ত হয়ে
গেছে ! এবার খেলতে যাই ?

ওয়াল্ট ডিজ্‌নের স্কেচখাতা অবলম্বনে একটি মিনি-গল্প—'খোকনসোনার পেরথম ভাগ !'





(উপরে) 'স্নো-হোয়াইট' ছায়াছবিতে সহশিল্পীদের নির্দেশ। হস্তাক্ষর ডিজনের।
(নিচে) 'পিনোকিও' ছায়াছবিতে তিমির পেটের ভিতর 'গেপ্পেতো'-র সংসার।



বানি-র‍্যাবিটের আইডিয়া !



অসওয়াল্ড-এর ধেই-ধেই

টেডির আতঙ্ক



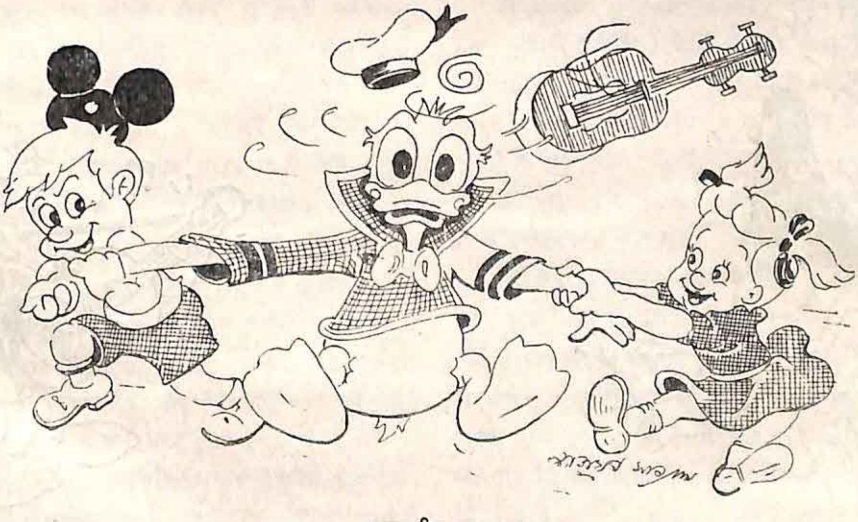
শেয়ারের লোভ



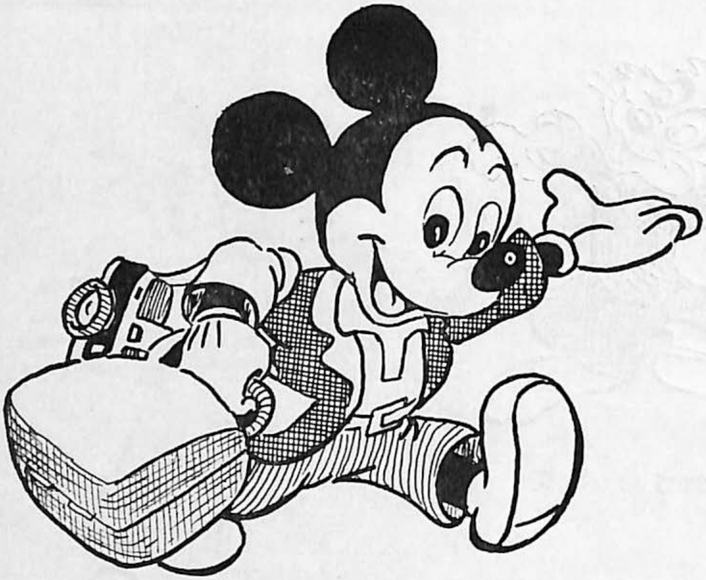
গুফির মুর্খামি



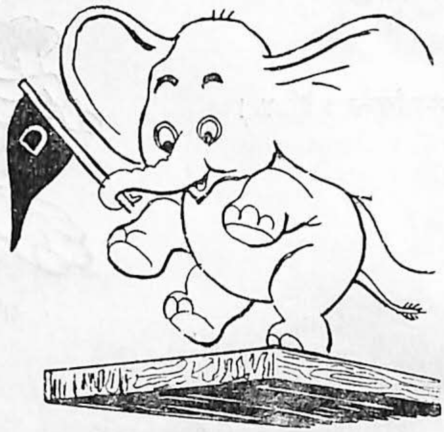
রোনাল্ড-এর দুশ্চিন্তা



জ্যাক-জিলের চোর ধরা



মিকি-মাউসের ফূর্তি



ডাম্‌বোর সাধনা



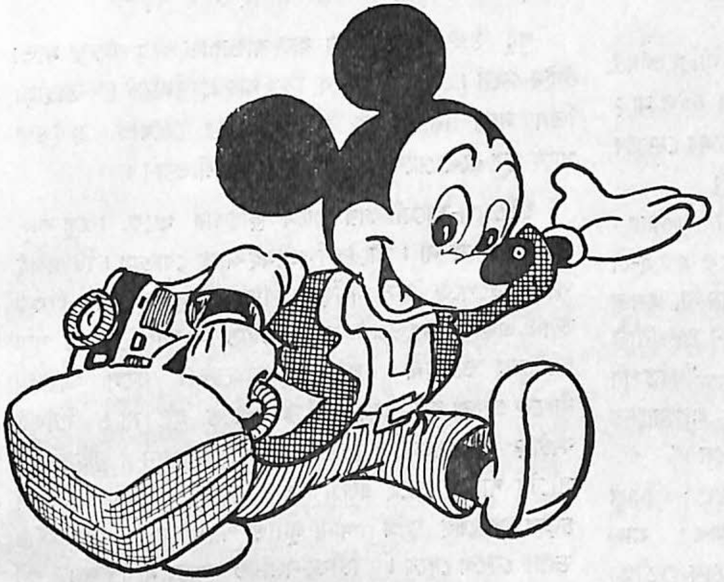
টিমোথির বন্ধুপ্রীতি



মিকির ম্যাজিক



ডোনাল-ডাক-এর বিরহ



চিচিংফাঁক

কথাটা তোমাদের চুপিচুপি বলছি ভাই—পাঁচকান ক'র না আবার, তাতে আমার বদনাম হয়ে যাবে। গত বছর ইউরোপ-আমেরিকার কাঁহা-কাঁহা মুলুক ঘুরে অনেক-অনেক কিছু দেখে এসেছি। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে —এই যার কথা তোমাদের এখন জানাতে বসেছি: ডিজ্‌নেল্যাণ্ড! গোটা পৃথিবীতে ডিজ্‌নেল্যাণ্ড আছে কুল্লে তিনটে। প্রথমটা লস্‌-অ্যাঞ্জেলেসে, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম কিনারে, প্রশান্ত মহাসাগরের ধারে। সেটাই প্রথম বানানো। দ্বিতীয়টা, তার নাম 'ডিজ্‌নেওয়ার্ল্ড' আছে ফ্লোরিডায়। পূর্ব-উপকূলে। তিন-নম্বর ডিজ্‌নেল্যাণ্ড তৈরী হয়েছে জাপানে; আর চার-নম্বরটা হতে চলেছে হয় স্পেনে, নয় ফ্রান্সে। এভাবে কতদিন পরে ভারতে যে ডিজ্‌নেল্যাণ্ড তৈরী হবে, আদৌ হবে কিনা ভগবান জানেন। আমি গিয়েছিলাম আদি অকৃত্রিম ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে, অর্থাৎ লস্‌-অ্যাঞ্জেলেস্‌-এ। মানে সেই যেখানে মাসখানেক আগে অলিম্পিক হয়েছে। হঠাৎ একটা ছপ্পরফোঁড় সুযোগ হয়ে গেল।

আমি ডেরা-ডাণ্ডা গেড়েছিলুম 'ওয়াল্‌নাট ক্রীক'-এ; সান্‌ফ্রান্সিস্কোর শহরতলীতে। সেখানেই থাকে আমার নাতনী, অন্তরা—এই তোমাদেরই বয়সী। হঠাৎ কল্যাণ মিত্র একদিন আমাকে ডেকে বল্‌ল, মেসোমশাই, দু'দিনের জন্য লস্‌-অ্যাঞ্জেলেস্‌ যাচ্ছি একটা কাজে। গাড়ি নিয়ে। যাবেন?

আমি বলি, গাড়িতে জায়গা হবে?

—অনায়াসে। সঙ্গে যাবে শুধু আমার বোন, পিউ।

আমি তো একপায়ে খাড়া। এমন সুযোগ কে ছাড়ে? দুঃখ হচ্ছিল বেচারি অন্তরার জন্য। তার স্কুল খোলা। বাধ্য হয়ে তাকে 'ওয়ালনাট ক্রীকে' থেকে যেতে হল। তবে সে আগেই ডিজ্‌নেল্যাণ্ড দেখেছে। পরেও নিশ্চয় দেখবে।

সারাদিনে চার-পাঁচ শ মাইল ড্রাইভ করে কল্যাণ আমাকে পৌঁছে দিল 'ডাউনি'তে। লস্‌-অ্যাঞ্জেলেস্‌-এর শহরতলী, যেখানে কল্যাণের আস্তানা। ওর বাড়িতেই অতিথি আমি।

পরদিন কল্যাণের বোন পিউ আমাকে ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের বাসে তুলে দিল। সকাল তখন আটটা। ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের গেট খোলে সকাল নয়টায়। বাসটা যেতেও সময় নেবে ঘণ্টা-খানেক। তার মানে, গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়তে পারব। যারা আগে দেখেছে তারা বলেছে, এত এত রকম মজাদার জিনিস আছে যে, একদিনে আধাআধিও দেখা হয়ে ওঠে না। ভীষণ ভীড়! 'কিউ' দিতে হয় সর্বত্র। তাই পুরো সময়টার ফায়দা ওঠাব বলে তৈরী হয়ে বেরিয়েছি।

সঙ্গে আছে একটা ঝোলা-ব্যাগ। তাতে আমার নোটবই, স্কেচ-খাতা ; এছাড়া পিউ একটা স্যাণ্ডউইচ্‌-এর লাঞ্চ-প্যাকেট বানিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া সঙ্গে আছে বাইনোকুলার।

কিন্তু একটা বিরাট বখেড়াও আছে!

খবরের কাগজে লিখেছে—ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে কী নাকি ধর্মঘট হচ্ছে! কেন রে বাবা ? তোদের কি একটু সবুর সইল না ? না হয় দুদিন পরেই ধর্মঘট করতিস্ ? মাত্র দুদিনের মেয়াদে লস্-অ্যাঞ্জেলেস্ বেড়াতে এসেছি। এখনই বন্ধ্ !

কাগজে লম্বা ফিরিস্তি ছাপিয়েছে ওদের দাবী দাওয়ার। মাহিনা বাড়াও, ছুটি বাড়াও, বোনাস বাড়াও—সে এক ই-য়া লম্বা ফিরিস্তি। ডিজ্‌নেল্যাণ্ড কর্তৃপক্ষও কম যান না, এখান থেকে ওখান থেকে অস্থায়ী-কর্মী ভাড়া করে এনে প্রদর্শনীটা খোলা রেখেছেন। কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছেন—"কতিপয় কর্মীর ভাঁওতায় ভুলিবেন না! ডিজ্‌নেল্যাণ্ড আপনাদের জন্য উন্মুক্ত! আসুন! দেখুন!" আনন্দলাভ করুন।"

ধর্মঘটীদের প্রতি সহানুভূতি নিশ্চয় আছে ; কিন্তু আমার যে জন্মের মধ্যে কর্ম—এই একটাই সুযোগ। আজ যদি না হয় তবে জন্মান্তরে বিশ্বাস রেখে হা-পিত্যেশ প্রতীক্ষা করতে হবে। বাস-এ তুলে দেবার সময় পিউ বল্‌লে, যদি দেখেন কিছুতেই ভিতরে ঢুকতে পারছেন না, তাহলে এই বাসেই উল্টোমুখে ফিরে আসবেন। আমি আপনাকে 'হলিউড'-এর বাস্-এ তুলে দেব। সেখানে ধর্মঘট নেই।

—কিন্তু হলিউড দেখবার আগ্রহও যে আমার তেমন নেই। আমি দেখতে চাই ডিজ্‌নেল্যাণ্ড।

—আর মনে আছে তো মেসোমশাই, ঐ টুমরোল্যাণ্ডের 'স্পেস্-মাউন্টেন রাইডটা', মানে মহাকাশ-যাত্রার অভিযানে আপনার যাওয়া বারণ!

হ্যাঁ, আমার মনে আছে। পিউ তার মেসোমশাইকে বারে বারে সাবধান করে দিয়েছে। সেটা নাকি ভয়াবহ! 'স্পেস্-শিপ্‌'-এ চড়ে মহাকাশে পাড়ি জমানো। মাথা ঘোরে, গা বমি-বমি করে! কী দরকার বাপু, সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা ? সুখে থাকতে ভূতের কীল খাবার ? পিউ তাই বারে বারে আমাকে বলে রেখেছে, ওটা বাদ দেবেন। কেমন ?

আমি তাকে নিশ্চিন্ত করেছি, না বাপু ওসব ধাষ্টামোর মধ্যে আমি বোকার মতো নাক গলাব না।

ঘণ্টাখানেক লাগল গোটা লস্-অ্যাঞ্জেলেস্ শহরটা পাড়ি দিয়ে ডিজ্‌নেল্যাণ্ড পৌঁছোতে। পিউ নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল, ডানহাতি একটা প্রকাণ্ড বড় সাইনবোর্ড দেখতে পাবেন 'ডিজ্‌নেল্যাণ্ড হোটেল'। সেখানেই নেমে পড়বেন।

শুধু তাই নয়, এখানে বাস যাতায়াত করে ট্রেনের মতো টাইম মেনে। সময় লাগবে ঠিক বাহান্ন মিনিট। তাছাড়া তিন নম্বর নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করে রেখেছি—ড্রাইভার সাহেবকে বলে রেখেছি, আমি দেহাতী গাঁওয়ার।

ইউরোপ-আমেরিকায় বাসে ড্রাইভার থাকে, কিন্তু কন্‌ডাকটার থাকে না। সীটের পিছনেই আছে বোতাম। টিপলেই পরের স্টপেজে বাস দাঁড়িয়ে যাবে। ড্রাইভারের নাকের ডগায় একটা 'কনভেক্স-মিরর্‌' ; তাতে সে স্পষ্ট দেখতে পায় যাত্রীদের ওঠানামা। ঘাড় না ঘুরিয়েও। ফলে, 'একদম বাঁধকে জনানা হ্যয়' জাতের হাঁক পাড়তে হয় না। টিকিট কাটা ? না, সেজন্য কন্‌ডাকটারের কী প্রয়োজন ? ড্রাইভারের সীটের পাশেই আছে একটা পয়সা ফেলার কৌটা। বাসে চড়ার সময়েই তুমি গোনা-গুনতি পয়সা, থ্রুড়ি, কোয়ার্টার ডলার ফেলে দেবে। টিকিট-মিকিট পাবে না কিন্তু। কী দরকার ওসব ঝামেলার ? তোমার সততাই তো রক্ষা-কবচ। ওরা নিশ্চিন্ত আছে, তুমি ঠিক মতো ভাড়া দেবে।

ঐ তো 'ডিজ্‌নেল্যাণ্ড হোটেল' সাইনবোর্ড!

হাঁকাড় পাড়তে যাচ্ছিলুম—রোখ্‌কে! হঠাৎ সামলে নিয়ে বোতাম টিপে দিই। বাসটা দাঁড়ালো।

নামলুম কিন্তু আমি একাই! আর কেউ নয়।

সেরেছে! তার মানে, লোকজন আজ এ পাড়ায় আসছে না। এবং তার অর্থ ধর্মঘট বেশ জোরদার!

একবার এ-কথাও মনে হল—আলু-ফাঁক, পটল-ফাঁক, বেগুন-ফাঁক বল্‌তে বল্‌তে যদি আন্দাজমতো 'চিচিং'টার সন্ধান পাই—তা হলেই 'মার দিয়া কেল্‌লা'! আলিবাবার মতো একাই ঢুকে পড়ব ঐ রত্নগুহায়—যেখানে থরে থরে সাজানো আছে—হাজার কিসিমের হীরে, মুক্তো, মণি-মাণিক্য।

কিন্তু ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের রত্নগুহার কপাট কোন্ 'চিচিং ফাঁক' মন্ত্রে খুলবে তা যে জানি না ?

বাস থেকে নেমে ইতিউতি চাইছি, হঠাৎ দেখি বড় রাস্তা পার হয়ে একজন মার্কিন মহিলা হন্ত-দন্ত হয়ে এদিকপানেই আসছেন। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। তাঁর হাত ধরে আসছে একটি বছর দশেকের বাচ্চা ছেলে। পরনে হাফপ্যাণ্ট,

একমাথা সোনালী চুল। আর তাঁর কোলে পিগী-টেলের মুকুট-পরা এক ঘুমন্ত খুকু। স্থানীয় মহিলা বলে মনে হল। ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে ঢোকার টিকিট কোথায় কাটতে হবে জেনে নিতে আমি গুটি গুটি তাঁর দিকে এগিয়ে যাই।

প্রশ্ন শুনে ভদ্রমহিলা জবাবে যা বললেন তার আধা-বাংলা অনুবাদ : সে মোলাসেস্‌-এ স্যাণ্ড! অর্থাৎ সে-গুড়ে বালি।

প্রশ্ন করি, কেন?

—টিকেট-কাউন্টারের সামনে এই মাত্র দেখে এলাম জনা-পঞ্চাশ ধর্মঘটী পিকেটিং করছে!

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়!

আমতা আমতা করে বলি, আপনিও বুঝি ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের ভিতরে যেতে চান? বাচ্চাদের ডিজনেল্যাণ্ড দেখাতে?

ভদ্রমহিলা আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, মশাইয়ের কি ধারণা ভিতরে না ঢুকে এই পাঁচিল বরাবর আমরা চক্কর মারতে এসেছি? নাকি, ছেলে-মেয়ের হাত ধরে এখানে 'হাপু' গাইতে এসেছি? সিয়াট্‌ল্ থেকে বেহুদ্দো এতটা পথ আসব কেন যদি ভিতরেই না ঢুকি?

আচ্ছা, তোমরাই বল ভাই, এ আমাকে অহেতুক বকা-ঝকা করা নয়? আমি কেমন করে জানব যে, উনি সিয়াট্‌ল থেকে আসছেন, অথবা ভিতরে ঢুকতে চান?

—কী হল? সঙের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন কেন আবার? ভিতরে ঢুকতে হলে আসুন আমার পিছু-পিছু।

'সঙের মতো'! কী করব? পড়েছি যবনীর হাতে! ভদ্রমহিলা লোক কিন্তু ভালো। কথার ধরণটাই শুধু ক্যাট-কেটে। উনি আমাকে বুঝিয়ে দেন—ঐ 'ডিজ্‌নেল্যাণ্ড হোটেল'-এর রিসেপশানে আছে একটা বিশেষ টিকিট-কাউন্টার। যাঁরা ঐ হোটেলের আবাসিক তাঁদের সুবিধার জন্য। বাইরের বোকা-সোকা লোক—এই যেমন আমি—সেসব সুলুক-সন্ধানের খবর রাখে না। ফলে সেই কাউন্টারে পিকেটারদের ভিড় নাও হতে পারে। ওখান থেকে যদি টুক্ করে একবার টিকিটটা কিনে ফেলা যায়—মুখটা গম্ভীর-গম্ভীর করে—যেন আমরা ঐ হোটেলেরই আবাসিক—তাহলেই কেল্লা ফতে! ডিজ্‌নে-দরজা - চিচিং ফাঁক!

কারণ সে-ক্ষেত্রে ঐ হোটেলের দো-তলার বারান্দা থেকে 'মনোরেল'-এ চড়ে বসা যাবে। এ বন্দোবস্তও ঐ আবাসিকদের সুবিধার জন্য। এক-চাকার ঐ রেলগাড়ি—মনোরেল—পাঁচ-সাতখানা বগি সমেত আকাশ পথে বড় রাস্তাটা পার করে আমাদের সোজা পৌঁছে দেবে ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের খাশ-তালুকে! সেখানে যত হচ্ছে হীরে-মণি-মুক্তো কুড়াও!

আমি বলি, ব্যবস্থা তো ভালই, কিন্তু ওরা যদি প্রমাণ চায়? দেখতে চায়—আমরা ঐ হোটেলের আবাসিক কিনা? তাহলেই তো চিত্তির!

অগ্রবর্তিনী হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। পিছন ফিরে বলেন, ডিজ্‌নেল্যাণ্ড দেখবার বাসনাটা কি মশায়ের এখনো আছে? তাহলে আডাক-কুডাক না ডেকে লক্ষ্মী ছেলের মতো আমার পিছন পিছন এস দিকিন্‌।

আয় বাপ্‌! এ যে কথায়-কথায় ধম্‌কায়! তবে ওর পরামর্শটা শুনি। হাজার হোক, মহিলাটি মার্কিন। অনেক সুলুক-সন্ধানের হদিশ জানে, এ তো দেখাই যাচ্ছে। আর কথায় কথায় আমাকে যেমন ধমক দিচ্ছে, তাতে মনে হল হয়তো পিকেটারদেরও ধমকে ঠাণ্ডা করে দিতে পারবে।

ভাগ্য ভালো। হোটেলে ঢুকতে কোন বেগ পেতে হল না। বোঝা গেল, শুধু হোটেলের আবাসিক নয়, চালাক-চতুর বাইরের যাত্রী, যেমন ঐ মহিলাটি—যদি এখান থেকে টিকিট কাটতে চান তাহলে কর্তৃপক্ষ আপত্তি করবেন না। কিন্তু টিকিট-কাউন্টারের কাছাকাছি যেতেই চক্ষু চড়কগাছ!

কাউন্টারের দু-পাশে দুই হেল্‌মেট্‌ধারী পুলিস! হাতে ঢাল, মাজায় রিভলবার। কর্তৃপক্ষ এদের মোতায়েন করেছেন, যাতে শান্তি ভঙ্গ না হয়। আর ঐ দুজন পুলিসকে ঘিরে জনা দশ বারো পিকেটার। তাদের হাতে নানান পোস্টার : —"নিপাত যাক! নিপাত যাক!

"...আমাদের দাবী মানতে হবে!

"...কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও!"

চেনা-লোকসঙ্গীতের মার্কিনী অনুবাদ!

আরও নজর হল, জনা-পাঁচেক প্রবেশার্থী গরুচোরের মতো ইতিউতি উঁকি-ঝুঁকি মারছে! কারও হিম্মৎ হচ্ছে না এগিয়ে যেতে। বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে।

'বুথ'-এ বসে আছেন একজন বর্ষিয়সী নিগ্রো মার্কিন মহিলা। ওরা অবশ্য 'নিগ্রো' বলে না, বলে 'আফ্রো-আমেরিকান'। তাঁর কোন কাজ নেই, যেহেতু খদ্দের নেই। মাছি নেই যে তাড়াবেন, একটা পাখির পালক কানে গুঁজে সুরসুরি দিয়ে আরামে মাঝে মাঝে চোখ বুঁজছিলেন।

খোকা-খুকুর মা আমাকে জনান্তিকে টেনে এনে বললে, কে আগে যাবে? তুমি না আমি? ঠিক করে বল?

আমি তৎক্ষণাৎ বলি, হেঃ! এটা আবার একটা প্রশ্ন হল নাকি? নিঃসন্দেহে তুমি!

—আমি ! বাঃ ! আমি কেন আগে যাব ?

—তোমরাই তো বল—'লেডিস্ ফার্স্ট' ! আমাদের দেশেও লক্ষ্ণৌ বিনয়ে বলে, পহিলে আপ্ !

খুকুর মা খেঁকিয়ে ওঠে—ন্যাকামি করার জায়গা পাওনি ! আমাকে ঠেলে দিয়ে তুমি আমার আড়ালে মুখ লুকাতে চাইছ ! আমি অত কাঁচা খুকীটি নই, বুঝেছ ? যাও, তুমিই আগে যাও ! শোন ! তুমি বিদেশী, হয়তো তোমাকে ওরা বুঝবে না । বরফটা ভাঙার দায়িত্ব তুমিই বরং নাও ।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারি– ঐ 'বরফ ভাঙার' । অর্থাৎ প্রথম পদক্ষেপ করা আর কি !

'চিচিং' নামটা তখনো মনে পড়েনি । আমি মনে মনে 'আলু-ফাঁক, পটল-ফাঁক, ঝিঙে-ফাঁক, উচ্ছে-ফাঁক' বলতে বলতে এগিয়ে যাই !

তৎক্ষণাৎ পিকেটারদের দল ছেড়ে একটি মেয়ে এগিয়ে এসে আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল । বছর বিশেক বয়স হবে হয়তো । এক মাথা লাল চুল । হাতে 'নিপাত যাক্' ব্যানার । মুখটা থমথম করছে ।

ফরোয়ার্ড-লাইনের প্লেয়ার যেমন সমঝে নিতে চায়— ডান দিকে ঝুল নিয়ে স্টপারকে কাটাব, না বাঁয়ে, আমি তেমনি দুদিকেই ঝুল দিতে থাকি । কিন্তু মেয়েটা যেন গোষ্ঠ পাল ! আমাকে টপ্‌কে যেতে দিল না । গম্ভীর গলায় বলে, 'কিছু মনে করবেন না, স্যার, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি ?'

একটা প্রশ্নে আর কত দেরী হবে ? বলি, কর !

—আপনি খবরের কাগজ পড়েন ?

খবরের কাগজ ! এমন বেতালা প্রশ্নের কী জবাব দেব ? বলি, পড়ি । কেন ?

সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রশ্নের বসান-তুবড়িতে আগুনের ছোঁওয়া লাগল, তাহলে নিশ্চয় জানেন, কেন আমাদের এই ধর্মঘট ? কীসের দাবী আমাদের ? কয় দফা দাবী ? নিশ্চয় জানেন, কেন মালিক-পক্ষের ঐ কালো-হাতটা আমরা ভেঙে দিতে চাই, গুঁড়িয়ে দিতে চাই ? কেন আপনাকে আমরা অনুরোধ করছি, এখান থেকেই আজ ফিরে যেতে !

আমি তো থ !

আমতা আমতা করে বলি, মাই ডিয়ার ইয়াং লেডি ! শর্ত ছিল, তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন করবে । কী বলে ভালো —তা তুমি করেছ । ওর নাম কি, আমিও তার জবাব দিয়েছি । তারপর তুমি মওকা-মাফিক পাঁচ-দশটা প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করে বসে আছ ! বেশ, সেগুলোর জবাবও আমি দেব । কিন্তু তার আগে তুমি আমার তিনটে প্রশ্নের জবাব দেবে কি দয়া করে ?

ইতিমধ্যে পাঁচ-সাতজন পিকেটার পোস্টার হাতে এগিয়ে এসে আমাদের ঘিরে ফেলেছে । শান্তি ব্যাহত হয়নি । ফলে পুলিস দুজন তখনো মাদাম তুঁসোর[1] মোমের পুতুলের মতো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে । আমি বলি, এক নম্বর প্রশ্ন, তোমার আন্দাজ মতো আমার বয়স কত ?

– ধরুন পঞ্চাশ !

—হল না । হাফ্ সেঞ্চুরির পরেও আমি একটি ওভার-বাউণ্ডারি এবং একটি বাউণ্ডারি হাঁকড়েছি ।

ওদের সকলের ফ্যাল-ফ্যাল দৃষ্টি দেখে খেয়াল হল, আমার রসিকতাটা ক্লীন বোল্ড হয়ে গেছে । এটা বেসবল্-এর দেশ । ক্রিকেট খেলার হক্-হদিস্ ওরা জানে না । তাই শুধরে নিয়ে বলি, আমার বয়স ষাটের উপর । সে যা হোক, আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন,—বল দিকিন, এখান থেকে আমার দেশ, মানে মুল্লুক কোনদিকে ? অর্থাৎ পুবমুখো গেলে পথটা কম হবে, না পশ্চিমমুখো ?

মেয়েটা এবার কোন জবাব দিল না । ঢোক গিল্‌ল শুধু । আমি বলি, পুব বা পশ্চিম যে মুখেই যাও, দূরত্ব সমান । কারণ আমি আসছি কলকাতা থেকে, পৃথিবীর ঠিক অপর প্রান্ত থেকে । একশ আশি ডিগ্রির ফারাক ! এবার আমার শেষ প্রশ্ন, ষাট বছরের জীবনে আজ এই যে প্রথম সুযোগটা পেয়েছি, সেটা কি আমি দ্বিতীয়বার পাব ? মানে, তোমাদের ধর্মঘটটা মিটে গেলে ? ভেঙেই দাও বা গুঁড়িয়েই দাও, একদিন তো সেই কালো হাতেই তোমরা হাত মেলাবে ! তখন আমি কোথায় ?

মেয়েটা ফ্ল্যাট !

ঠিক সেই সময়েই একজন বয়স্ক পিকেটার, তার মাথাভরা চক্‌চকে টাক—মেয়েটাকে সরিয়ে আমার মুখোমুখি হয়ে মহড়া নিয়ে দাঁড়ালো । আদালতে আইনজীবী যেভাবে 'বাও' করে, অথবা স্টেজে ম্যাজিশিয়ান, সেই কায়দায় আমাকে একটা 'বাও' করে বল্‌লে, গ্র্যাণ্ড-পা ! উই মেক অ্যান অনারেব্‌ল্ এক্‌সেপশান ফর য়ু ! য়ুআর কর্ডিয়ালি ওয়েল-কাম টু আওয়ার ডিজনেল্যাণ্ড !

অর্থাৎ : চিচিং-ফাঁক !

কন্যাকর্তা যে ভঙ্গিতে বরকর্তাকে 'আজ্ঞাজ্ঞা হোক' বলে, সেই কায়দায় হাত দুটো চিতিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে

বলে। মেয়েটা ওর দেখা-দেখি 'বাও' করে।

পথ ছেড়ে সবাই সরে দাঁড়ায়। দু-ফাঁক হয়ে। যেন গ্র্যাণ্ড-পা-কে গার্ড-অব-অনার দিচ্ছে। লোকটার যথেষ্ট বয়স। তার ঠাকুর্দা হবার মতো বুড়ো আমি নই। কিন্তু ওটুকু খোঁচা না দিয়ে সেও যেন তৃপ্ত হচ্ছিল না।

পথ পেয়ে এগিয়ে যাব, কোথাও কিছু নেই, হাঁ-হাঁ করে তেড়ে এল সেই খোকাখুকুর মা। আমার হাতখানা খপ্ করে চেপে ধরে বলে, আঙ্কল! তুমি বরং খুকুকে একটু ধর। টিকিট আমিই কাটছি। তোমার মানিব্যাগও তো আমায় কাছে গচ্ছিৎ রেখেছ।

আমি তো—হাঁ!

এ আবার কী? আমার মানিব্যাগ ওর কাছে? কখন? কী ভাবে? ভাল করে ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই ও ধ্রাশ করে ঘুমন্ত খুকুকে পাচার করে দিয়েছে আমার কোলে: ঝড়াক্‌সে অ্যাবাউট টার্ন করেই এক লাফে কাউণ্টারের কাছে চলে যায়।

তৎক্ষণাৎ সেই চক্‌চকে-টেকো রুখে ওঠে, তুমি কে? কোত্থেকে আসছ?

যেন গরম তেলে বেগুন ছাড়া হল। ছ্যাঁক করে ওঠে আমার—খোদায় মালুম—ভাইঝি না বোনঝি! বলে, বদ্ধ কালা নাকি গো তুমি? শুনলে না এই মাত্তর। ক্যালকাটা থেকে! সে এক্ষেত্রে পৃথিবীর হু—ই ও প্রান্ত! এক শ আশি ডিগ্রির ফারাকে!

বলেই আমার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান: কাম অন আঙ্কল গ্যান্‌ডি!

গ্যাণ্ডি! গ্যাণ্ডি কে? এণ্ডিগেণ্ডির একটা অবশ্য তখনও আমার কোলে। কারণ তখনো আমি খুকুকে কোলে নিয়ে গণেশ-জননীতে রূপান্তরিত হয়ে বেভ্‌ভুল দাঁড়িয়ে আছি।

পথরোধকারী টেকোটা ততক্ষণে সসঙ্কোচে বলছে, ও আয়াম সরি! আমি বুঝতে পারিনি!

খুকুর-মা খেঁকিয়ে ওঠে, এই সহজ কথাটা বুঝতে তোমার যা সময় লাগল, তাতে গোটা পিথাগোরাস্ থিওরেমটা[২] প্রমাণ হয়ে যায়! জান?

—বুঝেছি, বুঝেছি! তোমরা সবাই একদলে আছ!

টিকিট-মিকিট কেটে ফিরে এসে খুকুকে কোলান্তরিত করে বেমক্কা আমার হাত ধরে মারল আবার একটা হ্যাঁচকা টান! হুমড়ি খেয়ে পড়ি আর কি।

—চলে এস আঙ্কল গ্যান্‌ডি! এখনি মনোরেলটা ছাড়বে। কাম অন। ডবল্-আপ।

মনোরেল আমার কাছে নতুন নয়। আগেও চেপেছি। জাপানে। টোকিও এয়ারপোর্ট থেকে শহরে যাবার ব্যবস্থাটা ঐ এক-চাকার রেলগাড়িতে। সুবিধা হল এই যে, আমাদের একটুও হাঁটতে হল না। হোটেলের দোতলার বারান্দা থেকে ঐ এক-চাকার রেলগাড়িতে উঠে বসলাম। আর গাড়িটা বড় বড় পিলারের উপর দিয়ে সোজা এসে ঢুকল ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের 'টুমরোল্যাণ্ড'। গাড়িতে উঠে আমি বলি, হ্যাঁ গা, তুমি আমাকে বেমক্কা 'গান্ধী' বলে ডাকলে কেন?

—কী করব? চট্‌জল্‌দি একটা ভারতীয় উপাধী ভেবে বার করতে হল যে। 'গ্যাণ্ডি' সারনেমটা যে ভারতীয় তা সারা দুনিয়া জানে। মহাত্মা গ্যাণ্ডি আর ইন্দিরা গ্যাণ্ডি!

আমি বলি, আমার আসল নাম হচ্ছে...

—কী দরকার? একটা দিনের জন্য আমি না হয় তোমাকে 'আঙ্কল' বলেই ডাকি।

—তা বেশ। আমিও তাইলে তোমাকে 'নীস্' বলে ডাকব। 'নীস্' যদিও ঠিক ডাকনাম নয়। তা হোক।

খুকু তখনো ঘুমাচ্ছে। খোকন বলে, বা—রে! তাহলে আমরা এঁকে কী নামে ডাকব?

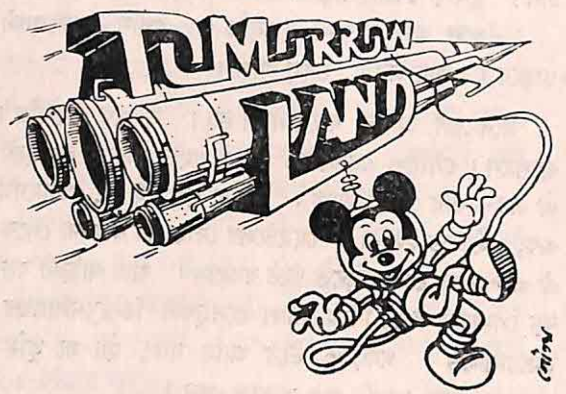
খোকার-মা সহজ সমাধান দাখিল করে, গ্র্যাণ্ড-পা!

আমি বলি, তা ভাল। তাহলে একদিনের জন্য আমি এই চুন্নুমুন্নু দুটোর নামকরণ করি:

খোকন খুব খুশি। বলে: কী নাম?

—'জ্যাক' অ্যাণ্ড 'জিল'!

জিল-এর আপত্তি করার প্রশ্নই ছিল না। কারণ সে তখনো মায়ের কোলে স্লিপিং বিউটি; আর জ্যাক, মানে যার নাম 'জ্যাক' নয়, সে খুশি হয়ে মেনে নিল। আমরা সপরিবারে ডিজনেল্যাণ্ডে ঢুকে পড়ি। জ্যাক্-জিল, নীস, আর তার খুড়ো অথবা মামা অথবা খোদায়মালুম।



টুমরোল্যাণ্ড

'ডিজ্‌নেল্যাণ্ড' যেন এক নিষ্কোণ-ত্রিভুজ! মানে, কোণাগুলো খোঁচা খোঁচা নয়, গলে-যাওয়া আইসক্রীমের মতো মোলায়েম। মাঝামাঝি সেণ্ট্রাল-প্লাজা ; তা থেকে সাইকেলের স্পোকের মতো কতকগুলো রাস্তা ডিজ্‌নেল্যাণ্ডকে অনেক গুলি ভাগে বিভক্ত করেছে। কোথায় কী দ্রষ্টব্য তা আমরা একে একে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে দেখব।

কিন্তু তার আগে একটু ভেবে দেখি, 'ডিজনেল্যাণ্ড' ত্রিভুজ কেন? কেন নয় -গোল? অথবা, চৌকো, কিম্বা 'ওভাল'? আমার মনে হয়, ওটা 'হার্ট-শেপ' ; ত্রিকোণ নয়। 'হার্ট-শেপ' বা হরতন হচ্ছে হৃদয়ের প্রতীক—ভালবাসার প্রতীক। ডিজ্‌নে-সাহেব ইচ্ছা করেই পুরোপুরি হরতন না বানিয়ে হরতনের একটা আভাস দিয়েই ছেড়েছেন। ভালবাসা তো একা একা হয় না! তোমাকে মনে মনে ওটাকে হরতন করে তুলতে হবে! শিল্পের এই নিয়ম! শিল্পী দেবে আধখানা, দর্শক যোগান দেবে বাকি আধখানা। ভালবাসাতেও তো তাই? একা হাতে কি তালি বাজে? ঝগড়ার নয়, ভালবাসার?

আমি যেভাবে ঘুরেছি সেভাবেই বর্ণনা করে যাব। লক্ষ্য করে দেখ, প্রতিটি দ্রষ্টব্যের কাছে আমি একটা নম্বর বসিয়েছি। সামনের দিকে 'পুস্তানি'র ম্যাপেও একটা করে নম্বর বসানো। ঐ নম্বরগুলো মিলিয়ে নিয়ে তোমরা মনে মনে ভ্রমণপথের একটা ছবি আঁকতে পারবে। বাস্তবে যদি কখনো ডিজ্‌নেল্যাণ্ড যাও তাহলে নম্বরগুলি থাকায় খুব সুবিধা হবে। তবে বাস্তবে 'ডিজ্‌নেল্যাণ্ড' দেখার কথা আপাতত থাক। মানস ভ্রমণেও একটা ম্যাপ থাকা ভাল। আমি তো তাই বুঝি। ভ্রমণ কাহিনী পড়তে বসলেই আমি একটা ম্যাপ নিয়ে বসি।

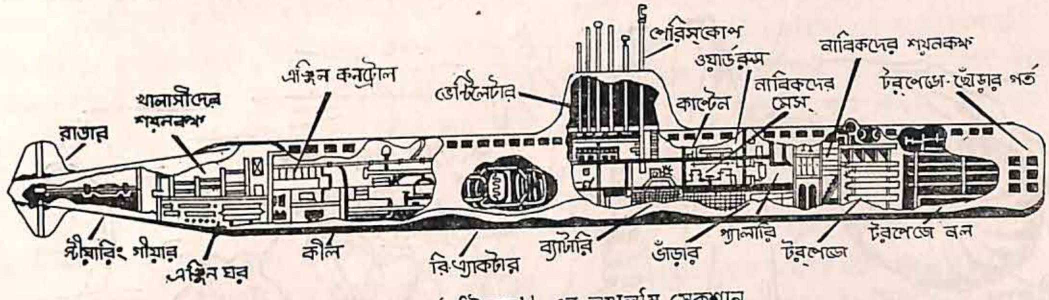
সে যাই হোক, আমরা মনোরেলে চেপে প্রথমেই ঢুকেছিলাম 'টুমরোল্যাণ্ড'—মানে 'ভবিষ্যৎ পৃথিবীর রাজ্যে'। সেখান থেকেই শুরু করা যাক। আগে টুমরো, পরে টু-ডে।

আমাদের একচাকার 'মনোরেল'টা এদিক সেদিক ঘুরে টুমরোল্যাণ্ডের আধাআধি পাড়ি দিয়ে এসে থামল টুমরোল্যাণ্ডের মনোরেল স্টেশনে (1)।

(2) **ডুবোজাহাজ অভিযান:** সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। দেখাদেখি আমরাও। নেমেই দেখি, সামনে ডুবোজাহাজ অভিযানের 'কিউ' লাইন। তা দেখে আমি আর ডানে বাঁয়ে নজর না করে চট্ করে লাইনে গিয়ে সামিল হই। নীস্ দেখি ধীরে সুস্থে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ঠোঁট মেরামত করতে শুরু করেছে। চোখাচোখি হতেই বলে, অমন হন্তদন্ত হয়ে দৌড়াও কেন বল তো? কখন হুমড়ি খেয়ে পড়বে! দেখছ না – যাত্রী কত কম? তাড়া কি?

তা বটে! জলের কিনারে ল্যাজে-মুড়োয় খান চার-পাঁচ ডুবোজাহাজ অপেক্ষা করছে। আর কিউ লাইনে মাত্র জনা-পঁচিশ যাত্রী, যারা কোনভাবে আমাদের মতো চিচিং ফাঁক মন্ত্রটা শিখেছে। যে কোন একখানা ডুবোজাহাজ জনা-পঞ্চাশ যাত্রীকে গিলতে পারে। শুনলাম, ছুটির দিনে এখানে পঞ্চাশ-ষাট হাজার দর্শনার্থী আসে, তাই এই রাজকীয় আয়োজন।

'লেগুন' বা জলাশয়টা আমাদের হেদো অথবা ভবানীপুর অঞ্চলের পদ্মপুকুরের চেয়ে বড় হবে বলে মনে হল না। তবে চৌকো নয়, বদ্যিরা যে দেশে আলুভাতে খায় না, সে দেশের



ডুবোজাহাজ 'নটিলাস্'[1]-এর লম্বালম্বি সেক্শান

মতো অঁ্যাকাচোরা![2] ওরা বললে, ওতে নাকি ষাট লক্ষ গ্যালন জল ধরে। তার মানেটা কী দাঁড়ালো? খোদায় মালুম। প্রক্সিমা সেণ্টরি[3] নক্ষত্রটা চার আলোকবর্ষ[4] দূরে শুনে ছেলেবেলায় আমার যেমন কোন ধারণা হয়নি। মনে হয়েছিল—সেটা বুঝি পাশের বাড়ি! তবে জলটা স্ফটিক-স্বচ্ছ। কী করে ঐ ষাট লক্ষ গ্যালন জলকে ডিজেলমুক্ত রাখে সেটাই একটা ধাঁধা। কারণ, শুনলাম ডুবোজাহাজ গুলো চলে চার-সিলিণ্ডার ডিজেল ইলেকট্রিক এঞ্জিনে। লম্বায় প্রায় ষোল মিটার; যতটা জল অপসারণ করে তার ওজন সাতচল্লিশ টন। আর ওরা বলল, সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় মাত্র আড়াই কিলোমিটার।

শুনে আমি তো হেসেই বাঁচিনে! বলি, ফুঃ! কল্লুমিঞা যখন ল্যাজমলা দেয় তখন তার বেতো বলদজোড়াও এর চেয়ে পাঁই পাঁই ছুটতে পারে। মাত্তর আড়াই কিলোমিটার!

সে কথা শুনে ডুবোজাহাজের কণ্ডাক্টার মহিলাটি বললে, এর চেয়ে পাঁই পাঁই ছুটলে তোমরা দেখতে পেতে থোড়াই! দ্যাখ না কী কাণ্ডটা হয়!

বন্দরে যাত্রীর অপেক্ষায় যে কয়টি সাব্‌মেরিন দাঁড়িয়ে আছে তাদের নামগুলি লক্ষ্য করবার মতো! নটিলাস, স্কেট, ট্রাইটন, সী-উল্‌ফ ইত্যাদি। প্রত্যেকেই এক একটি স্বনামধন্য বাস্তব সাবমেরিনের স্মৃতিধন্য। 'নটিলাস্' একটি সামুদ্রিক জীবের নাম। কোন কারণেই তাকে বিখ্যাত বলতে পারি না। 'অক্টোপাস'-এর নাকি দূর সম্পর্কের এক জ্ঞাতিভাই। কিন্তু জুল ভের্ন[5] তার বিখ্যাত গ্রন্থ—'টোয়েণ্টি থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দ্য সী' বইতে ক্যাপ্টেন নিমোর ডুবোজাহাজের ঐ নামকরণ করেন। বইটা যখন লেখা হয়েছিল তখনো ডুবোজাহাজ আবিষ্কৃতই হয়নি। সেটা তখন ছিল ঔপন্যাসিকের কল্পনামাত্র। তাই পৃথিবীর প্রথম নিউক্লিয়ার শক্তিতে পরিচালিত মার্কিন ডুবোজাহাজ যখন জলে ভাসল, মানে ডুবল, তখন তার নাম রাখা হল: 'নটিলাস'! আবার ওয়াল্ট ডিজ্‌নে যখন তাঁর খেলারাজ্যে প্রথম ডুবোজাহাজ পয়দা করলেন, তখন তারও নাম দিলেন—নটিলাস্!

এ যেন – যে আসে লঙ্কায় সেই হয় রাবণ!

না! সে কথা ঠিক নয়! নটিলাস্-এর ল্যাজে নাক লাগিয়ে এখানে যেটা জলে ভাসছে তার নাম: স্কেট। সেটা কার স্মৃতি রক্ষার্থে? শুনলাম লিণ্ডবার্গ[6] যেমন একা একা প্রথম অতলান্তিক পাড়ি দিয়েছিলেন, তেমনি স্কেটই প্রথম ডুবোজাহাজ যে, না-থেমে অতলান্তিক পাড়ি দেয়।

—আর ট্রাইটন? মেয়েটি বলে, ট্রাইটনের নাম শোনোনি? শোন বলি। আচ্ছা, তুমি ম্যাগেলান-এর নাম শুনেছ?

আমি বলি, বুঝেছি। ম্যাগেলান যেমন সমুদ্রের উপর দিয়ে সারা পৃথিবীটাকে চক্কর মেরেছিলেন ও তেমনি তলে-তলে পাক মেরেছে! এই তো? কিন্তু 'সী-উল্‌ফ্'?

মেয়েটি ধমক দেয়, তুমি কি সাবমেরিন বংশতালিকা খতম না করে আমাকে রেহাই দেবে না? ঐ দেখ, ওরা তোমাকে ডাকছে।

তাই তো! ডুবোজাহাজের মাথার ঢাক্‌নিটা ইতিমধ্যে খুলে গেছে। সিঁড়ি বেয়ে দর্শনার্থীরা নিচে নামছে। সেঁদিয়ে যাচ্ছে। যেভাবে রাস্তার ম্যানহোলে নেমে পড়ে সাফাই-ওয়ালা। জ্যাক-জিল আমাকে ডাকাডাকি করছে।

'থ্যাঙ্ক্‌স্, থ্যাঙ্ক্‌স্' বলে আমি ছুটে যাই সেদিকে।

খেলাঘরের এই ডুবোজাহাজের শিরদাঁড়া বরাবর একটা

লম্বা পার্টিশান। মেঝে থেকে পৌনে এক-মিটার উচ্চতায়। তার দুপাশে দুটি বেঞ্চি। দর্শনার্থীরা পিঠোপিঠি বসে। পার্টিশানে ঠেস দিয়ে। প্রত্যেকের নাকের ডগায় একটা জাতের 'প্ল্যাংটন', অর্থাৎ আণুবীক্ষণিক অতি ক্ষুদ্র জীব—যা নাকি তিমি থেকে বিভিন্ন সামুদ্রিক জীবের খাদ্য, তারাও সেখানে জন্মায়। ক্যাপ্টেন আরও বললেন, আমরা এখানে



ডুবোজাহাজের জানলা থেকে

করে ডব্‌ল্‌-কাচের গোলাকার জানলা। তা দিয়ে দেখতে হবে। মাথার ঢাক্‌নিটা বন্ধ হতেই চালু হল লাউড-স্পীকার যন্ত্রটা।

'—ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ! স্বাগত! আপনাদের ক্যাপ্টেন বল্‌ছি.........'

ক্যাপ্টেন-সাহেব সামুদ্রিক জীবন সম্বন্ধে একটা সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। বললেন, কী বিচিত্র এই সমুদ্র! ধরুন মাছ! সামুদ্রিক জীবনের একটা সামান্য ভগ্নাংশ তো? তা সেই মাছেরই অন্তত বিশ হাজার প্রজাতির (species) সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। **Mollusc** (ঝিনুক, শঙ্খ, গুগ্‌লি জাতীয় বর্মসাঁটা জলজ জীব) অন্তত চল্লিশ হাজার! ডাঙার জীব যেমন শেষ পর্যন্ত সূর্যের আলোর কাছে শক্তির প্রত্যাশী, সমুদ্রের জীবেরাও তাই। অথচ সমুদ্রের গভীরতা যেখানে হামেহাল সাত-আট হাজার মিটার, সেখানে সূর্যের আলো জলতল থেকে মাত্র একশ মিটার পর্যন্ত গভীরে যেতে পারে। তার নিচে নীরন্ধ্র অন্ধকার! জলজ উদ্ভিদের অধিকাংশ ঐ উপর-তলার শত-খানেক মিটার-এর মধ্যেই জন্মায়। সৌরশক্তির সাহায্যে। শুধু উদ্ভিদ নয়, নানান যেসব জলজ উদ্ভিদ, মাছ বা প্রাণী দেখতে পাব তার বেশির ভাগই উপরতলার বাসিন্দা। মহীসোপানের[৪] (**continental shelf**) চেয়ে গভীরে সচরাচর তারা যায় না। তার চেয়ে গভীরে যারা বাস করে তাদের অনেকে লণ্ঠন জেলে চলা-ফেরা করে। যেমন জায়েণ্ট অ্যাংলার, ল্যাণ্টার্ণ ফিশ্‌ ইত্যাদি। অন্ধকারে পথ চলার জন্য নয়, ওরা আলো জ্বালে অন্য উদ্দেশ্যে। আলোটা যেন বর্শির টোপ। তা দেখে অন্য ছোট মাছ কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে আসে। অমনি—কপাৎ!

জ্যাক আমার কানে কানে বলে, মেয়েটা আর কতক্ষণ এক-নাগাড়ে বক্‌বক্ করবে?

আমি জবাব দেবার আগেই অ্যাইসা এক ঝাঁকানি মারল, যাতে মনে হল – সমুদ্রের তলায় ঐ প্রথম একশ মিটার নেমে গেছি বুঝিবা! আসলে সবটাই ফক্কিকারি! বিজ্ঞানের ভেল্‌কি! করেছে কি জানো? ভাইব্রেটার দিয়ে আমাদের ডুবোজাহাজটাকে থরথরিয়ে কাঁপিয়েছে, আর দুপাশ দিয়ে বাতাস ছেড়েছে। যাতে আমাদের জানলার সামনে দিয়ে লাখ্‌ লাখ্‌ জল-বুদ্‌বুদকে উপরপানে উঠে যেতে দেখেছি। আসলে আমরা নেমেছি মাত্র মিটার-খানেক। মানে হাত দুই।

এবার নানান জাতের সামুদ্রিক জীবজন্তুকে দেখতে পাচ্ছি। পর্তুগীজ ম্যান অব ওয়ার, জায়েন্ট ক্ল্যাম্,[৭] বিশালকায় স্কুইড, হাঙর ; দেখলাম ঈল মাছের সঙ্গে অক্টোপাস-এর লড়াই, নটিলাস, সী হর্স্, বড় ও ছোট জাতের চিংড়ি, হার্মিট ক্র্যাব, অ্যানিমোন ! আবার কায়দা করে বলে, এবার আমাদের ডুবোজাহাজটা উত্তর মেরুর তলা দিয়ে যাবে—যেমন সত্যি সত্যি গেছিল এই ছোট্ট নটিলাস্-এর মা—ইউ. এস. এস. নটিলাস্, 1958 সালে।

আমরা খুব সাবধানে এঁকে বেঁকে চলতে থাকি। যাতে ভাসমান আইস্‌বার্গের তলায় ধাক্কা না লাগে। 'আইস্‌বার্গ' না ছাই। জলভরা পলিথিনের ব্যাগ হবে হয় তো। কিন্তু দেখলে একদম বোঝা যায় না। পাছে আমরা অবিশ্বাস করি, তাই কায়দা করে ডুবোজাহাজের ভিতরে উত্তাপটা বেশ কমিয়ে দিয়েছে। ভাবখানা : কী করি বল ভাই ? উত্তর-মেরুর তলপেট বলে কথা। শীত তো একটু হবেই।

তারপর দেখাল : অ্যাটলাণ্টিস্ !

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো আড়াই হাজার বছর আগে লিখে গেছেন - সমুদ্রের মাঝখানে ছিল একটা দ্বীপ—অ্যাটলাণ্টিস্। সেখানে বাস করত একটি সুসভ্য জাতি। সমুদ্রের নিচে ভূমি-কম্পে নাকি গোটা দ্বীপটাই তলিয়ে যায় সমুদ্রের তলায়। প্লেটো-বর্ণিত অ্যাটলাণ্টিস্ যে কোথায় ছিল এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। সেটার সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি। ওয়াল্ট ডিজ্‌নে নানান বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে এই কাল্পনিক 'অ্যাটলাণ্টিস্' বানিয়েছেন। অদ্ভুতদর্শন ভাঙা বাড়ি, নানান প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন পড়ে আছে থরে থরে।

তারপর নিয়ে গেল একখানা ভাঙা জাহাজ দেখাতে। বললে, সপ্তদশ শতাব্দীতে জলদস্যুদের আক্রমণে ঐ জাহাজটা ডুবে যায়। দু-টুকরো হয়ে ভেঙে যাওয়ায় ভিতরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পুরানো আমলের আসবাব, বাসনপত্র অস্ত্রশস্ত্র। ধনাগারে থরে থরে হীরে-মুক্তো-মণি-মাণিক্য ! জিল বলে, ঈশ্‌ ! হাত নিশ্‌পিশ করছে ! এক মুঠো মণি-মুক্তো তুলে আনা যায় না ?

জ্যাক ধমক দেয়, আহাম্মক কোথাকার ! ও তো সব নকল, স্রেফ্ পুঁতি !

জিল প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই প্রকাণ্ড একটা স্কুইড এসে আক্রমণ করল আমাদের ডুবোজাহাজটাকে। ঠিক যেমনটি ঘটেছিল ক্যাপ্টেন নিমোর জাহাজ 'নটিলাস'-এ। জুল ভের্ন-এর গল্পে। কী আর বলব ? অনেক কষ্টে পৈত্রিক প্রাণটুকু নিয়ে কোনক্রমে ফিরে এসেছি।

জলযাত্রার শেষাশেষি এসে পৌঁছানো গেল মৎস্যকন্যাদের রাজ্যে– মারমেড ওয়ার্ল্ড ! মৎস্যকন্যাগুলি সেই কোপেন-হেগেন-এর 'লিট্‌ল্ মারমেড'-এর মতো দেখতে। শুধু সে ছিল ব্রোঞ্জের—তাই কালো ; আর এরা সব দুধে-আলতা রঙের ! এদের গলায় মুক্তোর শতনরী, পালঙ্ক তাদের প্রবাল দিয়ে গড়া। মৎস্যরাজকন্যাকে বাতাস করছে ইয়া পেল্লায় দুই গল্‌দা চিংড়ি ! পাল্কগুলি প্রবাল-ঝিনুক-শামুক দিয়ে গড়া। নানান কারুকার্য করা। সুন্দর।

এ নিয়েও জ্যাক-জিলের মধ্যে বচসা শুরু হয়ে গেল—অর্থাৎ মারমেড বাস্তবে আছে, না কি মানুষের কল্পনা !

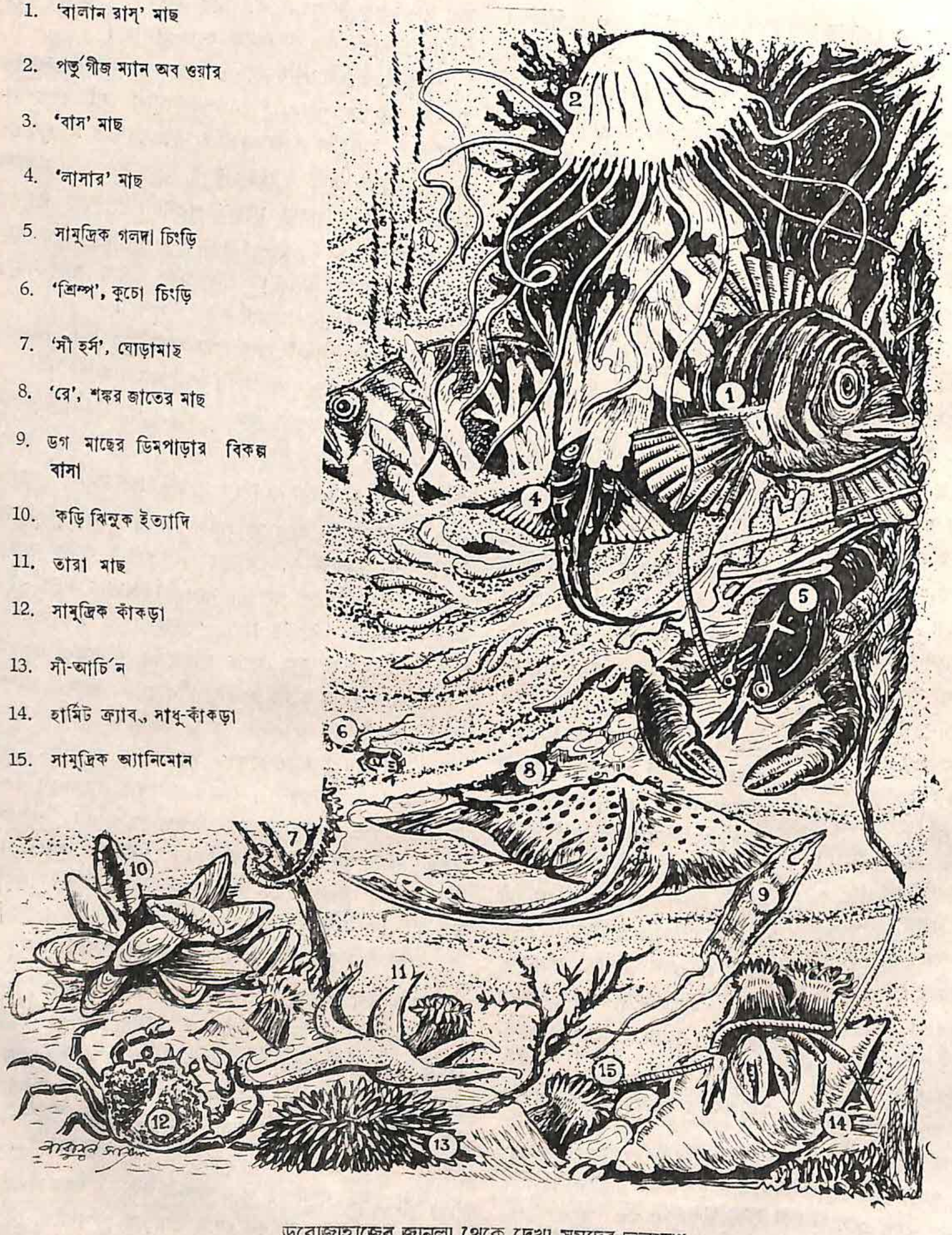
জ্যাক বলে, ঘোড়ার ডিম। মারমেডরা সব স্যাণ্টাক্লজের মতো। স্রেফ আষাঢ়ে গল্প। জিল পিগটেল সমেত মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে বলে, কখনো নয়। হতেই পারে না।

ওরা দুজনেই আমাকে সালিস্ মানে। মহা মুশ্‌কিল। জ্যাক যদি আমাকে আলাদাভাবে ঐ প্রশ্নটা করত তাহলে তাকে আমি বুঝিয়ে বলতুম, না। বিজ্ঞানের মতে—ঠিক মানুষের মতো দেখতে লেজ পাখনাওয়ালা মৎস্যকন্যা এ পৃথিবীতে নেই। দূর থেকে জাহাজের নাবিকেরা ম্যানাটি (manatee) বা ডুগং জাতীয় জীব দেখে এইসব আষাঢ়ে গল্প ফেঁদেছিল - দু-তিনশ বছর আগে। তাছাড়া হান্স অ্যাণ্ডারসন তাঁর বিখ্যাত গল্প—'দ্য লিট্‌ল্ মারমেড' লিখে বিশ্বশিশুর অন্তরে বিশ্বাসটা আরও জোরদার করলেন। কিন্তু জিল উপস্থিত থাকায় ও কথাটা বলতে পারিনি। বিজ্ঞানের সত্যই সত্য, আর উপকথার সত্য সত্য নয় ? শিশু-মনে ? জিলের যে বয়স তাতে ওর কাছে মক-টার্টল, আগ্‌লি ডার্কলিং, পিনোকিও, সাত বামন, সব, স—ব সত্যি।

জ্যাক তাগাদা দেয়, কী হল ? চুপ করে আছ কেন ?

আমি কথা ঘোরাই। বলি, দেখ জ্যাক, স্যাণ্টাক্লজ, কিন্তু সত্যিই একজন ছিলেন। 'মাইরা'য়, এশিয়া মাইনরে। আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে তিনি ওখানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতেন। হাজার বছর ! মানে তখনো রোম পর্যন্ত খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেনি। তাঁর আসল নাম সেণ্ট নিকোলাস। বড়দিনের আগে তিনি গরিব গুরবোদের বস্তিতে গিয়ে তল্লাস করতেন—কোন্ দুঃস্থ বাবা-মা তার বাচ্চার জন্য এ বছর উপহার কিনতে পারেনি। তাদের দোর গোড়ায় চুপিসারে রেখে

1. 'বালান রাস্' মাছ
2. পর্তুগীজ ম্যান অব ওয়ার
3. 'বাস' মাছ
4. 'লাসার' মাছ
5. সামুদ্রিক গলদা চিংড়ি
6. 'শ্রিম্প', কুচো চিংড়ি
7. 'সী হর্স', ঘোড়ামাছ
8. 'রে', শঙ্কর জাতের মাছ
9. ডগ মাছের ডিমপাড়ার বিকল্প বাসা
10. কড়ি ঝিনুক ইত্যাদি
11. তারা মাছ
12. সামুদ্রিক কাঁকড়া
13. সী-আর্চিন
14. হার্মিট ক্র্যাব, সাধু-কাঁকড়া
15. সামুদ্রিক অ্যানিমোন



ডুবোজাহাজের জানলা থেকে দেখা সমুদ্রের তলদেশ

আসতেন নানান উপহার। ডিসেম্বরের সেই বরফ-পড়া রাশিয়ান হাড় কাঁপানো শীতে।

জ্যাক বলে, কেন? চুপিসারে কেন? বাচ্চার বাপ্-মার হাতে উপহারগুলো দিলেই পারতেন?

জিল বলে, তুই কী বোকা দাদা। স্যাণ্টাক্লজ তো মোজার ভিতর লুকিয়ে লুকিয়ে তার প্রেজেণ্ট রেখে যায়। সে যে কাউকে না জানিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আসে।

জ্যাকের সঙ্গে তার মায়ের চোখাচোখি হল। আমার মনে হল, ওদের মা চোখের ইঙ্গিত করে জ্যাককে কী একটা বারণ করলেন। আমি জিলকে বলি, ঠিক কথা। আর জ্যাককে বলি, গরিব বাপ-মার দারিদ্র্যের অভিমানকে হয়তো উনি আঘাত করতে চাইতেন না। তা সে যাই হোক, তাঁর তিরোধানের অনেক পরে তাঁকে 'সেন্ট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। রাশিয়া শীতের দেশ; তাই সেন্ট নিকোলাসকে, —মানুষের মুখে-মুখে ততদিনে তিনি স্যান্টাক্লজ হয়ে গেছেন, আমরা দেখতে পাই হরিণেটানা গাড়িতে। জ্যাক বাধা দিয়ে বলে, বেশ; না হয় মেনে নেওয়া গেল যে, স্যান্টাক্লজ বাস্তব; কিন্তু তাই বলে 'মারমেড'...

সৌভাগ্য আমার। এ প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতে হয়নি। কারণ ঠিক তখনই ডুবোজাহাজটা তার অভিযান সাঙ্গ করে এসে ভিড়েছে—যে বন্দর থেকে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম সেই আমড়াতলার মোড়ে।

নীস্ বলে, চল আঙ্কল, গণ্ডোলায় চেপে গোটা ডিজ্‌নে-ল্যাণ্ডটা উপর থেকে দেখা যাক।

আমি বলি, ঠিক আছে, চল, আকাশপথ থেকে ডিজ্‌নে-ল্যাণ্ড কেমন লাগে চল, দেখে আসা যাক।

(3) **ফ্যাণ্টাসিল্যাণ্ডের রামধনুপথ :** টুমরোল্যাণ্ডের পাশেই ফ্যাণ্টাসিল্যাণ্ড। এটা ভবিষ্যৎ পৃথিবী, ওটা কল্পলোক। দুইয়ের মধ্যে আকাশপথে যোগসূত্র হচ্ছে এই রামধনুপথ। তার মানে, ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের উপর দিয়ে—ঝোলানো আছে এক জোড়া শক্ত তার। কোলিয়ারি-অঞ্চলে বিশ মিটার উঁচু দিয়ে যেমন বাকেটে করে কয়লা নিয়ে যায়, তেমনি বাকেট-গাড়ি। জমি থেকে ছয়তলা বাড়ির ছাদ-সমান উঁচুতে ঝুলতে ঝুলতে আমরা চলেছি। যেন ঈগল ছানা। অথবা 'পান্তভূতের জ্যান্তছানা'। এজন্য হামেহাল হাজির আছে একুশ-জোড়া গণ্ডোলা। সবসময়ে আপ লাইনে একুশটা; আর ডাউন লাইনে একুশটা। মনে হয় যেন শিব ঠাকুরের আপন দেশে এসেছি। 'একুশে আইন'-এর দেশে। প্রত্যেকটি গণ্ডোলায় 'চারিজন বসিবেক'। তার, মানে এ নয় যে, বাকি 'চারিজন ঝুলিবেক'! লোহার পাকানো তার, যা থেকে গণ্ডোলাগুলো ঝুলছে, সেই তারের লাইন প্রায় কিলোমিটার-খানেক লম্বা। আমরা চারজনে একটা গণ্ডোলায় চেপে ফ্যাণ্টাসিল্যাণ্ডের দিকে রওনা দিই! প্রথমেই গাড়িটা ঢুকে গেল 'ম্যাটারহর্ন' (42) পাহাড়ের পেটের ভিতর। সেখানে পাহাড়ের পেট এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে বানিয়েছে একটা টানেল। পাশেই ঝরনা থেকে ঝির ঝির করে জল ঝরছে।

হঠাৎ জিল বলে ওঠে, গ্র্যাণ্ড-পা! দেখ, দেখ, হু—ই নিচে কি যেন একসার জন্তু উড়ছে! আমি একনজর দেখে নিয়ে বলি, ও কিছু নয়, এক ঝাঁক উড়ন্ত হাতী।

জ্যাক একেবারে 'ক্ষেপচুরিয়াস্'! তেলে-বেগুনে জলে ওঠে, ব্যাপারটা কি? অ্যাঁ? কী পেয়েছ তুমি? স্যাণ্টাক্লজ মেনে নিয়েছি, আমার নাম 'জ্যাক', তা মেনে নিয়েছি! মায় 'মারমেড'ও মেনে নিয়েছি! তাই বলে, বাড়তে-বাড়তে তুমি একঝাঁক উড়ন্ত হাতী দেখাবে?

আমি ঘাবড়ে যাই। তাও তো বটে! কথাটা বে-ফাঁস বলে বসেছি! তাড়াতাড়ি বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে আবার দেখি। নাঃ! ভুল তো কিছু বলিনি। ওগুলো হাতীই তো। দিব্যি আকাশে উড়ে-বেড়াচ্ছে। শুঁড় আছে, নাদাপেট আছে, হাতীর লেজ, গোদা-পা, ডানা, সবই তো ঠিক ঠিক আছে।



ডানা!...তাই তো!

ওরা দুজনেও দেখল।

নীস্ বলে, আমি কিন্তু হাতী ছাড়া আরও একটা আজব জিনিস দেখতে পাচ্ছি। একটা চায়ের আসর। মনে হচ্ছে যারা চা-পানের আসরে জমায়েত হয়েছে তারা সবাই বসে

আছে ঐ চায়ের কাপের ভিতর।

কী কাণ্ড। কাপের ভিতর বসে চা-পান !

কিন্তু দূরবীক্ষণ-যন্ত্র তাই দেখাচ্ছে।

একটা গোল প্ল্যাটফর্ম। তাতে অনেকগুলো কাপ্‌ডিশ। ধীরে ধীরে পাক খাচ্ছে সেগুলো। আর কাপের ভিতর যারা বসে আছে তারা মানুষ। পুতুল নয়। জ্যাক বলে, দেখ, গ্র্যাণ্ড-পা, একজন বুড়োমতন লোক চুরুট খাচ্ছে। ধোঁয়াও বের হচ্ছে। পুতুল আর যাই করুক, স্মোক করে না।

কাপডিশ্‌গুলোর গায়ে হরতন রুহিতন ইস্কাপন চিড়ের ছাপ। লোকজন সমেত কাপডিশগুলো ঘুরছে।

জিল বাইনোকুলার চোখে দেখছিল এতক্ষণ। হঠাৎ চিৎকার পাড়ে : ঐ তো অ্যালিস্।

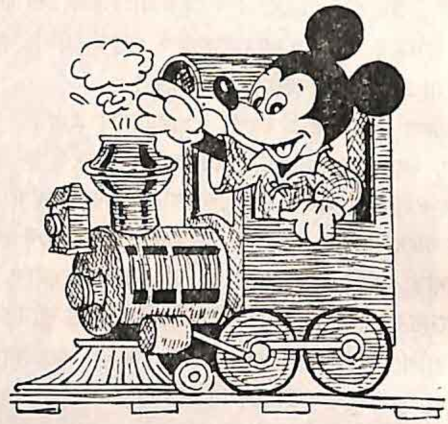
অ্যালিস্। অ্যালিস্ কে ? ওর কোন বান্ধবী-টান্ধবী হবে বোধ হয়। জানতে চাই সে-কথা। জিল বলে, ওয়াণ্ডার-ল্যাণ্ডের অ্যালিস্ গো। ঐ দেখ ম্যাড-হ্যাটারের সাথে বসে বসে চা খাচ্ছে। আমাদের রামধনুপথের ডাইনে 'ইট্‌স্ এ স্মল ওয়াল্ড' (50)। সেই প্রশস্ত বাড়ির সবচেয়ে উঁচু গম্বুজটাও এখন আমাদের পায়ের তলায়। ফ্যাণ্টাসিল্যাণ্ডে আমরা নামলুম না। তার পশ্চিম সীমান্ত স্পর্শ করে আবার উল্টো-মুখে যাত্রা। সাবমেরিন লেগুনের উপর দিয়ে যাবার সময় জলের তলায় ডুবোজাহাজগুলো দেখা গেল—জল এত পরিষ্কার। যেন বড় বড় রুই-কাৎলা। যেন হরিদ্বারের হর-কি-পৌড়ি।

এর পরেই 'টুমরোল্যাণ্ড অটোপিয়া'।

(5) টুমরোল্যাণ্ড অটোপিয়া :

এটায় চড়া হয়নি। ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে অটোপিয়া-রাইড আছে দুটো। একটা টুমরোল্যাণ্ডে আর একটা ফ্যাণ্টাসি-ল্যাণ্ডের ম্যাটারহর্ণ (42) পাহাড়ে। মটোরগাড়িগুলো আকারে ছোট। মার্ক-সেভেন মডেলের তিন মিটার লম্বা, এগারো শ'পাউণ্ড ওজনের। এঞ্জিনগুলো এক সিলিণ্ডার, সাত অশ্বশক্তির, আর ঘণ্টায় মাত্র এগারো কি মি. বেগে ছুটতে পারে। তুমিই চালাবে। ড্রাইভারের লাইসেন্স আছে কি নেই, কেউ দেখতে চাইবে না। শুধু দেখে নেবে তার উচ্চতা 137 সেণ্টিমিটার হয়েছে কি না। গাড়ির নাম : 'গো অ্যাজ য়ু লাইক' অর্থাৎ 'যেথার খুশি।'

গাড়িতে গাড়িতে গুঁতোগুঁতি হয়, কেউ ছিটকে পড়ে না। রবারের কুশান থাকায় কেউ ব্যথা পায় না, মজা পায়। জ্যাক-জিল এতে কোন উৎসাহ দেখালো না। এ ধরনের রাইড তারা অনেক নিয়েছে। অন্য এক্‌জিবিশনে।



জ্যাকের মা একটা ভাল পরামর্শ দিল। বলল, আঙ্কল গ্যাণ্ডি, এভাবে এলোপাতাড়ি দেখতে থাকলে হয়তো শেষমেষ দুএকটা ভাল জিনিস বাদ পড়ে যাবে। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। আমরা প্রতিটি রাজ্যের প্রধান আকর্ষণগুলো দেখেই অন্য রাজ্যে চলে যাব। যাতয়াত যখন সমস্যা নয়, টিকিটও কাটতে হচ্ছে না, তখন আমরা দরকার মতো আবার এসব রাজ্যে ফিরে আসতে পারব—মনোরেল, চক্ররেল অথবা রামধনু পথে। কি বল ?

বুদ্ধিটা ভাল। স্থির হল, আমরা প্রথমেই এই টুমরো-ল্যাণ্ডের মূল আকর্ষণগুলো সেরে নেব। ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে তো সবই উল্টো ! আগে টুমরো, তার পর টু-ডে ; সব শেষে আসবে ইয়েস্টার-ডে। আগামী কালের পরে আজ।

(6) পরমাণুর প্রাণকেন্দ্রে : কিউ সরীসৃপে মাত্র গুটি-কতক দর্শনার্থী দাঁড়িয়ে আছে। পরে শুনেছি, এসব জায়গায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অন্যান্যদের আধঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে —ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্য। ভাগ্যে ওরা ধর্মঘট করেছে। দেখি, একসার ফাঁকা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এক-এক গাড়িতে দুজনমাত্র বসবে। জ্যাক বসল আমার গাড়িতে ;

গিল তার মায়ের সঙ্গে। গাড়িটা সাপের মতো এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলল একটা সুড়ঙ্গের দিকে।

অলক্ষ্য থেকে শুরু হল যেন দৈববাণী : "আপনারা ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে এসে মহাকাশযাত্রাটা ইতিমধ্যে সেরে নিয়েছেন কিনা জানি না। এটা ঠিক তার উল্টোমুখো অভিযান। সে-যাত্রাটা ছিল পৃথিবী ছাড়িয়ে, সৌরমণ্ডলের দূরতম প্রান্ত প্লুটো স্টেশান ছাড়িয়ে আকাশ গঙ্গার[১০] শেষ সীমান্তে। এই নক্ষত্র জগৎ[১১] ছাড়িয়ে ভিন্ন গ্যালাক্সির দিকে যাত্রা। যাকে বলে 'মহা হতে মহীয়ান্'! যেমন রওনা হয়েছে বাহাত্তর সালে পাইওনিয়ার টেন্[১২]। এখানে আমাদের গতিমুখ ঠিক উল্টোদিকে : 'অণু হতে অণীয়ান্'।

[ইতিমধ্যে আমাদের গাড়িগুলো একের-পিছে-এক ঐ সুড়ঙ্গটার ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। চারিদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার। দেখতে পাচ্ছি, সুড়ঙ্গের ছাদ থেকে ঝর্‌ঝর করে জল ঝরে পড়ছে গাড়ির ছাদে। আমাদের গায়ে অবশ্য এক-ফোঁটা জলও লাগছে না। ক্রমে জলের বেগ কমে এল। তারপর টপ্‌টপ্‌ করে ফোঁটা-ফোঁটা জলবিন্দু।]

"আসুন, আমরা একটা জলবিন্দুর ভিতর ঢুকে পড়ি। ভিতরটার চেহারাটা কেমন একটু দেখা যাক।

[কী আশ্চর্য! ঐ জলের ফোঁটাটা আকারে বড় হতে হতে বিশাল হয়ে গেল। এতবড় যে, আমাদের গাড়িটা অনায়াসে ঢুকে গেল ঐ জলবিন্দুর ভিতর। নিশ্চয় আমাদের যাত্রাপথের চারিদিকে, উপরে ও নিচে, কোনও 'মাল্‌টিপল্‌-স্ক্রীন' আছে। তাতেই রঙিন-ছবির ফিল্ম প্রজেক্ট করা হচ্ছে। হয়তো ত্রিমাত্রিক ছবি—ধরতে পারছি না, ব্যাপারটা কী হচ্ছে। কেমন করে হচ্ছে।]

"কী দেখছেন? একটিমাত্র জলবিন্দুর ভিতরে কোটি কোটি জলের অণু (molecule)। তাই নয়? চলুন না, যে কোন একটা জলের অণুর ভিতরে একটু বেড়িয়ে আসবেন। জলের অণুর ভিতরটা কখনো দেখেছেন?

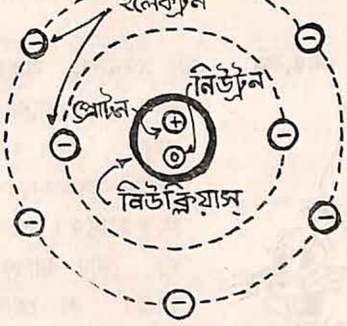
[এবার জলের একটি অণু আকারে বড় হতে থাকে। এতক্ষণে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, প্রতিটি জলের অণুতে একটা করে অক্সিজেন আর একজোড়া করে হাইড্রোজেন পরমাণু (atom) জড়াজড়ি ভাব জমিয়েছে।]

"এখন আমাদের সামনে দু-দুটো বিকল্প রাস্তা আছে। বলুন, কোন পাড়ায় বেড়াতে যাবেন? হাইড্রোজেন পরমাণু-রাজ্যে না অক্সিজেন পরমাণুর দেশে?

[জ্যাক আমার কানে কানে বলে, 'টেক আ কুইক ডিসিশান গ্র্যাণ্ড-পা।'

কিন্তু আমি মনস্থির করতে করতেই আমাদের গাড়িটা গিয়ে ঢাঁই করে ঢুঁ মারল ঐ অক্সিজেন পরমাণুর তলপেট বরাবর। সাঁ করে ঢুকে গেলুম অক্সিজেন পরমাণুর গর্ভে।]

"এঃ। আপনি বড় দেরি করে ফেল্‌লেন। কী আর করি। আমি নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মতো অক্সিজেন পট্টিতেই গাড়িটা ঢুকিয়ে দিয়েছি। আপনি নিজেই এখন ঐ অক্সিজেন পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত নিউক্লিয়াস। আপনারা গাড়িতে দুজন আছেন তো? তাহলে নিজেদের মধ্যে আপসে ঠিক করে নিন—কে কী হবেন?



অক্সিজেন পরমাণু

একজনকে হতে হবে আটটি ধনাত্মক-বিদ্যুদ্‌গর্ভ (positively charged) প্রোটন, অপরজন হবেন বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ নিউট্রন। ঐ দেখুন, আপনাদের প্রদক্ষিণ করছে দুইসারিতে আটটি ঋণাত্মক বিদ্যুদ্‌গর্ভ (negatively charged) ইলেকট্রন। প্রথম সারিতে আছে দুজন, পিছনের সারিতে ছয় জন। দুই সারি কেন? বাঃ। প্রফেসর নীল্‌স্ বোহ্‌র[১৩]-এর ফর্মূলাটা ভুলে মেরে দিয়েছেন বুঝি? শুনুন বুঝিয়ে বলি। পরমাণুর পেটে ইলেকট্রনদের ঘূর্ণনছন্দটা।

[জ্যাক আমার কানে-কানে বলে, কী আবোল-তাবোল বকছে লোকটা। আর আমি ওকে ধমক দিই, চুপ্‌।]

"মনে আছে তো গোটা পরমাণুর দশ-হাজার ভাগের মাত্র একভাগ হচ্ছে ঐ কেন্দ্রস্থ নিউক্লিয়াস্‌-এর ব্যাস। মানে আপনাদের ঐ গাড়িটা। এবার মনস্থির করে বলুন—কার পেটে সেঁদুবেন? ইলেকট্রন, প্রোটন না কি নিউট্রন?"

কী বলব ভাই, আমার দারুন-দারুন ভাল লাগছিল। তোমাদের মধ্যে যারা একটু উঁচু ক্লাসে উঠেছ তারা বুঝবে—

কেন এ কথা বলছি। ইলেকট্রন-প্রোটনের সুন্দরবনে বাঘ শিকার করতে যাব একথা কি কোনদিন স্বপ্নেও ভেবেছি? জ্যাকের অবশ্য এটা খুব ভাল লাগেনি। বেচারি এখনো এসব পড়েনি। আমার বারে বারে মনে পড়ে যাচ্ছিল একটা ইংরাজি ফিল্‌ম্‌-এর কথা। যতদূর মনে পড়ছে ছবিটার নাম ছিল: 'দ্য ইনক্রেডিব্‌ল্‌ জার্নি'। ভবিষ্যৎ যুগের গল্প। চারজন মানুষকে বিজ্ঞানের সাহায্যে পারমাণবিক জীবে রূপান্তরিত করে একজন শল্য-চিকিৎসক তাদের ইনজেক্ট করে দিলেন কোন একটি হৃদ্‌রোগে-আক্রান্ত রুগীর ধমনীতে। ধমনী নদী বেয়ে তারা রোগীর হৃদ্‌পিণ্ডে পৌঁছে যে রক্ত কণিকাটা পথরোধ করছিল তাকে সরিয়ে দিল। ঠিক সেভাবেই আমরা যেন এই বিচিত্র অভিযানটা সাঙ্গ করলাম।



(7) স্টার্‌কেড : এটা এমনকিছু আহামরি ব্যাপার নয়। নানান ধরনের ইলেকট্রনিক্স-গেম্‌স্‌। এমন ব্যাপার দিল্লি-বোম্বাই-কলকাতাতেও ইদানিং প্রচুর হয়েছে। তবে হ্যাঁ, অনেক বড় আর ব্যাপক। দোতলা বাড়ি। না হোক শ-দুয়েক বিভিন্ন জাতের ইলেক্‌ট্রনিক্স-খেলা। আমরা এখানে সময় নষ্ট করিনি।

(8) মহাকাশ অভিযান : আমার না এখানে ঢোকা মানা? হঠাৎ পিউ-এর মুখখানা মনে পড়ে গেল। যেন চুরি করে আচার খেতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছি।

—মেসোমশাই! ওটা কী হচ্ছে?

—না না, আমি তো কলা খাইনি!

কিন্তু আমার অপরাধটা কি? তোমরাই বল? বয়সটা একটু বেড়ে গেছে। মান্‌ছি। কিন্তু আর কোন অপরাধ করেছি? প্লেনে চড়লে আমার অস্বস্তি হয় না, পাকদণ্ডী পাহাড়ী পথে গাড়িতে চড়ে গা গুলায় না। তাহলে?

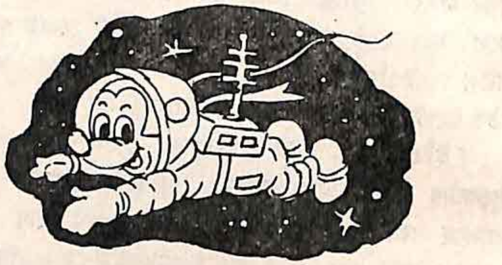
এঃ! পিউ ভারি আমার গার্জেন।

লাইনে গিয়ে দাঁড়াই। বেলা বেড়েছে। যাত্রী সংখ্যাও একটু একটু করে বাড়ছে। পঞ্চাশ-ষাট জনের পিছনে দাঁড়াতে হল কিউ-সারিতে। জ্যাক-জিল যাবে না। আগেই স্থির হয়েছিল। গাইড আমাদের বললে, তোমরা নিশ্চিন্ত মনে ভিতরে যেতে পার। এই চুন্‌মুন্‌ দুটোর দেখ্‌ভাল করার দায়িত্ব আমাদের। আর মাত্র পাঁচ মিনিটের তো ব্যাপার।

আমি মনে মনে বলি, তুমি তো বলেই খালাস। কিন্তু নিশ্চিন্ত কি থাকতে দিচ্ছ? সামনেই বিজ্ঞপ্তি: "গর্ভিণী নারী এবং দুব্‌লা-হৃদয় যাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে — যাত্রা স্থগিত রাখুন।" তাই দেখে কেউ কেউ সরে পড়লেন।

ভাইঝি বলে, আমার পেটে বাচ্চা নেই। তোমার?

— আমার পেটেও নেই।



মহাকাশে মিকি

—হেত্তেরি। তা বলছি না। তোমার পাঁজরের খাঁজে হৃদ্‌পিণ্ডটা তো আছে। সেটা এখন কী বলছে?

—ধ্রাশ! ধ্রাশ!

আরও দু'চারজন লাইন ভেঙে সরে দাঁড়াল। ডানে-বাঁয়ে না তাকিয়ে সোজা কেটে পড়ল পাশের দরজা দিয়ে। আবার একটা বিজ্ঞপ্তি নজরে পড়ল -"হঠকারিতা করিবেন না। আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া কোনও অপরাধ নহে। মনে দ্বিধা থাকিলে সসম্মানে যাত্রা স্থগিত রাখুন। রাইডটা বাস্তবিকই স্নায়ুর উপরে যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করে।"

কি জানি কী হল, খোকাখুকুর মা হঠাৎ লাইন থেকে একপাশে সসঙ্কোচে সরে দাঁড়ালো।

একটু ইতস্তত করে বলে, একা একা এতটা পথ ফিরে যেতে হবে, তুমি কাইণ্ডলি আমাকে পৌঁছে দেবে, আঙ্কল?

ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলি, সিয়াটল্‌ থেকে এতটা পথ আসতে পেরেছ যখন, এটুকুও একা ফিরে যেতে পারবে।

নীস হাসল। বুঝল আমি ছুতো খুঁজছি না।

চশমাজোড়া খুলে বুক পকেটে রেখে দিই। স্পেস-শাটল-এর গাড়ি সব টু-সীটার। আমার সামনে এক দম্পতি, পেছনে এক যুবতী মেয়ে। কী করব ভাবছি, গাইড বলল, একাই উঠুন। উঠে বসি। তৎক্ষণাৎ সামনের একটা হাতল স্প্রিং অ্যাকশনে ক্যাঁক করে এসে আমাকে ঠেসে ধরল

পিছনের সীটের সঙ্গে। যাতে আমি ছিটকে বেরিয়ে যেতে না পারি। অনেকটা প্লেনের সীট্-বেল্টের মতো।

শুরু হল যাত্রা।

মুহূর্তে : ভীমবেগে।

যতটা ভয়াবহ আর মনোমুগ্ধকর হবে ভেবেছিলাম ততটা নয়। অর্থাৎ আমার আশঙ্কা কিংবা আশা কোনটারই পূরণ হয়নি। ভয় যে লাগেনি, বরং বলা যায়, শারীরিক অস্বস্তি যে হয়নি, একথা বলব না। হয়েছে। না হলে যাত্রাপথের বেশ কয়েক সেকেণ্ড দাঁতে দাঁত চিপে চোখ বন্ধ করে থাকতে যাব কেন? তবে সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবার মতো তেমন কিছু পাইনি। মনে হয় গতি প্রচণ্ড। গা গুলিয়ে ওঠে। অথচ খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার। হ্যাঁ, এতই কম। যে-বেগে আমরা হামে হাল মটোর গাড়িতে ঘোরাফেরা করি।

এই ভেল্কিটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা – না, ওঁরা বলেননি, বা গাইড বইতেও লেখা নেই— আমার আন্দাজ এই রকম :

i) যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে, এক সেকেণ্ডের মধ্যেই গাড়িটা সর্বোচ্চ গতিবেগ লাভ করে। এতে আমরা অভ্যস্ত নই—কী মটোর গাড়ি, কী ট্রেন, কী প্লেন। ফলে এজন্য আমাদের শরীর প্রস্তুত নয়। শরীরে অস্বস্তি লাগে। গা-গুলিয়ে ওঠে।

ii) চারপাশের মাল্‌টিপ্‌ল্ স্ক্রীনে আলোকবিন্দুগুলিকে অত্যন্ত দ্রুতবেগে বিপরীত দিকে চালানো হয়। এতে আপেক্ষিক গতি (relative velocity) প্রচণ্ড হয়েছে বলে একটা ভ্রান্ত ধারণা হয়। কারণ আমরা জানি, আকাশের ঐ দূরস্থিত জ্যোতিষ্কগুলি মোটামুটি স্থির—উদয় থেকে অস্ত যেতে প্রায় বারো ঘণ্টা সময় নেয়। ফলে, মনে হয়—ওরা স্থিরই আছে, আমারাই বুঝি খুব জোরে ছুটেছি। ব্যাপারটা ভালো বোঝা গেল না, নয়? বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য এটা পরিশিষ্টে বিশদভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছি।[14]

iii) গতিপথটা ওরা ইচ্ছা করেই বানিয়েছে ছোট ছোট বৃত্তপথে। ক্রমাগত দক্ষিণাবর্ত (clockwise) থেকে বামাবর্তে (anti-clockwise)। কেন্দ্রাতীগ বেগ (centrifugal force) রুখতে গাড়িটাকে একবার এদিকে, একবার ওদিকে চল্লিশ-পঞ্চাশ ডিগ্রি বাঁকানো হয় – না হলে গাড়ি উল্টে যেত। আমরা এতেও অভ্যস্ত নই। পাহাড়ী পাকদণ্ডী পথে হয়তো ঐ রকম ছোট-ছোট বৃত্তপথে আমাদের ড্রাইভ করতে হয়; একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে মোড় ঘোরাতেও বাধ্য হই—কিন্তু তখনই আমরা গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে দিই। এখানে গতিবেগ কমানো হয় না—যাতে তোমার শরীরে অস্বস্তি হয়, মনে হয় জবর একটা রাইড নিচ্ছি। এবারও হয়তো ব্যাপারটা এখানে ঠিকমতো বোঝানো গেল না। বিজ্ঞানের ছাত্র এবং অনুসন্ধিৎসু খুদে পণ্ডিতদের কথা মনে করে পরিশিষ্টে এ নিয়ে আর একটু বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[15]

মোটকথা, সবটা মিলিয়ে আনন্দ পাইনি। আমার পরামর্শ—পিউ-এর সুরে সুর মিলিয়ে বলি, সখ করে ভূতের কীল খেতে যেও না। শরীর খারাপ হলে সবটাই মাটি। মান্‌ছি, শরীরের নাম 'মহাশয়'; কিন্তু মহাশয়দেরও তো মাঝে মাঝে শরীর খারাপ হয়। না কি?

(9) **মঙ্গলগ্রহে অভিযান** : এটা অনেক বেশি ভালো লেগেছে। ঠিক পাশের মণ্ডপেই। অনেকটা আমাদের গড়ের মাঠে 'বিড়লা তারামণ্ডলের' মতো একটা গোলঘর। আসনগুলি সমকেন্দ্রিক বৃত্তের আকারে সাজানো। 'খেতে পেলে শুতে চায়' আইনে এখানে বসলে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। এটি যখন বানানো হচ্ছিল তখন এর নাম ছিল; 'চন্দ্রাভিযান'। ম্যাগ্‌ডোনাল্ড ডাগলাসের পরিকল্পনা-



"ডক্টর মার্শিয়ান আই প্রিজিয়ুম।"[16]

মতো সব কিছু তৈরী হচ্ছিল। কিন্তু মহাকাশচারী বিজ্ঞানীদের কি কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে? তাঁদের সবুর সইল না। তড়িঘড়ি পৌঁছে গেলেন চাঁদে। অগত্যা নামটা বদলাতে হল। ডিজাইনটাও। চাঁদের বদলে এল-মঙ্গল। না

হলে 'টুমরোল্যাণ্ডে' একে ঠাঁই দেওয়া চলে না। 'চন্দ্রাভিযান' তো এখন 'ইয়েস্টার-ল্যাণ্ডের' বিষয় বস্তু।

এটা একটুও ভয়াবহ নয়। শরীরে কোন অস্বস্তি হয় না। আজগুবিও নয়। আদ্যন্ত বিজ্ঞান ভিত্তিক। শুরু হল গণনা : ফাইভ...ফোর...থ্রি...টু...ওয়ান...নাউ! সমস্ত ঘরটা থরথর করে কেঁপে ওঠে, যেন নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণে।

আমাদের আকাশযান নক্ষত্রবেগে ছুটেছে মঙ্গলগ্রহের দিকে। ডিজ্‌নেল্যাণ্ডটা মিলিয়ে গিয়ে দেখা গেল গোটা ক্যালিফোর্নিয়ার রিলিফ ম্যাপ। তারপর গোটা আমেরিকা ··গোটা পৃথিবী মহাকাশে ভাসছে। যেন একটা ফুটবল, 'উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা'। পৃথিবী টেনিস বল...পিংপং... মার্বেল আলোকবিন্দু। উল্টোদিকের জানলায় দেখি মঙ্গলগ্রহ এগিয়ে আসছে। ক্রমে স্পষ্ট দেখা গেল তার উবড়ো-খাবড়া জমি। নামা গেল না। আমাদের যে স্পেস স্যুট নেই। বাধ্য হয়ে এবার উল্টো-মুখে যাত্রা। মঙ্গল এবার ছোট হল, ছোট্ট হল, পুঁচকে হল শেষমেশ একটা আলোকবিন্দু। আর পৃথিবী-মা বড় হতে হতে যেন আলুথালু ভাবে ছুটে এল তার হারানো সন্তানকে ফিরে পাবার আনন্দে।

(10) **গোলাকৃতি চলচ্চিত্র :** নিঃসন্দেহে এই 'সার্কল-ভিশান' ডিজনেল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এই প্রদর্শনীটি এ বছরই (1984) চালু হয়েছে। এটাও একটা গোল ঘর। তবে বসার আসন নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়। যেদিকে ইচ্ছে মুখ করে। কারণ প্রায় তিন-চার মিটার খাড়াইয়ে একটা সিনেমা-স্ক্রীন গোল হয়ে তিনশ ষাট ডিগ্রি পাকমেরে গোলঘরটাকে ঘিরে রেখেছে। আমি যখন দেখি তখন দৈনিক মাত্র দুটো সিনেমা দেখানো হচ্ছিল। 'অত্যাশ্চর্য চীন '(Wonders of China) আর 'আমেরিকা ভ্রমণ' (American Journeys)। দুটোই দারুণ। অনবদ্য। 'সার্কল ভিশান' বা তিনশ ষাট ডিগ্রি স্ক্রীনে এর আগেও সিনেমা দেখেছি। জাপানে, বছর পনের আগে। এবার আরো ভাল লাগল। দুটি কারণে। এক এই দশ পনের বছরে প্রযুক্তিবিদ্যায় আরও উন্নতি হয়েছে। দুই—এবার মনে হল - যা জাপানে হয়নি—দর্শক যেন শুধু-মাত্র জ্যামিতিক অর্থে রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত নয়, সেও যেন এক কুশীলব। তাকে ঘিরে নয়, তাকে নিয়েই চারিদিকে যা-কিছু ঘটছে। তাই চীনের প্রাচীরের উপর দিয়ে রক্ষী-বাহিনী যখন মঙ্গল আক্রমণ ঠেকাতে ঘোড়ার পিঠে টগ্‌বগিয়ে ছুটতে থাকে তখন তুমি-আমিও যেন মনে মনে ঘোড়ায় চাপি। গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন্স-এ হেলিকপ্টারে বসে মনে হয়, সত্যিই বুঝি আমার পায়ের নিচে কলরেডোর খাদ। নায়গ্রা-প্রপাতের অত কাছে গিয়ে তাই অন্যমনস্ক হয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখতে যাই—জামাটা ভেজেনি তো? আমার অত ভালো লেগেছিল এজন্য যে, চীনের প্রাচীর, কলোরেডো বা তিব্বতের কুন্‌লুনসান্ পাহাড় তো চর্মচক্ষুতে কোনদিনই দেখতে পাব না।

পিটুলি গোলা নয়, টিনবন্দি 'কনডেন্সড্ মিল্কে' দুধের স্বাদ পাওয়া গেল।

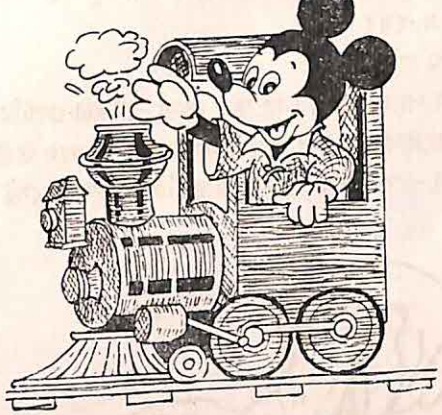
(11) **আমেরিকা গান গায় :** গায় তো গাক। আমার কী? আমি কি গান শুনতে এসেছি? মঙ্গলগ্রহ-অভিযানের উল্টোদিকে একটি মঞ্চে নাচগানের আসর। কিছুক্ষণ বাদে বাদে সেখানে নানান গানবাজনার ব্যবস্থা। আমাদের বাপু তা দেখবার সময় ছিল না।



নীস বলে, মনে হচ্ছে হাঁটু-জোড়া এবার ঠ্যাঙ থেকে খুলে যাবে। চল, কোথাও বসে দু-দণ্ড জিরিয়ে নিই। জ্যাকের তাতে ঘোরতর আপত্তি। আমারও। এত এত দেখবার জিনিস। জন্মের শোধ একদিনই তো দেখব। আমি বলি, এস, বরং দু-দিকই রক্ষা করা যাক। আমরা এবার 'ডিজ্‌নেল্যাণ্ড রেলরোডে'র গাড়িতে চেপে বসি। গোটা ডিজ্‌নেল্যাণ্ড চক্কর মেরে ঘুরে আসতে ওর সময় লাগে আঠারো মিনিট। তাতে বাইরে দিয়ে চক্কর মারাও হবে, আবার আমাদের ঠ্যাঙগুলোও একটু বিশ্রাম পাবে।

(12) **ডিজ্‌নেল্যান্ড রেলরোড :** গোটা ডিজ্‌নেল্যাণ্ডকে জড়িয়ে ধরেছে এই রেলপথ। মেপে দেখিনি, চোখ আন্দাজে মনে হল—ন্যারোগেজ। দৈর্ঘ্য প্রায় দুই কি. মি.। খানতিনেক ট্রেন আছে। সবই ঘোরে ক্লক-ওয়াইজ। তার মানে, ছয় মিনিট পর পর একমুখো ট্রেন পাওয়া যায়। স্টেশানে পৌঁছে দেখি একটা ট্রেন ছাড়ছে।

একশ বছর আগে যে ধরনের রেলগাড়ি ছিল। আমাদের দার্জিলিঙে দেখা যায় যাদের নাতিপুতিদের।



যাত্রাপথে সবার প্রথমে গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ান্স্(13)। এটা বানাতে সে আমলেই নাকি খরচ হয়েছিল প্রায় চুয়ান্ন কোটি টাকা। রেলপথে এই গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন্সের দৈর্ঘ্য একশ মিটার। সবটাই একটা টানেলের ভিতর, যার উচ্চতা দশ মিটার। পিছনের ছবিগুলো ক্যানভাসের উপর আঁকা। মাঝে মাঝে ত্রি-মাত্রিক ভেল্কিও আছে! অর্থাৎ ডায়োরামাতে যেমন দৃশ্যপটের বিষয়বস্তুগুলি আগে-পিছে মনে হয়। গাড়ি চল্‌ছে। দৃশ্যপটও ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে; বদলে যাচ্ছে হাল্‌কা আবহসঙ্গীত। কখনো সোনা-গলানো সূর্যাস্ত, কখনো রামধনুর মাফলার-জড়ানো শীতকালের নির্মেঘ নীল আকাশ! আবার কখনো বা তুষার-ঝটিকার ইল্‌সেগুঁড়ি। এসব স্থানে গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে দেওয়া হয়। যাতে তুমি তারিয়ে তারিয়ে দৃশ্যটা উপভোগ করতে পার। গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ান্সের খাদ বিশ্ববিখ্যাত। কলোরেডো নদীর খাদ। কেদার-বদ্রী পথে তোমরা হয়তো অলকানন্দা বা মন্দাকিনীরখাদ দেখেছ। কিন্তু কলোরেডোর খাদ সে রকম নয়। আলম্ব (vertical) প্রাচীরের মতো খাড়া। কখনো কখনো গভীরতা খাড়া এক-দেড় কি.মি! নিচে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। আর সেই খাদের মাঝে মাঝে বিচিত্রবর্ণ সব স্তম্ভ। সবকিছুই প্রকৃতির গড়া। এসব বর্ণনা বাস্তব কলোরেডো খাদের। এখানে খাড়া খাদটা নজরে আসে না, তবে খাড়া স্তম্ভের উপর দেখছি নানান জীবজন্তুকে—হরিণ, পাহাড়ী ছাগল, পাহাড়ী সিংহ, (শুধু আমেরিকাতেই পাওয়া যায়) সোনালী ঈগল। আর কী যেন দেখেছিলাম? দাঁড়াও, নোটবই দেখে বলি—হ্যাঁ, জংলি টার্কি, স্কাংক, সজারু, রাস্কেল। না, না, 'রাস্কেল' কোনো জন্তুর নাম নয়। না-মানুষটার নাম 'রাকুন'। 'রাস্কেল' একটা বিশেষ রাকুনের নাম। তোমরা চেন কিনা জানি না, আমার খুব প্রিয়। সবই স্টাফ্‌ড্ জন্তু। দক্ষ 'ট্যাক্সিডা-মিস্ট'দের হাতে গড়া দক্ষ শিল্প।

গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ান্স টানেলটা পার হবার পর লাউড-স্পীকারে ঘোষিত হল—"এবার আমরা প্রাগৈতিহাসিক জগতে(14) প্রবেশ করতে চলেছি। জুরাসিক আর ক্রিটেশিয়ান যুগের পৃথিবীতে[17]। এই মডেলটি 1966-এ নিউইয়র্ক বিশ্বমেলায় (Expo) ফোর্ড-প্যাভেলিয়ানে দেখানো হয়েছিল। পরে এটিকে এই ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে নিয়ে আসা হয়।"

এটাও একটা টানেলের ভিতর। একটা প্রকাণ্ড জলা-ভূমি। তাতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বিশ-পঁচিশ কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর রূপ। মানুষ তখনো বিবর্তনের পথে পৃথিবীতে আসেনি—সেটা ছিল ডাইনোসরদের যুগ। যাদের জীবাশ্ম (fossil) আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন যাদু-ঘরে। কলকাতার যাদুঘরে একতলার প্রথম বাঁ-হাতি ঘরে কিছু কিছু দেখতে পাবে। কোথাও বা মরুভূমি অথবা নিবিড় অরণ্য। কোথাও আগ্নেয়গিরির ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত। গাইডবুকে দেখি লেখা আছে, এখানে সর্বসমেত ছয়চল্লিশটি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মডেল রাখা আছে। তারা সবাই Audio Animatronics প্রযুক্তিবিদ্যায় আপাত-সজীব। হাত পা নাড়ে, ঘোরা-ফেরা করে। সব কটাকে চিনতে পারলুম না। তবে দু-একটি চেনা চেনা লাগল: ব্রণ্টোসরাস, টাইরানোসরাস, ইগুয়ানোডন, আর ডিপলোডকাস। স্টেগো-সরাসকে কিংকং ছবিতে দেখেছি, ওকে দেখে মিকি-মাউসের মতো আমারও বলতে ইচ্ছে করছিল, "মিস্টার স্টেগোসরাস, আই প্রিজিয়ুম!"

পরের মডেলটা ঈগলের এক পূর্বপুরুষ—অতিকায় টেরানোডন। আকারে ঈগলের চেয়ে অনেক বড়।

এর পরের মডেলটা হচ্ছে তিনখড়্গওয়ালা একটা ডাই-নোসর। একটা মাদী 'ট্রাইসেরাটপস্'। সে তার তিনটি প্রকাণ্ড বড় বড় ডিম পাহারা দিচ্ছিল। এমন সময় একটা হিংস্র টাইরানোসরাস্ এসে তাকে আক্রমণ করেছে। মাদী ট্রাইসেরাটপস্ তৃণভোজী, আর তার আক্রমণকারী জীবটা মাংসভুক। এসেছে ঐ ডিমের লোভে। হোক নিরামিষাশী,

ট্রাইসেরাটপস্‌-এর নাকের উপর আছে তিন তিনটে খড়্গ! একবার ঠিকমতো যদি ঐ আক্রমণকারীর তলপেটে ঢুঁ মারতে পারে তাহলেই কেল্লা ফতে! বিশালকায় দুটি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর সে লড়াই রীতিমত রোমহর্ষক!

জিল বলে গ্র্যাণ্ড পা, ঐ খড়্গওয়ালা জীবটা কি গণ্ডার?

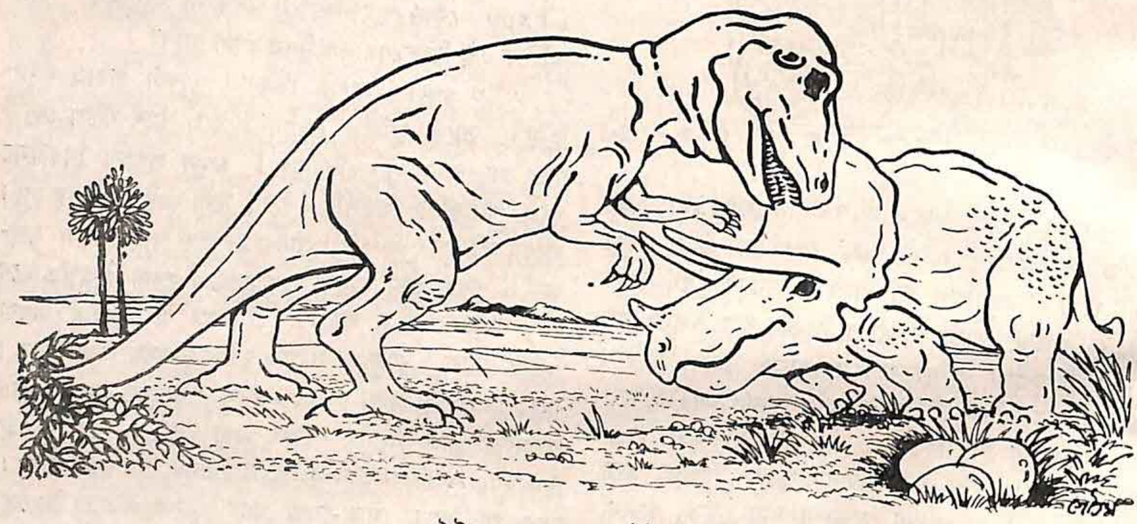
জ্যাক যেন টাইরানোসরাস্‌! তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করে তার ছোটবোনকে, বটেই তো! গণ্ডার না হলে অমন ফুটবলের মতো বড় বড় ডিম পাড়বে কি করে?

মানুষ ছিল না। তাহলে বল, মানুষ কত কোটি বছর আগে এই পৃথিবীতে এসেছে?

আমি বুঝিয়ে বলি, এক কোটিও নয়, দু-পাঁচ লক্ষ বছর হয়-কি না-হয়!

—ও মাই গড!

মনে পড়ল, সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা-সেণ্টারি মাত্র চার 'আলোকবর্ষ' দূরে শুনে ছেলেবেলায় আমারও তাই মনে হয়েছিল—সেটা বুঝি পাশের বাড়ি। জিলও হয়তো সেই রকম



টাইরানোসরাস বনাম ট্রাইসেরাটপস্‌

আমি ওদের ঝগড়া থামিয়ে দিয়ে বলি, না জিল, ওটা গণ্ডার-জাতীয় স্তন্যপায়ী জীব নয়। এটা এমন একটা যুগের কথা যখন স্তন্যপায়ী জীবের জন্মই হয়নি। এরা ছিল অনেক অনেক বছর আগেকার পৃথিবীতে। সে প্রায় আঠারো-বিশ কোটি বছর আগে। এরা সব সরীসৃপ। তাই ডিম পাড়ত। আজকের পৃথিবীতে যেমন সরীসৃপ আছে—কুমীর, গিরগিটি, টিকটিকি। গণ্ডার স্তন্যপায়ী। তারা ডিম পাড়ে না। বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ায়, যা সরীসৃপেরা খাওয়ায় না।

জিল জানতে চায়, বিশ কোটি বছর মানে কতটা?

ওকে কেমন করে বোঝাই?

ও নিজেই একটা সূত্র দেয়। বলে, তুমি বলেছ সেযুগে ভাবে ভাবছিল—বিশ কোটি বছর আগে ওর ঠাকুর্দার-ঠাকুর্দার-ঠাকুর্দা এ জাতীয় জীবের সামনে হামেহাল পড়েছে। মানুষ এ দুনিয়ায় মাত্র কয়েক লক্ষ বছর আগে এসেছে, আর ঐ অতিকায় জীবগুলো পনের-বিশ কোটি বছর আগে নিঃশেষিত হয়েছে শুনে ও স্তম্ভিত হয়ে যায়।

এ ধরণের মডেল আগেও দেখেছি। সিনেমাতে তাদের নড়া-চড়া করতেও দেখেছি। কিন্তু এ তো সিনেমা নয়, এ যে ত্রিমাত্রিক। তাই অনুভূতিটা আজ অন্যরকম।

রেলরোড ধরে পুরো দুটি চক্কর মেরে—মানে ঐ সব দৃশ্য দু-দুবার করে দেখে আমরা সবাই এসে নামলুম আমড়াতলার মোড়ে। মানে মেইনস্ট্রীটের রেলরোড স্টেশানে(15)।



মেইন-স্ট্রীট ইউ.এস.এ

আমেরিকার প্রায় সব শহরেই আছে এক-একটা মেইন-স্ট্রীট। প্রধান রাজপথ। সাজানো-গোছানো দোকানপাট যার দুধারে। বোম্বাইয়ের জাভেরী-বাজার, দিল্লীর কনোট-সার্কাস আর আমাদের হগ-সাহেবের মার্কেট – এস্‌প্লানেডে। ওয়াল্ট ডিজ্‌নে এখানে যে মেইন স্ট্রীটটা গড়ে তুলেছেন তা এই শতাব্দীর শুরুতে যে-কোন একটা মার্কিন শহরের প্রতিরূপে। সব কিছুই প্রায় একশ বছর আগেকার। রাস্তার মাঝখান দিয়ে ঘোড়ায়-টানা ট্রামগাড়ি। সাইকেল আছে, তবে চাকা-দুটো সমান মাপের নয়। বড় ছোট। মটোর গাড়ি যে এ পথে চলে না তা নয়, তবে মান্ধাতা আমলের, যেমন দেখা যায় আমাদের 'ভিন্টেজ কার' উৎসবে। রাস্তার ধারে ল্যাম্পপোস্টে গ্যাসের মিটমিটে আলো। বিজলিবাতির চল হয়নি যে, কী করবে বল? স্টেশান-বাড়িটা (15) তিনতলা। একতলার ঘরগুলোর উচ্চতা 7/8 স্কেলে; দোতলার ঘরগুলো 5/8 স্কেলে; আর তিন-তলার ঘরগুলো 1/2 স্কেলে বানানো। ব্যাপারটা বুঝলে তো? ধর যদি বাস্তবে ঐ বাড়ির প্রতিটি তলার উচ্চতা 3.20 মিটার হয়, তাহলে এখানে তা বানানো হয়েছে—একতলায় $7/8 \times 3{\cdot}2 = 2{\cdot}80$ মিটার। দোতলায় $5/8 \times 3.2 = 2{\cdot}0$ মি। এবং তিনতলায় $1/2 \times 3{\cdot}2 = 1{\cdot}6$মি উচ্চতায়। এমন করার উদ্দেশ্যটা কী? চোখের ভেল্‌কি। আসলে বাড়িটা যত উঁচু, এই কায়দায় বানানোর জন্য তা মনে হবে আরও উঁচু। কেন? কারণ, আমাদের চোখ জানে যে, দূরের জিনিস ছোট দেখায়, আর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি—সব তলার ঘরগুলো সমান উচ্চতার। তাই চোখ ভুল খবর দেয় মস্তিষ্ককে। একে স্থপতিবিদেরা বলেন 'আরোপিত পরিপ্রেক্ষিত' (f. rced perspective)। এই কায়দা ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের প্রায় সব উঁচু স্টাকচারের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছে। তা সে বাড়িই হোক বা পাহাড়ই হোক। যদিও স্থপতিবিদ সাধারণ ভাবে উচ্চতার ক্ষেত্রে 5/8 স্কেলটাই মেনে চলেছেন দেখছি। তাই ম্যাটারহর্ন পাহাড় (42) কিংবা স্লিপিং বিউটি প্রাসাদ (37) বাস্তবে যতটা উঁচু, চোখে দেখে তার চেয়ে বেশি মনে হয়। এইখানে আরও একটা কথা বলে রাখা ভাল। এই 'আরোপিত' পরিপ্রেক্ষিত' এমন কিছু নতুন ব্যাপার নয়। ভারতীয় স্থপতিবিদেরা অনেক-অনেক কাল আগে থেকেই এই ব্যাপারটা জানতেন। প্রায় সাতশ বছর আগে ঐ কায়দায় ভারতীয় স্থপতি দিল্লীর কুৎব-মিনারে একই জাতের ভেল্‌কি দেখিয়েছেন। তাই কুৎব-মিনার বাস্তবে যতটা উঁচু, চোখে দেখে তার চেয়ে বেশি মনে হয়।

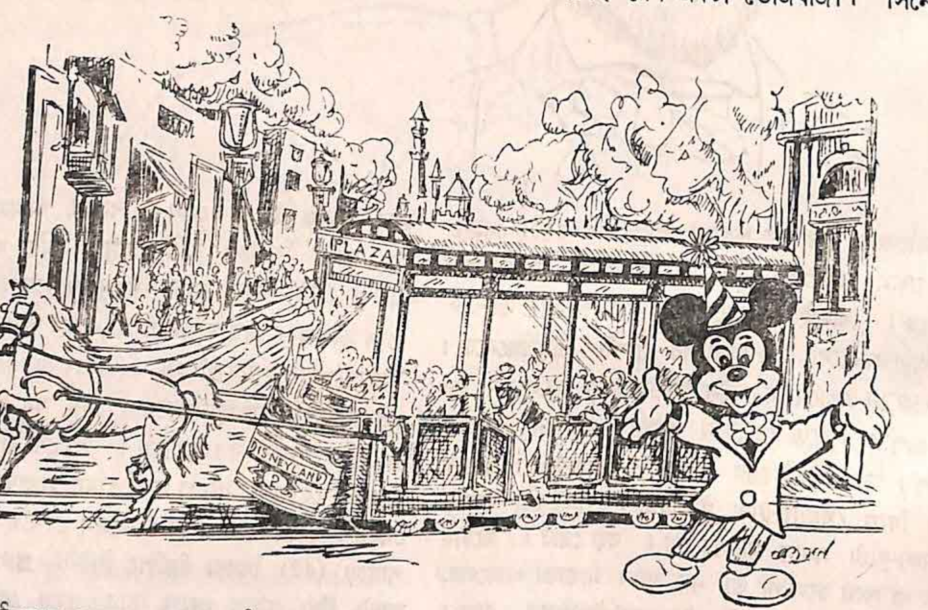
মেইন স্ট্রীটের দু-ধারে শুধু দোকান আর দোকান (16)। জানলায় জানলায় সুন্দর পণ্যের হাতছানি। কিন্তু আমার জেব ফাঁকা। দোকানে সময় নষ্ট করিনি।

ডানহাতি একটা বাড়িতে বিজ্ঞপ্তি: 'লিংকলন্ শো'।

কী ব্যাপার ? ওরা বলে, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, জন্মের শোধ একবার দেখেই এস না।

ভাগ্যে গেছিলাম !

(17) **এ্যাবে লিংকল্‌ন-এর সান্নিধ্যে :** আমেরিকার ষোড়শতম প্রেসিডেন্ট অ্যাব্রাহাম লিংকল্‌ন্‌কে (1809-65) না চেনে কে ? আমেরিকা থেকে দাস প্রথা উচ্ছেদে তাঁর ছিল প্রধান ভূমিকা। জীবনভর তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। 'স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার'—এই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। তাঁর সিদ্ধান্তে বিব্রত হল দাস ব্যবসায়ীরা। তারা



বিরক্ত হল, প্রতিবাদ করল, শেষমেশ বিদ্রোহ। অ্যাবে লিংকল্‌ন্‌ কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তে অটল—আমেরিকায় তিনি দাস প্রথা চল্‌তে দেবেন না। শান্তি- প্রিয় মানুষটিকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হল। অনেক লড়াই-কাজিয়া খতম করে স্বার্থপর, পুঁজিপতি, দাস- ব্যবসায়ীদের তিনি হারিয়ে দিলেন। বিদ্রোহীরা একে-একে এসে আত্মসমর্পণ করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দু-টুকরো হয়ে যাবে আশঙ্কা করে যাঁরা এতদিন প্রেসিডেন্টকে বিদ্রোহীদের সঙ্গে মাঝামাঝি রফা করতে বলছিলেন তাঁরাও আশ্বস্ত হলেন। সব বাধাবিঘ্ন সরিয়ে রণক্লান্ত বিজয়ী রাজপুত্রের মতো লিংকল্‌ন্‌ ফিরে এলেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। এবার বাকিজীবন শান্তিতে কাটাতে হবে। আর যুদ্ধ নয়। এবার দেশগঠনের কাজ। এমনি ছিল তাঁর স্বপ্ন।

কিন্তু পরাজিত দাস-ব্যবসায়ীরা সেটা হতে দিল না। নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিল তারা। গুড-ফ্রাইডের ছুটির দিনে প্রেসিডেন্ট সপরিবারে গিয়েছিলেন থিয়েটার দেখতে। সেখানে গুপ্ত ঘাতক তাঁকে গুলি করে হত্যা করে (1865)। ইতিহাসে অবশ্য লেখে – হত্যাকারী নাকি ছিল পাগল।

এখানে যে শো-টা দেখানো হয় তার প্রথম দিকটা নিছক সিনেমা ফিল্ম। ওঁর বাল্যজীবন, কৈশোর, ছাত্রজীবন, আইন পাশ করা এবং ওয়াশিংটনে এসে প্র্যাকটিস শুরু করা পর্যন্ত।

এর পরেই যেন একটা ভোজবাজী। সিনেমা-স্ক্রীনের ভিতর থেকে হঠাৎ স-শরীরে বার হয়ে এলেন অ্যাবে লিংকল্‌ন্‌। দর্শকদের একটা অভিবাদন করে তিনি একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। কে বলবে প্রাণবন্ত অ্যাবে লিংকল্‌ন্‌ স্বয়ং নন। হাঁটা-চলা, হাত পা নাড়া, একবার এ-পায়ে, একবার ও-পায়ে দেহভার ন্যস্ত করে দাঁড়ানোর স্বাভাবিক ভঙ্গিমা। আসলে এটাও প্রযুক্তি বিদ্যার একটা সুপ্রযুক্ত ভেল্‌কি : Audio Animatronics।

বক্তৃতাটি লিংকলন-এর বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভাষণের বিচ্ছিন্ন অংশ। যা তিনি জীবদ্দশায় দিয়েছিলেন – বালটি-মোরে, ইলিনয়ে অথবা রাজধানী ওয়াশিংটনে।

জ্যাক জানতে চায়, একই অভিনেতা বারে বারে একই বক্তৃতা দিতে দিতে কি ক্লান্ত হয়ে পড়েন না ?

ওকে বুঝিয়ে বলি, আসলে কোন অভিনেতা লিংকল্‌ন্ সেজে অভিনয় করছেন না। বক্তৃতা যে দিচ্ছে—কী বলব? —সে একটি যন্ত্র-মানুষ। হুবহু লিংকনের মতো দেখতে। তাই বোঝা যাচ্ছে না।

(18) **পঞ্চম-মুক্তির প্রাচীরচিত্র :** একই বাড়িতে হল-কামরার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এই প্রকাণ্ড প্রাচীরচিত্রটি না, জলরঙের মুরাল নয়, তৈলচিত্র। এঁকেছেন কয়েকজন প্রখ্যাত মার্কিন চিত্রকর। বিশ্বসংস্কৃতি ও বিজ্ঞানে কয়েকজন জগৎ-বিখ্যাত মার্কিন মনীষীর জীবনের নানান যুগান্তকারী ঘটনার চিত্র। গ্রামাফোন আর টেলিফোনের জনক আলেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেল (1847-1922); টেলিগ্রাফ-মেগাফোন-ইলেক্‌ট্রিক বাল্ব-এর আবিষ্কর্তা টমাস অ্যাল্‌ভা এডিসন (1847-1931); মার্কিন দেশের ইস্পাত-সম্রাট অ্যাণ্ড্রু কার্নেগী (1835-1918); এয়ারোপ্লেনের যুগ্ম-জনক রাইট-ব্রাদার্স (প্রথম ওড়ার তারিখঃ 17.12.1903); ফোর্ড-গাড়ির জনক হেন্‌রি ফোর্ড (1863-1947); নোবেল প্রাইজ পাওয়া সাহিত্যিক পার্ল বাক্ (1892-1973); নভচারী গর্ডার্ড এবং বিশেষণ-নিষ্প্রয়োজন প্রফেসার আলবার্ট আইস্টাইন (1879-1955)।

কিন্তু পঞ্চম মুক্তি কেন? তাহলে প্রথম চারটি মুক্তি কী?

জবাবটা জানা গেল একটু পরেই। ঐ দেওয়ালেই একটা তামার ফলকে খোদাই করা আছে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট-এর (1884-1945) একটি বাণী, যাতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন মানুষের চারটি জন্মগত অধিকারের কথা : "Freedom of speech, freedom of worship, freedom from want and freedom from fear." [মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ইচ্ছেমতো ঈশ্বর সেবার অধিকার; অভাব-অনটনের হাত থেকে মুক্তি, আর 'ভয় দেখিয়ে আমাকে দাবিয়ে রাখার ক্ষমতা কারও নেই' এই বিশ্বাসটুকু ধরে রাখার স্বাধীনতা]

ঠিক তার নিচেই আছে লিংকল্‌ন্ এর-পঞ্চম মুক্তির বাণী : I believe each individual is naturally entitled to do as he pleases with himself and the fruits of his labour, so far as it no-wise infringes with any other man's similar rights." ["আমি মনে করি – প্রতিটি মানুষের অধিকার আছে সিদ্ধান্তে আসার—সে নিজের জীবনটাকে নিয়ে কী করবে, নিজের শ্রমজাত ফসল সে কী ভাবে উপভোগ করবে। অবশ্য একটি মাত্র সর্তে : তার সেই সিদ্ধান্তে যেন অপর কোন মানুষের অনুরূপ অধিকারে বাধা সৃষ্টি না করে।"]

এ প্রদর্শনী সেই পঞ্চম মুক্তির।

(19) **ডিজ্‌নেল্যাড সিনেমা :** ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের অন্যতম আকর্ষণ। এখানে অতিবিখ্যাত সব ছোটদের ফিল্ম একের পর একটা দেখানো হয়। বিশেষ করে ওয়াল্ট ডিজ্‌নের অস্কার-বিজয়ী ছবিগুলি। প্রত্যেকটিই জনপ্রিয়। Steamboat Willie (1928); Snow White (1938); Pinocchio, Bambi, Dumbo, তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীযুগের ছবিগুলি—Cinderella ('50); Alice in Wonderland ('51); Sleeping Beauty ('59)। দেখানো হয় 20,000 Leagues Under the Sea ('54); Davy Crockett ('55)। এমন কি উনি শেষ জীবনে প্রাকৃতিক জীবজন্তুর উপর যে অনবদ্য ছবিগুলি তুলেছিলেন— ভ্যানিশিং প্রেয়ারি, মরুভূমি, ভল্লুকরাজ্য। এর যে-কোন একখানা ছবি কলকাতায় দেখানো হচ্ছে শুনলে নিশ্চয় হুমড়ি খেয়ে পড়তুম, কিন্তু ঐ বিশেষ দিনটির নির্দিষ্ট সময় থেকে কয়েকটা মিনিট সিনেমা দেখতে ব্যয় করা চলে না। দেওয়ালে-সাঁটা পোস্টারগুলো দেখেই ফিরে এলুম। এর পরে কোন ফিল্ম আছে তা খোঁজ নিইনি। পাছে লোভে পড়ে আটকে যাই।

(20) **ডিজ্‌নেল্যান্ড শো কেস :** ম্যাজিক শপ-এর ঠিক পাশটিতে। এ বাড়িতে ওয়াল্ট ডিজনে প্রডাকশনের ইতিহাস সাজানো। মডেল, পোস্টার আর ফটোগ্রাফ দিয়ে। Animated picture, যাকে আমরা সাদা বাংলায় 'কার্টুন ছবি' বলি তার আবিষ্কারকই ঐ ডিজ্‌নে। সেই প্রযুক্তি বিদ্যার জন্ম-ইতিহাস এখানে সাজানো। সব কথা বলার সময় নেই। একটা গল্প শুধু শোনাই : মিকি-মিনির জন্মকথা।

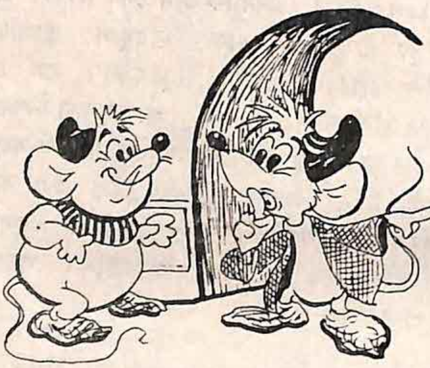
সাহেবের জীব বিবর্তনের আইন মেনে আবির্ভূত হয়নি।

ওয়াল্ট-ডিজ্‌নের কল্পজগতে জীবজন্তুগুলো ডারউইন-সাহেবের[1] জীব-বিবর্তনের আইন মেনে আবির্ভূত হয়নি। ওঁর এ দুনিয়ায় সবার আগে এসেছে মিকি-মিনি। তারপর প্লুটো কুকুর, ডোনাল ডাক, বাম্বি, বানি র‍্যাবিট, গুফি, পিগি ডেভি ক্রকেট, ডাম্‌বো ইত্যাদি ইত্যাদি।

হাত পা নাড়ার পর পর অবস্থার ছবি এঁকে ফিলম্ তুলে

যদি কোন সিনেমার স্ক্রীনে প্রজেক্ট করা যায়, তাহলে পুতুলকে যে জ্যান্ত মনে হবে এ-কথা ততদিনে আবিষ্কৃত হয়েছে। ডিজ্‌নে-সাহেব তাঁর স্টুডিওতে নানান জাতের ছবি এঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। ওঁর পাশের বাড়ির একটি ছেলে, মাইকেল - ডাক নাম মাইক, সকাল-সন্ধ্যা এসে বসে থাকত ওঁর স্টুডিওতে। ছবি আঁকা দেখত বসে বসে।

একদিন হয়েছে কি—সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে ডিজ্‌নে দেখেন কোথা থেকে এসে জুটেছে একজোড়া নেংটি ইঁদুর। এঁটো প্লেট থেকে রুটির টুকরো কুটুর-কুটুর করে খাচ্ছে। একটা একটু বয়স্ক, একটা অল্পবয়সী। যেন খুড়ো-ভাইপো। ডিজ্‌নে-সাহেব কল্পনাপ্রবণ। তাঁর মনে হল খুড়োটা বুদ্ধু, পেট মোটা, পেটুক আর ভাইপোটা বেশ চালাক চতুর। ভাইপো যেন এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছে আর পিছন ফিরে খুড়োকে সাবধান করছে: আস্তে! শব্দ কর না।



"আস্তে! শব্দ কর না!"

ওঁকে জেগে উঠতে দেখেই ইঁদুরদুটো কিচ্‌কিচ্‌ করে ছুটে পালালো। যেন শাপ-শাপান্ত করতে করতে। ডিজ্‌নে সাহেবের মনে হল ও যেন বলছে, "ঈশ। আরাম করে এট্টু খেতেও দেবে না। এই সাত-সকালে তড়বড়িয়ে ওঠার কী দরকার? সবাই যেন ম্যাও সাহেব!"

ডিজ্‌নে একটা আইডিয়া পেয়ে গেলেন। ওঁর গল্পে হিরো হবে চালাক-চতুর ভাইপো, কমিক-চরিত্র পেটমোটা খুড়ো, আর খলনায়ক—বেড়াল।

সারাদিন ধরে উনি স্কেচ আঁকলেন।

ছবিগুলো ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইল। রাত্রে শুতে যাবার সময় এঁটো-প্লেটটা টেবিলের উপর তুলে রাখলেন। তাতে রইল কিছু বিস্কিট আর চীজ।

পরদিন ঘুম ভেঙে দেখেন, নেংটি যথারীতি এসেছে! আজ একাই। কুটুর-কুটুর খাচ্ছে। ওঁকে জেগে উঠ্‌তে দেখে আজ কিন্তু সে ভয় পেল না। কুৎকুতে কুচফলের মতো একজোড়া লাল চোখ মেলে ওঁকে দেখতে থাকে।

ডিজ্‌নে বলেন, কি রে নেংটি? তোর ছবি কেমন হয়েছে? নিজেকে চিনতে পারছিস্?

হঠাৎ সম্বিত পেয়ে নেংটিটা চিৎকার করে ওঠে—ঈচ্! কিচ্-কিচ্!

ডিজ্‌নের মনে হল নেংটি যেন স্পষ্ট বললে, ঈশ্! বিচ্ছিরি!



"ঈশ বিচ্ছিরি!"

বিচ্ছিরি! এমন সুন্দর পোট্রেক পছন্দ হল না নেংটির? ডিজ্‌নের মনটা খারাপ হয়ে গেল! সন্ধ্যাবেলায় মাইক এল। তাকে সব কথা খুলে বললেন। এমনকি নেংটির সেই নাক-সিঁটকানো—'ঈশ! বিচ্ছিরি' পর্যন্ত! মাইক সব শুনল। ছবিগুলোও দেখল গম্ভীর হয়ে। একটুও হাসছে না সে। গম্ভীর হয়ে কী-যেন ভাবছে।

ডিজ্‌নে ঘাবড়ে যান। বলেন, কী মাইক? তোমারও ইঁদুরের ছবিগুলো 'বিচ্ছিরি' লাগছে নাকি?

মাইক গম্ভীর হয়েই বললে, না। 'বিচ্ছিরি' লাগছে বলব না, তবে কেমন যেন ইয়ে মতো লাগছে!

—ইয়ে মতো মানে? 'কিয়ে' মতো?

—কেমন যেন ঠিক ইঁদুর ইঁদুর লাগছে!

— বাঃ! তাই তো হবে! ইঁদুরের ছবি কি জিরাফের মতো দেখতে হবে? তোমার যেন বুদ্ধি!

—তাও তো বটে!

কিন্তু পরে ডিজ্‌নের মনে হল—স্বাভাবিক সারল্যে মাইক শিল্পসত্যের এক সার্থক কথা বলেছে! ওঁর ছবিতে ঐটেই ত্রুটি—বড় বেশি 'ইঁদুর ইঁদুর' হয়েছে! মানে—বড় বেশি বাস্তব-ঘেঁষা! অ্যালিস্, সিণ্ডেরেলা, স্নো-হোয়াইট যতই সুন্দরী হ'ক—তারা পুরোপুরি কল্পলোকের নয়! কল্পকুমারীর পাখনা থাকবে, লেজ থাকবে, তবেই না সে পরী, দ্য লিট্‌ল্ মারমেড্? ডিজ্‌নে নতুন করে আঁকলেন। ইঁদুরের কানদুটো পুরোপুরি গোল করে দিলেন। নাকের উপর একটা পুঁটুলি, সেটাও গোল। হাতের আঙুল একটা করে কমিয়ে দিলেন।

এবার মাইকের পছন্দ হল। ডিজ্‌নে বলেন, তোমার বুদ্ধিতেই ওর এই খানদানী বদনখানা হয়েছে, তাই ওর নাম,

'মাইক-মাউস' বা সংক্ষেপে 'মিকি-মাউস্' ।

—কিন্তু ওর সঙ্গী তো একটা বুড়ো ?

– বুড়ো, তাই কী ?

—বাঃ ! বুড়োর সঙ্গে কী বাচ্চার ভাব হয় ?

—কেন হবে না ? এই তো তোমার সঙ্গে আমার দিব্যি হয়েছে ! হয়নি ?

- তাও তো বটে !

পরদিন সকালে ডিজ্‌নের নজর হল—নেংটি তার সমবয়স্ক একটি সঙ্গীকে নিয়ে এসেছে। সে কিন্তু খাবারের প্লেটের দিকে ভিড়ল না ; ওঁর ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের ছবি দেখতে পেয়েই তন্ময় হয়ে গেল। যেন দেখছে, – মাথার রিবনটা ঠিক আছে তো? ডিজ্‌নে বুঝতে পারলেন, এটি মিকির বন্ধু নয়, বান্ধবী ।



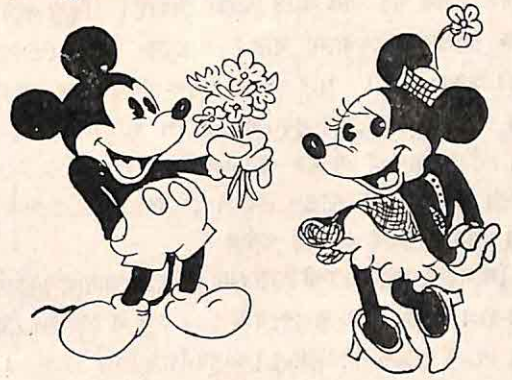
"— মাথার রিবনটা ঠিক আছে তো ?"

কেন জান ? [এইখানে আমার ক্ষুদে পাঠিকার সঙ্গে জনান্তিকে একটা কথা বলে নিতে চাই (ক্ষুদে পাঠকদের কিন্তু আমাদের এই প্রাইভেট-টক্‌টা পড়া বারণ) । তুমি লক্ষ্য করে দেখ, দিদিভাই, তোমাদের ক্লাসের সব কয়টা মেয়ে —অবশ্য তুমি বাদে—কোনো ঘরে ঢুকে যদি আয়না দেখতে পায়, তখনই কেমন তন্ময় হয়ে পড়ে : চুলটা ঠিক আছে তো ? টিপটা ধেবড়ে যায়নি তো ? পাউডার ভেসে ওঠেনি তো ? তাই দেখেই ডিজ্‌নে বুঝেছিলেন— মিকির ঐ সঙ্গীটা আসলে বান্ধবী, বন্ধু নয় ।]

ডিজ্‌নে নতুন গল্প ফাঁদলেন ।

এল মিকির বান্ধবী—মিনি !

তাকে চিনবে—পায়ের হাইহিল জুতোয়, আর রিবন দেখে। আর তার চোখে তিনটে করে পক্ষ্ম বা eye-lash । মিকি মাঝে মাঝে ফুলের তোড়া এনে মিনিকে উপহার দেয় । বলে, এই ফুলের তোড়াটা তোমার জন্য এনেছি !



"এই ফুলের তোড়াটা তোমার জন্য এনেছি !"

ছবি বাজারে বের হল। হৈচৈ পড়ে গেল। মিকি-মাউস্-এর অ্যাডভেঞ্চার দারুণ জনপ্রিয়। দর্শকদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত ডিজ্‌নে ওদের বিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। একটা পুরানো আমলের ফোর্ড গাড়ি চড়ে মিকি-মিনি তাদের হনিমুন করতে বেরিয়ে পড়ে। এরপরে বাংলা মতে : ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাকাড়া...ইংরাজি মতে : And they lived happily ever afterwords !



একটা পুরানো মডেলের ফোর্ড গাড়িতে...

ডিজ্‌নেল্যাণ্ড শো-রুম থেকে বেরিয়ে দেখি রাস্তায় একটা জটলা। কী ব্যাপার? আমি তালঢ্যাঙা মানুষ, জিরাফের মতো ভিড়ের উপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখি - ঠিক মাঝখানে একটি নধরকান্তি 'ডোনাল ডাক' বেহালা ধরনের একটা ব্যাঞ্জো বাজিয়ে গান গাইছে! করুণ সুরে! দৃশ্যটা দেখবার মতো বটে। জ্যাক-জিল দুজনেই দেখতে চাইল। তাদের একের পর এক কাঁধে তুলে দেখাই। কিন্তু ওদের মাকে কীভাবে দেখানো যায়? তাকে কাঁধে তোলার হিম্মৎ আমার নেই। আর নেহাৎ হেঁইও-হেঁইও করে ওদের মাকে কাঁধে তুল্‌লে সেটা খুব শোভন দৃশ্য হবে না। ভাগ্য ভাল; ঠিক তখনই এগিয়ে এল একজন পুলিস। ভিড়টাকে চারিয়ে দিল বৃহত্তর বৃত্তে। যাতে বেঁটেরাও দেখতে পায়। এখন আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি।

সিনেমায়, মানে ওয়াল্ট ডিজ্‌নের ছবিতে ডোনাল ডাককে হামে-হাল ব্যাঞ্জো বাজাতে দেখেছি। কিন্তু এ তো সিনেমা নয়। এ যে প্রকাশ্য দিবালোক! মানুষ-গিজ্‌গিজ্‌ রাস্তায়!

জ্যাকের মা বলে, ও একটা বিরহের গান গাইছে! কথাগুলোর মানে, "এমন ঝল্‌মল্‌ দিন, অথচ তুমি কতদূরে!"



"এমন দিনে তারে বলা যায়।"

আমি বলি, ও হাঁস, না হাঁসী?

নীস্ আমাকে ধমক দেয়, ছিঃ! তুমি কেমন মানুষ মানুষ বাপু? শুনছ বিরহের গান, তা নিয়ে এত হাসাহাসির কি আছে? করুণ-গানে কি হাসাহাসি করতে হয়?

আমি বলি, কী আপদ! ওর দুঃখ নিয়ে আমি কেন হাসাহাসি করব? তা নয়, তুমি আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারছ না। মানে আমার প্রশ্ন—ওটা duck, না ডাকী?

নীস্ বলে, না, না। এখন ওকে ডাকাডাকি করাও ঠিক নয়। আপন মনে গান গাইছে, তাই গাক। গান গাক।

আমার ইচ্ছে করছিল এবার আমিই ওকে ধমক লাগাই। বলি, না, না, ওর দুঃখের মাঝে তোমার গাঁক গাঁক করাটাও ভাল নয়। কিন্তু তার আগেই জ্যাক বলে, হাঁস-হাঁসী যাই হোক, আমার প্রশ্ন - ও কলের পুতুল, না কোনও বাচ্চা ছেলে মুখোস পরে এ রকমভাবে ডোনাল-ডাক সেজেছে?

এখানে Audio-Animatronics-এর এমন এমন ভেল্‌কি দেখছি যে, সাহস করে জবাব দিতে পারি না! জ্যাকের মা ওকে ধমক দেয়, কী বারে বারে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছ। সেটা জানলে তোমার কি আর দুটো ডানা গজাবে?

ধমক খেয়ে জ্যাক থেমে যায়।

কিন্তু ততক্ষণে আমার মগজে জেগেছে আর একটা প্রশ্ন: 'আর দুটো ডানা' মানে? জ্যাকের পিঠে কি আগে থেকেই এক-জোড়া ডানা আছে? কই আমার তো এতক্ষণ নজরে পড়েনি? প্রশ্নটা পেশ করতে যাব, ঠিক তখনই জন্তুটা — সেটা হাঁসই হোক বা হাঁসীই হোক, অথবা বাচ্চা ছেলে, কিম্বা কলের পুতুল যাই হোক, তার বাজনা থামালো। সবাই হাততালি দেয়। জন্তু বা পুতুলটা ভারী ভদ্র। কার্টিসী জানে। বারে বারে মাজা ভেঙে 'বাও' করল।

কোথাও কিছু নেই জিল একছুটে চলে যায় সামনে। জন্তুটার সমুখে মাজায় দুহাত দিয়ে দাঁড়ায়। ঘাড়টা কাৎ করে মুরুব্বিচালে বলে, 'হা-ই ডোনাল্ড। তুমি সত্যির না মিথ্যের?'

জন্তুটা তারস্বরে চিক্কুর পাড়ে: কোয়াক! কোয়াক! ভাবখানা, একী ঝামেলায় পড়লাম রে-বাবা।

সবাই হো-হো করে হেসে ওঠে।

জিল অপ্রস্তুত। জ্যাক ওকে হাত ধরে ধেনে আনে।

নীস বলে, ঐ দেখ একটা ঘোড়ায়-টানা ট্রাম। চাপবে?

তাই তো। এক-ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলেছে ঘড়ঘড়িয়ে। ঘোড়ায়-টানা ট্রামের ছবি দেখেছি। এককালে কলকাতাতেও ছিল। সে অনেক-অনেককাল আগেকার কথা। এ ট্রামটা মেইন-স্ট্রীটের রেলরোড স্টেশান (15) থেকে সেণ্ট্রাল প্লাজা

পর্যন্ত যাতায়াত করে। ভাড়া লাগে না। আগেই বলেছি, ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে ঢোকার সময়ে যে টিকিটের দাম দিয়েছ (আমার লেগেছিল তের ডলার) তাতেই যতবার ইচ্ছে ট্রাম, ট্রেন, গণ্ডোলা বা মনোরেলে চাপতে পারবে। বস্তুত কোন কিছু দেখতে বা চড়তে আর টিকিট লাগে না।

একটা ট্রাম এসে থামল। এক এক দিকে পাঁচটা দরজা। পাঁচ সারিতে চার-পাঁচে কুড়িটা সীট। খুব ছেলে-বেলায় আমরা শিবপুর-বাঁধাঘাট লাইনে এ জাতের ট্রাম দেখেছি। না, না, ঘোড়ায়-টানা ট্রাম নয়—সে আমার জন্মের আগেই কলকাতা থেকে উধাও হয়েছে—আমরা দেখেছি, এই চেহারার ট্রাম দু-দিকেই অনেকগুলি দরজা-ওয়ালা।



অনেক যাত্রী নামল ট্রাম থেকে। আর তখনই নজর হল—বললে বিশ্বাস করবে না, একটি নধর জ্যান্ত মিকি-মাউস। মিনি নয়, মাথায় রিবন নেই, পায়ে নেই হাইহিল জুতো। এই আমার বুক সমান খাড়াই। মানে দশ-বারো বছরের একটা ছেলে যতটা খাড়াই হয়। ইয়া বড়কা-বড়কা কান। একটি পুরুষ্টু কুচকুচে কালো নিটোল লেজ। আবার আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কথা বলছে না, কিন্তু ভাবখানা—'যাবেন নাকি বাবু? ধরমতলা...এস্‌প্লানেড ..বিবাদীবাগ...হাওড়া।'

জ্যাক আমার কানে কানে কী একটা প্রশ্ন করার উপক্রম করতেই আমি বলে উঠি: জানি না!



বেশ বুঝতে পারি, ঐ একটা প্রশ্নই ওর মগজে ক্রমাগত চক্কর মারছে—এরা পুতুল, না সেজেছে?

যা হোক, সবাই মিলে ঘোড়ায়-টানা ট্রামে চেপে বসি। মিকি-মাউসটা শেষমেশ উঠল না। দূর থেকে শুধু হাত নাড়ল। ঘোড়াগুলো বেশ নতুন ধরনের। আগে এ জাতের ঘোড়া কখনো দেখিনি। পায়ের কাছে গোছা গোছা লোম। ধব্‌ধবে সাদা। ঘাড়েও তাই। ওরা বলল, এগুলি বেল-জিয়ান ঘোড়া। সুন্দর দেখতে। আরও বলল, ওদের পায়ে নাকি লোহার নাল লাগানো নয়, তার বদলে polpurethane নামের কী একটা প্লাস্টিকের নাল। যা নাকি প্রতি সপ্তাহে মেরামত অথবা বদল করতে হয়। ত হোক, এতে অ্যাস্‌ফল্ট রাস্তায় ঘোড়াদের চলতে নাকি বেশি সুবিধা হয়। শব্দটাও বেশ জবর। ক্লপ-ক্লপ! ক্লপ-ক্লপ!

ঘোড়াদের কোন ইউনিয়ন আছে বলে শুনিনি, কিছু ওদের ডিউটি-আওয়ার্স বাঁধা। চার ঘণ্টা অন্তর ডিউটি বদল হয়। এই চার ঘণ্টার মধ্যে স্টেশান বা সেন্ট্রাল প্লাজায় ট্রামটা পৌঁছালে দশ মিনিটের কফি-ব্রেক; মানে তোমাদের স্কুলের ভাষায় টিফিনের ছুটি। সপ্তাহে পাঁচদিন কাজ, পুরো দুদিন ছুটি। ফ্রি কোয়ার্টার্স। তবে ওভারটাইম বা বোনাসের ব্যবস্থা নেই। ঘোড়াদের যদি ইউনিয়ান থেকেই থাকে তবে ওদের আলাদা রাজনৈতিক-দাদা। আমার টেকো-নাতির ইউনিয়নের ধর্মঘটে যারা 'নিপাত যাক্‌, নিপাত যাক্‌' করছে, ঘোড়ারা তাতে সামিল হয়নি।

ট্রামে চেপে ঘুরে এলাম প্লাজা। দুপাশে পুরানো আমলের বাড়ি। দেখলে মনে হয়, বেশ উঁচু। আসলে সেই আরোপিত পরিপ্রেক্ষিতের ভেল্‌কি। প্রথমেই বাঁ-হাতি—একটা এম্পোরিয়াম, ক্রিস্টাল আর্কেড ইত্যাদি। জানালায় জানালায় নানান পুতুলের হাতছানি। কোথাও বানি-র‍্যাবিট্‌ ধেই ধেই নাচছে, কোথাও খ্যাঁক-শেয়ালের লোভী দৃষ্টি, কোথাও বা টেডি বেয়ারের বিস্মিত চাহনি।



তারপর ম্যাজিক-শপ।

এখানে নানান ম্যাজিকের খেলা দেখানো হয়। ম্যাজিক শিখিয়েও দেওয়া হয়। ম্যাজিক দেখাবার নানান সরঞ্জামও কিনতে পাওয়া যায়। এ দোকানে আর একটা ব্যবস্থা আছে। ছোট ছোট কেবিন, তাতে তুমি ইচ্ছে করলে নানান বিচিত্র

পোশাকে সাজতে পার। এখানে একটা মজার গপ্প শুনলাম। বছর কয়েক আগে ডিজ্‌নেল্যাণ্ড দেখতে এসেছিলেন 'বেটি হাটন'– আমেরিকার এক জনপ্রিয় সুন্দরী চিত্রতারকা। মুশকিল হল, বেচারিকে সবাই এমন ছ্যাঁকাবান করে ঘিরে ধরল যে, বেটি হাটন কিছুই দেখতে পায় না। শত শত ছেলে-মেয়ে ওর কাছে ক্রমাগত অটোগ্রাফ চাইছে। রাস্তায় ভিড়ে ভিড়। বেটি হাটন চট করে ঢুকে গেল ঐ ম্যাজিক-শপে। অটোগ্রাফ শিকারীরা দোকানের সামনে ট্র্যাফিক জাম করে দাঁড়িয়ে রইল। কারণ দোকানের লোহার গেট বন্ধ হয়ে গেছে। ভিতরে নাকি প্রচণ্ড ভিড়। সবাই রাস্তায় বসে পড়ে। এক সময় তো তাদের প্রিয় চিত্রতারকা দোকান হতে বার হবেই। তখন ওরা তাকে ফের পাকড়াও করবে।

তা কিন্তু পারেনি ওরা। বেটিকে পাকড়াও করতে।

বেটি হাটন যে কখন ছদ্মবেশ পরে বার হয়ে এসেছে তা কেউ টেরই পায়নি। সে সেজেছে এক খুনখুনে বুড়ি। জনতা যখন বেটিকে খুঁজে না পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করছে তখন দেখা গেল এক বৃদ্ধাও খুব উত্তেজিতা। জনতাকে নেতৃত্ব দিয়ে খুনখুনে বুড়ির গলায় চিল্লাচ্ছেন '—আমি স্বচক্ষে দেখেছি বেটিকে এই দোকানে ঢুকতে। মামদোবাজী পেয়েছ? ও নিশ্চয় ঐ দোকানেই' লুকিয়ে আছে। চল, আমরা খুঁজে দেখি। কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি সেই বুড়ি নিজেই ছদ্মবেশী বেটি হাটন স্বয়ং!



ট্রামে চড়ার পর থেকেই জ্যাক-জিল দুজনে নিজেদের মধ্যে কী সব গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর করছে। নিশ্চয় কোন মতলব ভাঁজছে। সেন্ট্রাল প্লাজা ঘুরে আবার স্টেশান-স্টপেজে ফিরে এসে ট্রাম থেকে নেমে দেখি, ডোনাল আর মিকি যৌথ কনসার্ট জুড়েছে। নীস্ বলে, তুমি জ্যাক-জিলকে সামলাও একটু, আমি কিছু 'সুভেনির' কিনব।

আমি রাজী হই। বেশ গান বাজনা হচ্ছে। শেষ হতে সবাই হাততালি দেয়! আর ওরা মাজা ভেঙে 'বাও' করে। হঠাৎ জ্যাক-জিল দুজনেই আমার হাত ছাড়িয়ে ধাঁ করে ছুটে গেল সেদিকে। আচমকা দুজনে ডোনাল ডাক-এর দু-হাত দুদিকে ধরে টানতে থাকে। আর পরিত্রাহী চিল্লাচ্ছে —এবার? বলতো বাছাধন? তুমি কী? পুতুল না মানুষ?

মিকি যেন ম্যাও দেখেছে। চোঁ-চাঁ ছুটেছে লেজ উঁচিয়ে। ইঁদুরই হবে। না হলে অমন প্রিং করে লাফ মেরে ট্রামে উঠতে পারে কখনো?

আর ডোনাল্ড তার অভ্যস্ত 'কোয়াক-কোয়াক' ভুলে কাতর স্বরে বলছে: ওরে ছেড়ে দে। এই নাকখৎ দিচ্ছি! আমার চাকরি যাবে। মানুষ কেন হব? আমি তো সত্যিই ডোনাল ডাক। 'কোয়াক-কোয়াক!' এই তো ডাকছি! বলছে কিন্তু দিব্যি মানুষের বাচ্চার কণ্ঠস্বরে।



"আমি তো সত্যিই ডোনাল ডাক!"



এডভেঞ্চারল্যাণ্ড

মেইন স্ট্রীট, ইউ. এস. এ-র পশ্চিমে 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারল্যাণ্ড'। 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার'-এর নেশা মানুষের মজ্জাগত। কখনো তা অজানাকে জানবার, অচেনাকে চিনবার স্পৃহা। যেজন্যে যুগে যুগে মানুষ ঘর ছেড়ে পথে নেমেছে। যেমন—মার্কোপোলো,[1] লিভিংস্টোন,[2] কলম্বাস[3] বা আমাদের বিজয়সিংহ[4]। আবার কখনো বা শুধু রোমাঞ্চের খোঁজে। এভারেস্ট জয় করার পরেও দলে দলে অভিযাত্রী দল গেছে মৃত্যু মুঠোয় করে, আবার ঐ শৃঙ্গটা জয় করতে। মধ্যযুগে—এমনকি এখনো কেউ কেউ শিকারে যায় –বন্য জীবজন্তুকে হত্যা করতে। যেন, তাতেই প্রমাণ হবে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য।'

এখানে আমরা দেখব তিন তিনটে অভিযান: 'জঙ্গল কুইজ', 'গাছ বাড়ি' আর 'টিকিটিকি'। প্রথমটায় সেই মধ্যযুগীয় মানসিকতা—জীবজন্তুকে শিকার করা, দ্বিতীয়টায় বিপদের সঙ্গে যুঝবার চেষ্টা, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে; আর তৃতীয়টায় সত্যিকারের প্রকৃতি-প্রেমিকের অভিযান – 'বার্ড-ওয়াচার'-দের প্রকৃতিকে জানবার স্পৃহা।

আমরা একে একে দেখব।

এখানেও সারি সারি সাজানো দোকান। নানান দেশের পুতুল আর কিউরিও। অ্যাডভেঞ্চার বাজার (21); ট্রপিকাল-ইম্পোর্ট'স্ (22); সাউথ সী ট্রেডার্স (23); গুয়াটামেলা পণ্য-বিপনী (24)। অনেকগুলো খাবারের দোকান। আমরা এখানে মধ্যাহ্ন আহারটা সেরে নিলাম। না, দোকানে নয়, গাছতলায় বসে। জ্যাকের মাও লাঞ্চ-প্যাকেট নিয়ে এসেছিল; কারণ সেও জানে এসব জায়গায় খাবারের দাম একটু বেশি।

(25) **অরণ্য অভিযান:** সামনে একটা নদী। কাঠের-পাটাতন-ফেলা একটি জেটি। আঁকাবাঁকা নদীটার মাঝখানে একটা দ্বীপ। ঐ দ্বীপ বাস্তবে একটা চিড়িয়াখানা। তার কিছু জীবজন্তু বাস্তব, কিছু পুতুল। পুস্তানির ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেভাবে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত। কাঁটা-তারের বেড়া। কিন্তু গাছপালার নেই কাঁটাতার আড়াল করা। নদীপথে চল্‌তে চল্‌তে জীবজন্তুদের দেখা যায়—মনে হয় তারা মুক্ত প্রাণী।

খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে আছে একের পিছে এক স্টীম-বোট। আমরা চারজনে একটাতে চেপে বসি। একটু পরেই নৌকা যাত্রীতে টুইটুম্বুর হয়ে গেল। মাঝি, সে কিন্তু স্যুটপরা-লালমুখো আমেরিকান—মাইক্রোফোন হাতে বোতাম টিপে স্টীমবোট চালাচ্ছে। আমাদের 'স্বাগত' জানালো। লোকটা খুব রসিক। গেঁয়ো-মানুষের ভাষা নকল করে বললে, 'বাবু-মশাইরা জলে হাত দিয়েন না যান, মানুষ-খেকো কুম্ভীরে গাঙ যান কিল্‌বিল্‌ করতিছে!

ঠিক কিল্‌বিল না করলেও অনেক কুমীর যে জলে নাকটুকু জাগিয়ে ভাসছে তা নজর হল। সত্যিকারের না পুতুল, তা বুঝতে পারি না। জলে হাত দিয়ে পরখ করতেও সাহস-হল না। জ্যাক বলে, ও মাঝি দাদা, এ নদীর নাম কী? সাহেব মাঝি বললে, নাম নাই। তয় এডা হতিছে জাম্বেজীর এক শাখানদী আর আমেজনের উপনদী! বুঝলা না?

জ্যাক বলে, আদৌ না! সেটা কেমন করে হবে? জাম্বেজী আফ্রিকায় আর আমেজন যে দক্ষিণ আমেরিকায়। এমন অদ্ভুত ব্যাপারটা কি করে হবে?

মাঝি একগাল হেসে বলে, হয় হয়, 'ঢানতি' পার না। ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে হক্কলই হইবার পারে!

নৌকা চল্‌তে শুরু করে। আমি জিল্‌কে বলি, বোট-ম্যানের হাত ধরে টানাটানি করতে যেও না আবার। ও পুতুল নয়, মানুষ! বুঝেছ নিশ্চয়?

জ্যাক আবার কানে কানে—মানে, যাতে জিল শুন্‌তে পায়—বলে, জিলের মতো বুদ্ধুও সেটা বুঝতে পেরেছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, গ্র্যাণ্ড-পা।

জিল আগুন-ঝরা চোখে দাদার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে। কথা বলে না।

দশ মিনিটের নৌ-বিহার।

নদীর দু-ধারে ঘন বন। বিষুববৃত্তের কাছাকাছি যেমন চিরসবুজ অরণ্য দেখা যায়। সেগুলো কিন্তু সত্যিকারের গাছ। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। এটাও একটা বিজ্ঞানের ভেল্‌কি, যার কোন হদিস্‌ পাইনি। ডিজ্‌নেল্যাণ্ড কর্কট-ক্রান্তি রেখার আরও দশ ডিগ্রি উত্তরে। সেখানে ওরা কেমন করে বাঁচিয়ে রেখেছে এই বিষুব-অঞ্চলের চিরহরিৎ অরণ্য? তাছাড়া দেখলে মনে হয় গাছগুলোর বয়স পঞ্চাশ-ষাট বছর! অথচ ডিজ্‌নেল্যাণ্ড জন্মই নিয়েছে দু-তিন দশক আগে!

কোথাও অন্ধকারে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, কোথাও বা সিংহ-সিংহী। জাগুয়ার, পুমা, আলাস্কার ভাল্লুক! ঠিকই বলেছে মাঝি! এখানে বিশ্বের সব অরণ্য হাত মিলিয়েছে! টাঙ্গানাইকার জঙ্গল এসে হাত মিলিয়েছে সুন্দরবনের সঙ্গে, আলাস্কার ভাল্লুক এসে মিতালী করছে অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারুর সঙ্গে! গভীর জঙ্গলে দেখতে পেলাম একটি গরিলা পরিবার—মাদী-মদ্দা আর বাচ্চা। নৌকাটা যখন একটা নিচু গাছের ডালের তলা দিয়ে যাচ্ছে তখন সাহেব মাঝি আমাদের সতর্ক করে দেয়, খুব হুঁশিয়ার বাবুমশয়রা। পরে আমাকে দোষ দিয়েন্না! বিপদ আস্‌তিসে কিন্তুক। নিজের নিজের টুপি সাম্‌লান।



আমরা সবাই সাবধানে মাথা নিচু করি, যাতে গাছের ঐ ঝোলা-ডালে ধাক্কা না লাগে। যেন সমবেতভাবে আমরা অরণ্য-দেবতাকে প্রণতি জানাচ্ছি।

ঠিক তখনই গাছের ঐ ঝোলা-ডাল থেকে তিন-তিন্‌টে 'কিং কোবরা' নৌকার তিনটে অংশে একসঙ্গে ছোবল মারল—হিস্‌স্‌স্‌!

তিনচার হাত ঝুলে পড়ে সাপগুলো!

একটি মার্কিন-মহিলা আসনচ্যুত হয়ে কাঠের মেঝেতে উল্টে পড়লেন ধ্রাশ্‌ করে। দু-চারজন চিৎকার করে ওঠে - ও বাবা গো!

রবারের স্প্রিং-লাগানো সাপ। পরমুহূর্তেই তারা সটাসট ফিরে গেছে গাছের ডালে। লতাপাতায় বেমালুম মিশে গেছে। আবার তারা অপেক্ষা করে আছে পরবর্তী নৌকার অসতর্ক যাত্রীদের জন্যে।

সাহেব-মাঝি গ্রাম্য ইয়াঙ্কি-উচ্চারণে যা বল্‌লে তার বিশুদ্ধ পূর্ববঙ্গানুবাদ—দ্যাহেন দেহি মাঠান! পই পই করি কইলাম—বিপদ্‌ আস্‌তিসে। কথাডা কানে নিলেন না তো?

ভদ্রমহিলার সঙ্গী—স্বামীই হবেন হয়তো,—প্রতিবাদ করেন, তুমি তো শুধু টুপি সামলাবার কথা বলেছিলে। যাতে গাছের ডালে ধাক্কা না লাগে। সাপের কথা একবারও বলেছ? তাই তো এমন কাণ্ডটা ঘটল!

একগাল হাসল সাহেব-মাঝি। বলে, এডা কি কইলেন কত্তা? গিন্নির থিকা আপনের টুপিডাই আপন হইল? অ্যাঁ? পেরথমে তো মা-ঠান্‌'রে সামলাইবেন, তয় না টুপি? না কি কন বাবুমশয়রা?

নৌকা শুদ্ধ সবাই হো-হো করে হেসে ওঠে।

আবার কিছুটা যেতেই জল থেকে মাথা তুল্‌ল একটা প্রকাণ্ড হিপ্পো—হু-স্‌ করে। মুখটা হাঁ করল। এবার কিন্তু কেউই ভয় পেল না। সবাই সতর্ক হয়ে গেছে। ক্লিক্‌ করে শাটার টিপে হিপ্পোটাকে ধরে ফেললাম ক্যামেরায়। পরে দেখেছি, ছবিটা ভালই উঠেছিল।

জিল আমার কানে কানে—যাতে দাদা শুনতে পায়,—বলে, হিপ্পোটা যে কলের পুতুল সেটা জ্যাকের মতো বুদ্ধুও বুঝতে পেরেছে, তুমি লক্ষ্য করেছ গ্র্যাণ্ড-পা?

মজা হচ্ছে এই যে, বোতাম টিপে কিন্তু কেউ এই সাপ বা হিপ্পোকে পরিচালিত করছে না। ওদের ইলেকট্রনিক সার্কিট এমনভাবে বাঁধা যে, নৌকাটা একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে এলেই আপনা থেকে ওরা এটা করবে। ব্যাপারটা কেন হয় তা জানতে পারবে যদি কখনো গুরুসদয় দত্ত রোডের বিড়লা টেক্‌নোলজিক্যাল মিউজিয়ামে যাও। তিনতলার একটি ঘরে এই প্রযুক্তি-বিদ্যাটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

যাত্রীদলের মধ্যে একা আমিই নোট নিচ্ছি। স্কেচ আঁকছি। আর সবাই শুধু ফটো তুলছে; কেউ বা মুভি ক্যামেরায়। হয়তো তাই সাহেব-মাঝি ধরে নিল আমি এক গবেষক-মনা তালেবর যাত্রী। বললে, নোট বইতে এ কথাও লিখে রাখ -এই জীবজন্তুগুলির অপূর্ব মডেল যাঁর তত্ত্বাবধানে বানানো হয়েছে তাঁর নাম বব্‌ ম্যাটে (Bob Mattey)। তিনি কে জান ?

আমি অজ্ঞতা প্রকাশ করায় বললে, হলিউডের সবচেয়ে নামকরা Audio Animatronics-বিশারদ। 'টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস্‌ আণ্ডার দ্য সী'-র সেই জায়েন্ট স্কুইড থেকে হাল-আমলের 'জস্‌'-এর কীলার-হোয়েল এঁরই কীর্তি। বাই দ্য ওয়ে, তুমি কোন্‌ দেশের লোক ?

—ঐ বড়-শেয়ালের।—রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটার দিকে আঙুল দেখিয়ে আমি বলি।

—বড় শেয়াল। Big Jackal। তার মানে কী ?

আমি বুঝিয়ে বলি, রাতে ভূতের নাম করতে নেই তা জান তো ? Mention the Devil and the Devil is there ! তেমনি সুন্দরবনের গ্রাম্য-মানুষ বাঘকে 'বাঘ' বলে না, বলে—বড়-শেয়াল !

সাহেব-মাঝি খুশি হল। নোটবইতে কথাটা লিখে নিল। আমি জানতে চাই, লিখে নিচ্ছ কেন ?

লোকটা রসিক। বললে, এর পর যদি কোন যাত্রী বলে, সে ক্যালকাটা থেকে আসছে তখন আমি বলব, 'ঐ দেখ, তোমার প্রতিবেশী : বড় শেয়াল !' আর একটা কথা ! জেটিতে নামবার সময় একটা প্রকাণ্ড বড় গাছ দেখতে পাবে, ক্যানারিজ আইল্যাণ্ডস্‌-এর 'ডেট পাম' গাছ। সময় পেলে তার একটা স্কেচ করে নিও।

—কেন বল তো ?

—ঐ গাছটার বয়স অষ্ট-আশি বছর। ডিজ্‌নে-সাহেব যখন এই জমিটা কেনেন তখন জমির মালিক তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, সম্ভব হলে ঐ গাছটাকে বাঁচিয়ে রাখতে। তাঁর ঠাকুরদা অনেক কষ্টে গাছটা সেই ক্যানারি-দ্বীপপুঞ্জ থেকে আনিয়ে এখানে পুঁতে ছিলেন। ডিজ্‌নে কথা দেন, গাছটা কাটা হবে না। ঐ গাছটাকে বাঁচিয়ে প্ল্যানিং করতে আর্কিটেক্ট-এর কালঘাম ছুটে গেছিল, তবু বড়-সাহেবের হুকুম মোতাবেক ওটাকে বাঁচিয়েই নক্সা ছকেছিলেন তিনি।

ফিরে এলাম সেই জেটিতে। মিনিট-দশেক পরে। বোটম্যানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নেবার উপক্রম করছি ও হঠাৎ বলে, আর একটা কথা। তুমি বোধ হয় ভাবছ—জঙ্গলের রাজত্ব পার হয়ে এতক্ষণে সভ্য দুনিয়ায় ফিরে এলে, নয় ? নো, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, সেটা ভুল ধারণা। বাস্তবে শান্তির রাজ্য ছেড়ে এতক্ষণে তুমি জঙ্গলে ফিরে এলে।

অবাক হয়ে বলি, তার মানে ?

—তার মানে ঐ ওরা—কলের পুতুল সাপ-বাঘ-কুমিরেরা শুধু ভয়ই দেখায়, মানুষের ক্ষতি করে না ; আর এই এঁরা—ঐ যাঁরা জেটিতে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁরা ভয় দেখান না, সুযোগ মতো তোমার পাঁজরে বসিয়ে দেন চোরাগোপ্তা।

আমি সচরাচর যা করি না, তাই করলুম। আমার স্কেচখাতা থেকে একটি পাতা ছিঁড়ে সাহেব-মাঝিকে উপহার দিলুম। তলায় লিখে দিলুম : With best wishes from one, hailing from Bara-sheyals' Jungleland।

(26) **সুইস্‌-ফ্যামিলির গাছবাড়ি** : এই প্রদর্শনীটা নিয়ে আমার মনে একটা ধন্ধ রয়েই গেল। গাইড বই হাৎড়ে জবাব পাইনি। কাউকে প্রশ্ন করেও জানতে পারিনি। গাইড-বুকে যেটুকু লিখেছে তা এইরকম—

1813 খ্রীষ্টাব্দে যোয়ান ডেভিড ভীস্[5] (Johann David Wyss) যে ক্ল্যাসিক্যাল কাহিনীটি লিখেছিলেন—'The Swiss Family Robinson', সেই কাহিনী অনুসারে ডিজ্‌নে-সাহেব এই গাছ-বাড়িটা তৈরী করান। দেখা যাচ্ছে, কাহিনী অনুসারে অষ্টদশ শতাব্দীতে একটি সুইস্‌-পরিবার আমেরিকা আসার পথে বিপদে পড়ে। আমেরিকার তীর-ভূমির কাছাকাছি এসে ওদের জাহাজটা ডুবে যায়। তিন-ছেলেকে নিয়ে বুড়ো-কর্তা রবিনসন ভেলায় চেপে কোন-ক্রমে ডাঙায় এসে পৌঁছান। তীরভূমি অজানা হিংস্র জন্তুতে আকীর্ণ, তাছাড়া রেড-ইণ্ডিয়ানদের ভয়ও আছে।

ওরা প্রকাণ্ড একটা গাছকে বেছে নিল। সেই গাছটা

হল ওদের বাড়ি। সেই বর্ণনা অনুসারে প্রযুক্তিবিদেরা এই গাছবাড়িটাকে বানিয়েছেন। ঘুরে ঘুরে দেখলুম। খান-তিনেক ঘর। গাছের মাথায়! কিছুটা সিঁড়ি, কিছুটা গাছের ডাল বেয়ে উঠতে হয়। এঘর-ওঘর করার ব্যবস্থাও গাছের ডাল বেয়ে। প্রত্যেকটি ঘরেই আছে জীবনযাপনের নানান সরঞ্জাম। চেয়ার-টেবিল, মশারী, ক্যাম্পখাট, গ্যাসের বাতি, সেলাই-এর সরঞ্জাম, মায় ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার। একটা কম্পাস, প্রচুর ম্যাপ। বুক-র‍্যাকে অনেক বই। খুব প্রাচীন। দু-তিনশ বছর আগে ছাপা। বইগুলো কিন্তু নকল নয়; এগুলি বুকশপ থেকে বহুমূল্যে কিনে আনা। প্রতিটি ঘরে ওয়াশ-বেসিন আছে। গ্যাসের বাতি জ্বলে, কলের জলও আছে। জলটা গাছের মাথায় তুলবার জন্য পানিচাক্কির ব্যবস্থাও আছে। তাতে ঘণ্টায় দুশ'গ্যালন জল গাছের মাথায় ওঠে। সবার নিচে যে সিঁড়িটা আছে, সেটা রাত্রে শুতে যাবার সময় তুলে নেওয়া হত। ফলে, গাছবাড়ি রাত্রে একটি সুরক্ষিত দুর্গ। কারণ কাণ্ড বা ঝুরি বেয়ে ওঠা যায় না। গাছের ডালে ও পাতাতে হাত দিয়েও বুঝতে পারা কঠিন যে, এগুলি কৃত্রিম। গোটা গাছটাই কৃত্রিম। রি-ইনফোর্সড কংক্রিটের। এ গাছের ওজন দেড়শ টন। তার ভিতর ছয় টন হচ্ছে লোহার ছড়ের ওজন। প্রায় হাজার ঘনফুট কংক্রিট প্রয়োজন হয়েছিল গাছটা বানাতে। সর্বসমেত নাকি প্রায় তিন লক্ষ পাতা আছে। সবই কৃত্রিম। প্রতিটি পাতা নিপুণ তুলিতে হাতে আঁকা। তিন লক্ষ এমন পাতা বানাতে কতজন দক্ষ শিল্পীর প্রয়োজন হয়েছিল? স্পর্শ করে বুঝতে হয় ওগুলো সত্যিকারের পাতা নয়। গাছটা জমি থেকে একুশ মিটার উঁচু—মানে প্রায় ছয়তলা বাড়ির সমান। উপর থেকে গোটা ডিজ্‌নেল্যাণ্ডকে দেখতে সুন্দর লাগে। অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। শুনলাম, গাছের বনিয়াদ মাটির নিচে তের মিটার পর্যন্ত ঢুকেছে।

যে প্রশ্নটার জবাব পাইনি তা এই—যোয়ান ভীস 1813 সালে যে গল্পটা লেখেন তা কি কোন বাস্তব রবিনসনের অভিজ্ঞতা অবলম্বন করে, না কি নিছক মনগড়া গল্প?

গাইড বই বা গাইডরা এ বিষয়ে কোন আলোকপাত করতে পারল না। সংশয়ের কথাটা নীসকে বলতেই জ্যাক আগবাড়িয়ে বলে, সে কথাটা জানলে কি তোমার আর দুটো ডানা গজাবে, গ্র্যাণ্ড-পা?

মওকা বুঝে আমি বলি, তার মানে? আমার কি আগে থেকেই একজোড়া ডানা আছে?

জ্যাক শুধু বললে, **Better** ask **Mom**।

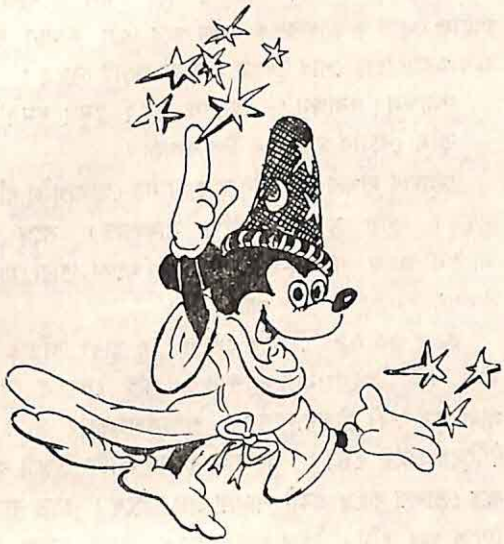
(27) **টিকি-টিকির গানের আসর:** এটা ফস্‌কে গেল। কারণ আমরা যখন ওখানে পৌঁছাই তখনই একটা গানের



আসর সবে ভেঙেছে। তারমানে পরের গানের আসরের জন্য আধঘণ্টা-খানেক অপেক্ষা করতে হবে। অত সময় আমাদের নেই। গাইড বই পড়ে জানা গেল—এখানে শওয়া দুশ' পাখি সমবেতভাবে গান শোনায়। পাখিদের অর্কেস্ট্রা আর কি। পাখি, পাখি আর পাখি—কাকাতুয়া, টিয়া, প্যারাকীট, ল্যভ বার্ড, ম্যাকস, বার্ড অব প্যারাডাইস্‌, নাইটিঙ্গেল, কে জানে হয়তো—বুলবুল, দোয়েল, শ্যামা। শিশ্‌ দেয়, ড্রাম পেটে, বাজনা বাজায়। সব যান্ত্রিক ব্যবস্থা। অর্থাৎ সেই Audio Animatronics প্রযুক্তি বিদ্যায়। স্টাফ্‌ড্‌ জন্তুর পেটে কলকব্জা বসানো। শুধু পাখির ডাক মিলিয়ে মিশিয়ে অর্কেস্ট্রা তৈরী করা বড় সহজ কথা নয়। শুনলাম, পাখিরা সমবেতভাবে যে সুরগুলো বাজায় তা মার্কিন সঙ্গীত বিশারদদের গাওয়া। গান-পাগলাদের খুবই পরিচিত। তোমরা এসব গানের নাম শুনেছ কিনা জানি না। আমি তো বাপু শুনিনি—'Let's all Sing'....'Farewell',...Aloha to You!'....'Hawaiian War Chant।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

'অ্যাড্‌ভেঞ্চারল্যাণ্ড'-এর সামগ্রিক পরিকল্পনায় দেখি, ডিজ্‌নে-সাহেব ইঙ্গিতে যেন একটা কথা বলেছেন। যে কথা শুরুতেই বলছিলাম—অ্যাড্‌ভেঞ্চার তিন জাতের। প্রথমে: প্রকৃতির ভীষণ ও হিংস্র রূপকে দেখা, তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসা, তাকে সমঝে নেওয়া। যা পেয়েছি অরণ্য অভিযানে। দ্বিতীয়ত, অ্যাডভেঞ্চারী মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন কীভাবে সে হাতের কাছে পাওয়া সামান্য উপাদান দিয়েই জীবন থেকে আনন্দরস উপভোগ করতে পারে। দু-কুড়ি-সাতের খেলা খেলতে পারে। তার উদাহরণ ঐ গাছবাড়ি। আর সবশেষে যেন ডিজ্‌নে বললেন—প্রকৃতিকে চোখ মেলে দেখ, কান পেতে শোন, দেখবে ওখানেও আছে ঐকতান। কল্পনার রসে যদি মিশিয়ে নিতে পার, তাহলে দেখবে গাছে গাছে পাখিরা এই মহাজীবনের জয়গানই গাইছে।

প্রকৃতি-প্রেমিক না হলে 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার' শব্দটাই নিরর্থক।



নিউ অর্লিন্স স্কোয়ার

এই নামটা নিয়েও আমার মনে একটা ধন্ধ আছে। প্রথম কথা, 'স্কোয়ার' বললেই মনে পড়ে চৌকো কোন কিছু। কলেজ-স্কোয়ার, ডালহৌসি-স্কোয়ার জাতীয়। এখানে এই স্কোরারটা অসমবাহুর ষড়ভুজ। তাছাড়া এত এত বিখ্যাত শহর থাকতে হঠাৎ বেছে বেছে নিউ অর্লিন্স কেন?

অনেক ভেবে চিন্তে দু-একটা যুক্তি খাড়া করেছি। দেখ, তোমাদের মনে ধরে কিনা। প্রথম কথা, এর উত্তরদিকে ফ্রণ্টিয়ারল্যাণ্ডের যে নদীটা এঁকে বেঁকে এ রাজ্যে এসে ধাক্কা মারছে সেটায় যাতায়াত করে বিখ্যাত 'মার্ক-টোয়েন' জাহাজ। যে বাস্তব জাহাজটা যাতায়াত করত মিসিসিপি নদী দিয়ে, যার মোহানায় নিউ অর্লিন্স বন্দর। দ্বিতীয় কথা, এই স্কোয়ারের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আছে ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ—'পাইরেট্‌স অব দ্য ক্যারেবিয়ান সী'। সাগরটার ভৌগোলিক অবস্থান বাস্তবে নিউ অর্লিন্স বন্দরের দক্ষিণ পূর্বে। দক্ষিণাঞ্চল দেড়-দুশ বছর আগে যখন সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠছিল, তখন ঐ নিউ অর্লিন্স বন্দর থেকেই রওনা হত বোম্বেটের দল। পাল-তোলা জাহাজে দুর্ধর্ষ ডাকাতের দল হানা দিত ক্যারেবিয়ান সাগরের ধারে নিরীহ গ্রামে। লুট-পাট করে কেড়ে আনত গ্রাম্য মানুষের সম্পদ; আর ধরে আনত নিগ্রো দাসদের। এ ছাড়া ঐ নামকরণের যদি আর কোন যুক্তি থেকে থাকে তবে তা আমি বুঝে উঠতে পারিনি।

পরিবেশ বেশ শান্ত। দু-দণ্ড জিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে। গোটা তিনেক বাড়ি। তাতে আট দশটি কিউরিও শপ।

পকেট হাল্কা, তাই ওদিকে ভিড়িনি।

এপাশে কয়েকটি রেস্তোরাঁ।

পেট ভারী; তাই সেদিকেও ভিড়িনি।

আর আছে দুটি প্রদর্শনী। এবার তাদের কথা বলি—

(28) **ক্যারেবিয়ান সাগরের দস্যুদল:** সমুদ্রটা যে কোথায় তা এই মাত্র বলেছি। এর উত্তরে একসারি দ্বীপ, যে দ্বীপগুলিতে বাস করেন—উইক্‌স, ওয়ালকট, ওরেল।



নিউ অর্লিন্স স্কোয়ারের দক্ষিণ সীমান্তে একসারি দোকান আছে, তার পূর্বদিকে এই প্রদর্শনীতে ঢুকবার পথ। নৌকায় চেপে দেখতে হয়। নৌকায় কোনো মাঝি নেই, বোধহয় নৌকাগুলি জলের তলায় পরস্পরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। ওরা নেপথ্য থেকে দড়ি ধরে টানে আর নৌকাগুলো এগিয়ে যেতে থাকে। প্রথমেই ঢুকে পড়লুম অন্ধকার একটা টানেলের ভিতর। দিনের আলো মিলিয়ে গেল। ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার! নজর হল, দুপাশে অসংখ্য জোনাকি পোকা জলছে। জলছে আর নিবছে। স্যাঁৎস্যাতে জলা আবহাওয়া। মাঝে মাঝে দিগন্তের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছুটে যাচ্ছে অশান্ত আলেয়া —যেন কোন বিদেহী আত্মার বুকফাটা আলোর হাহাকার!

গা ছমছম করতে থাকবে তোমার। হঠাৎ অন্ধকার থেকে ধ্বনিত হবে এক হুঙ্কার—হা-রে-রে-রে-রে-রে।

বুঝতে পারছি, স্টেরিওফোনিক কায়দায় চমকে দিয়েছে! কিন্তু 'পিলে'টাতো মাথায় থাকে না, থাকে পেটে—বেটার বুদ্ধি নেই। ছাঁৎ করে তাই চমকে উঠেছে। ভেবেছে, চারদিক থেকে ডাকাতের দল আক্রমণ করছে বুঝি!

চোখও যে তাই দেখছে—একখানা পাল-তোলা সাবেকি জাহাজ থেকে দমাদ্দম লাফ খেয়ে নামছে বোম্বেটে দস্যুর দল। ইয়া গালপাট্টা, ইয়া ষণ্ডামার্কা চেহারা, কোমরে তলোয়ার, কাঁধে বন্দুক আর হাতে চাবুক। তোমাকে তারা কিছু বলবে না—ওরা এসেছে ঐ ক্যারেবিয়ান সমুদ্রের ধারে সমৃদ্ধিশালী গ্রামে লুট করতে। শান্তিপূর্ণ চাষীর গাঁ, শ্রমজীবী নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তিল তিল করে ভরে তুলেছে ভাণ্ডার। ঐ দস্যুরা রাতারাতি তা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

শুরু হল ডাকাতি। মৃত্যুভয়ে অর্ধ-উলঙ্গ গাঁয়ের মানুষ প্রাণ মুঠোয় নিয়ে ছোটাছুটি করছে। বুড়ো-বাচ্চা, জোয়ান-মদ্দ, যুবতী মেয়েরা। দস্যুরা শপাশপ চাবুক চালাচ্ছে। বেঁধে ফেলছে জোয়ান বয়সী ছেলে-মেয়ে দেখলেই। দস্যুরা দাস-ব্যবসায়ীদের জোগানদার। বুড়ো-বুড়ি—যারা দাস হতে পারবে না, তাদের কেটে ফেলছে এক এক কোপে। কেউ বা সাহস করে রুখে দাঁড়াচ্ছে। তরোয়াল, বল্লম বা তীর-ধনুক হাতে। তখনই ডাকাতদলের কাঁধের বন্দুক উঠছে হাতে: দুম্-দুম্-দুম্। আর দুর্ভাগা গাঁয়ের মানুষ লুটিয়ে পড়ছে।

দেখ না দেখ এসে হাজির হল আর একখানা যুদ্ধ-জাহাজ। এরা কারা? শোনা গেল, এরা আর একদল বোম্বেটে দস্যু। অসহায় মানুষগুলো কার লুটের মাল হবে একথা স্থির নেই—তাই বেধে গেল যুদ্ধ। দু-দল দস্যুতে।

যাচ্চলে! এ কী বখেড়ায় পড়া গেল রে বাবা! এ জাহাজ থেকে ও জাহাজকে লক্ষ্য করে এরা কামান দাগছে, আর ওরাও তার শোধ তুলছে। দারুণ লড়াই চল্‌ছে!

দনাদ্দন! দনাদ্দন!—ভার্সেস 'দুম্! দুম্! দুম্!'

তুমি বেচারি মাঝখানে উলু-খাগড়া।

তোমার মাথার উপর দিয়ে কামানের গোলাগুলি ধাঁই ধাঁই ছুটছে। তুমি মুণ্ডু আর টুপি সামলাচ্ছ। সঙ্গে যাদের 'মা-ঠান' আছে, সাহেব-মাঝির পরামর্শ মতো তারা 'মাঠান'ও সামলাচ্ছে। লড়াই আর থামেই না!

হঠাৎ এক নজর দেখতে পেলে এ যাবৎ সঞ্চিত লুঠের মাল হীরে-জহরৎ-মণি-মাণিক্য! আর দেখতে পেলে এ যাবৎ ধৃত বন্দী ক্রীতদাসদের। শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে তারা। বুকফাটা তৃষ্ণায় মাটির ভাঁড়টা বাড়িয়ে ধরে তোমার কাছে একটু পানীয় জল চাইছে। হাত বাড়ালেই দিতে পার তুমি। কিন্তু পারবে না। কারণ নৌকা এগিয়ে চলেছে। অমোঘ টানে। যেন ঐ বন্দীদলের ভাগ্য।

কোথাও দেখলে মদের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে দস্যুদল। গোলাগুলির শব্দে, অত্যাচারিত হতভাগ্যদের আর্ত হাহাকারে, আর নৃশংস দস্যুদলের অট্টহাসে যখন কান তোমার ঝালাপালা —তখনই মুক্তি পাবে তুমি। শেষ হবে অভিযান। অন্ধকার সুরঙ্গ থেকে আলোকোজ্জ্বল ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে ফিরে এসে স্বস্তির নিশ্বাস পড়বে তোমার।

হিসাবমতো চৌষট্টিজন কল-মানুষ আর একান্নটি কলের জীবজন্তু এই নৃশংস নাটকে অংশ নেয়। নিঃসন্দেহে নিপুণ শিল্পীর হাতে গড়া অনবদ্য কাজ; সেই Audio Animatronics প্রযুক্তিবিদ্যার এক চরম প্রদর্শনী।

কিন্তু হক্‌কথা বলব, দাদুভাই, দিদিভাই। আমার একটুও ভাল লাগেনি। দোষ ওদের নয়, দোষ আমার। আমার বয়সের, আমার শিল্প-সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণার। বুঝিয়ে বলি:

টলস্টয়[1] বলেছিলেন, শিল্প শুধু নিখুঁত বাস্তব হলেই চলবে না, দুঃখ-দুর্দৈব-হাহাকারের দৃশ্যের মাঝখানেও দেখাতে হবে একটা আশার আলো। যাকে বলে মুক্তির ইঙ্গিত: redeeming feature। নীরন্ধ্র অমাবস্যার নৈশ-আকাশে 'বেথেল্‌হেম'-এর একটি আলোকবিন্দু[2]। এখানকার এই অত্যাচারের দৃশ্যে সেটাই অভাব। প্রায় অনুরূপ অত্যাচারের

দৃশ্য দেখেছি অন্যভাবে—Uncle Tom's Cabin[৪]-এ। সেখানে ঐ redeeming feature-টাও ছিল। তাই তা ছিল রসোত্তীর্ণ মহৎ শিল্প।

আরও একটা কথা।

ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন মেজাজের দর্শককে আনন্দ দেওয়ার আয়োজন। তার কিছু কিছু এমন যে, সব বয়সের মানুষই সমান আনন্দ পাবে ; যেমন 'ডুবো-জাহাজ অভিযান' বা 'ছোট্ট মোদের জগৎখানা'। আবার কিছু প্রদর্শনী আছে কোন নির্দিষ্ট এজ্‌-গ্রুপের। জলকণার 'অণু থেকে অণীয়ান' পথের যাত্রী আমি যখন উত্তেজিত তখন আমার পাশে বসে জ্যাক হাই তুলছিল। আর এখানে গোলাগুলির শব্দে, অত্যাচারের দৃশ্যে, কিম্বা মানুষের পৈশাচিক-বৃত্তির রূপায়ণে আমি যখন ক্লেশ বোধ করছিলাম—তখন লক্ষ্য করে দেখেছি, জ্যাকের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। অন্ধকার সুরঙ্গ-রাজ্য থেকে মুক্তি পেয়ে আমি যখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচছি ও তখন আমাকে বলছে, লেট্‌স্ গো ফর এ সেকেণ্ড টাইম।

সুতরাং এটা আমার ভাল লাগল না বলেই যে অসার্থক তা মেনে নেওয়া চলে না। এ জাতের অত্যাচার হয়েছে—এটা ঐতিহাসিক সত্য। তার বাস্তব রূপায়ণটা অপরাধ হতে পারে না।

(29) **ভূতগুলো সব গেল কোথায় ঃ** একবার বি. বি. সি. বেতারে বক্তৃতা দেবার অবকাশে ডিজ্‌নে-সাহেব বলেছিলেন, "ভূত বেচারীদের জন্য আমার দুঃখ হয়! বিজ্ঞান যত এগিয়ে যাচ্ছে ওরা ততই যেন কোণ ঠাশা হয়ে পড়ছে। তাই আমি স্থির করেছি, ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের একান্তে আমি একটা 'ভূতালয়' বানাবো। দুনিয়ার তাবৎ ভূতদের আমি সবান্ধব নিমন্ত্রণ করব। পেত্নি-শাঁখচুন্নি-বেম্মদাত্যিসমেত!"



তা কথা রেখেছেন ডিজ্‌নে-সাহেব।

জব্বর একখানি ভূতের বাড়ি বানিয়েছেন। তেতলা বাড়ি। তার উপর আর একখানা চিলে-কোঠা। সামনে চার-চারটি ডোরিক স্তম্ভ[৪]। চার দিকেই টানা-বারান্দা। যাতে ভূত-মহোদয়েরা সচ্ছন্দে বাইরের বারান্দা দিয়ে গোটা বাড়িটায় দাপাদাপি করতে পারেন। যেন, বারান্দা না থাকলে ভেণ্টিলেটার দিয়ে সূক্ষ্মশরীরে এঘর-ওঘর করতে ওঁদের অসুবিধা! দরজা-জানলা সব প্রমাণ মাপের—সাবেক বাড়িতে যেমন হয়। ইয়া-ইয়া খিলান-ওয়ালা খড়খড়ির পাল্লা। যাতে দরজা-জানলা বন্ধ থাকলেও ঐ খড়খড়ির পাল্লা উঁচু করে ওঁরা ভিতরে মানুষদের তত্ত্ব-তালাশ নিতে পারেন, অথবা মাঝরাতে ঘুমন্ত মানুষকে নাকিসুরে ডেকে তুলতে পারেন! দেখলেই মনে হয়, কয়েকশ' বছরের পুরানো চুন-বালি-খসা বাড়ি। তা তো বানাতেই হবে। হাল-ফ্যাসানের এ্যাপার্টমেণ্ট-হাউস হলে ওঁরা তো নাক-সিঁটকিয়ে বলতেন, থুঁ, থুঁ, থুঁ! এমন বিঁশ্রি বাড়িতে কোন ভঁদ্রভূত থাকতে পারে?

কোথা থেকে ভেসে আসে দমকা হাওয়া! আর বিস্মৃত অতীতের কোন মরে হেজে যাওয়া স্মৃতির ভারে কবাটগুলো বুক-চাপড়ে আপ্‌সাতে থাকে! আলো আর ছায়া এমন সুন্দরভাবে মিতালী পাতিয়েছে যে, সব সময়েই কেমন যেন গা ছম্‌ছম্ করে। ঐ শব্দটাই এ বাড়ি স্থাপত্যের মূলমন্ত্র—ঐ 'গা-ছমছম' ভাবটা। ইংরেজিতে যাকে বলে eerie feelings! মজার কথা, সমস্ত ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে কোথাও ধুলো বালি দেখবে না—ব্যতিক্রম শুধু এই বাড়িটা। গাইড বলল, একজন ঠিকেদার নাকি প্রতি সপ্তাহে প্রয়োজন-মাফিক কৌটায় করে যোগান দেয়—স্রেফ ধুলো। এক-একটা থলিতে আড়াই কিলো ধুলো। দাম কত তা ভুলে গেছি।

ঈশ! ঐ ঠিকাদারীটা আমি কেন পেলুম না? রোজ সকালে এক থলে ধুলো পৌঁছে দিয়ে দিন ভর ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে চক্কর মারতুম। গাইড মেয়েটা বললে, কিন্তু মাকড়শার জাল তুমি সরবরাহ করতে পারতে?

—মাকড়শার জাল? কী হবে?

—ঠিকাদার তুলোর বাক্স করে নিয়ে আসে মাকড়শার জাল। এ বাড়ি সাজানোর সরঞ্জাম। এ জন্য সে অনেক মাকড়সা পুষেছে। তুমি মাকড়শা পুষবে তো?

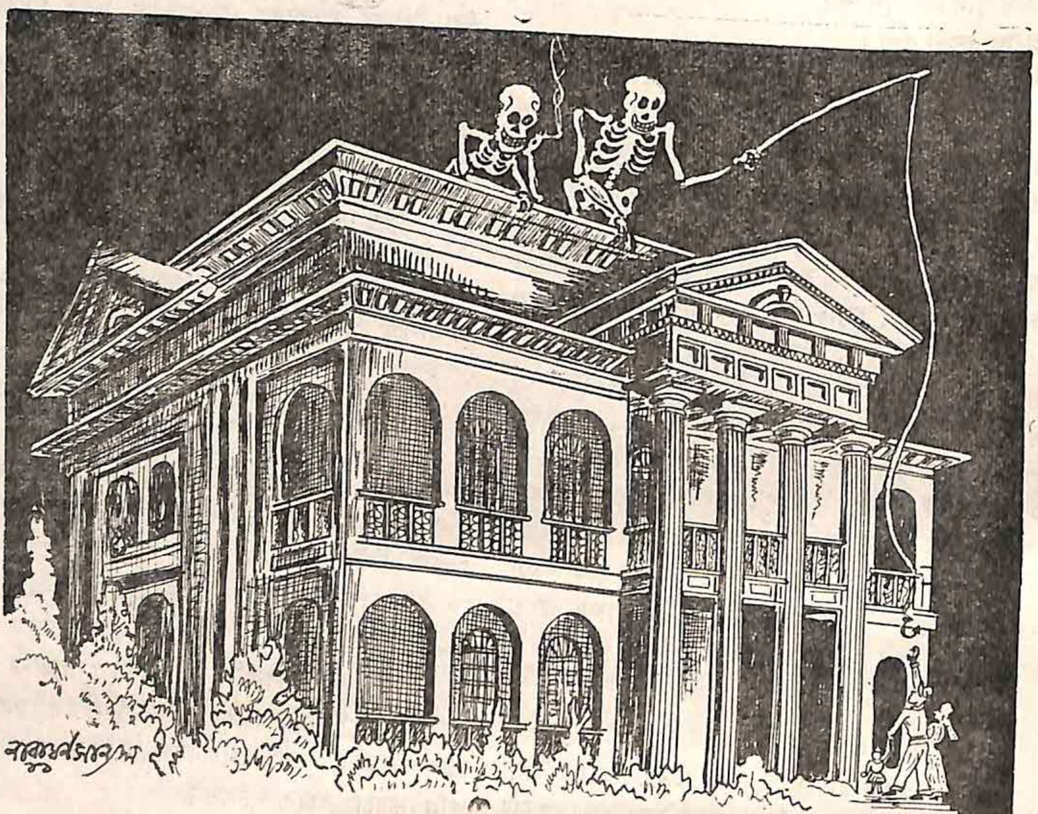
— না বাপু! এ বয়সে মাকড়শা পুষতে পারব না!

মাকড়শার জাল তো লাগবেই। তোমার-আমার হাত লেগে যে সব মাকড়শার জাল ছিঁড়ে যায় রাত-ভোর নাইট-শিফ্‌ট্-এ ডেকরেটার সেগুলি মেরামত করে।

বাড়িটার অদ্ভুত একটা আকর্ষণী শক্তি আছে কিন্তু! যেন ক্ষুধিত পাষাণ[৫]। ভাঙা পড়ো বাড়ি। না দেখলেই হয়? কিন্তু কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারবে না। যেন ঐ অজ্ঞাত রহস্যটা ভেদ না করে, ওকে উপেক্ষা করে চলে যাওয়া অসম্ভব। মাছ যেমন কৌতূহলী হয়ে বড়শির টোপটার দিকে এগিয়ে যায়, তুমিও তেমন'না দেখলে কী হয়'ভাবতে ভাবতে

পায়ে পায়ে এগিয়ে যাবে। বাড়িয়ে দেবে গলাটা ঐ প্রবেশ-দ্বারের হাড়িকাঠে! অমনি বড়শীতে টান—ঘ্যাঁচ্‌!

হয়তো তোমার সঙ্গীকে প্রশ্ন করলে—এক্ষুণি কেউ 'আয়াম সরি' বলল না? সে হয়তো অবাক হয়ে বলবে, না তো!



"মনে হচ্ছে টোঁপটা খাবে! দেখা যাক!"

ঘরে ঘরে গ্যাসের আলো। দপ্‌দপ্‌ করে। টিম্‌টিম্‌ করে। আবার বেমক্কা নিবেও যায়। মাথার উপর দিয়ে আচম্‌কা উড়ে যায় রাতচরা পাখি—বাদুড় না চামচিকে ঠিক ঠাওর হয় না। আর সব সময়েই মনে হয় আলো-আঁধারে কোণায় কারা যেন সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা দেহের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে কয়েক শ' বছর আগে; কিন্তু এই দুনিয়ার অতৃপ্ত কামনা-বাসনা তাদের মজ্জায়-মজ্জায় জড়ানো। আচম্‌কা তোমার কাঁধের উপর পড়ল কার যেন দীর্ঘশ্বাস, কে যেন বললে—'একটু শুনুন!' কানে শোনোনি, মনে মনে শুনেছ। অথবা কে যেন বরফ-ঠাণ্ডা হাতে আল্‌তোভাবে ছুঁয়ে দিল তোমার আঙুলের ডগা। স্পষ্ট শুনলে, 'আয়াম সরি!'

চম্‌কে পিছন ফিরে দেখলে ত্রিসীমানায় কেউ নেই। আমাকে বরং এক্ষণি কে যেন কানে কানে বলল,—"তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।" কথাটা তুমিই বললে?

সব সময় একটা সোঁ সোঁ শব্দ। কখনো বাড়ছে কখনো কমছে। সদ্য সন্তানহারা জননীর কান্না যেন! কখনো সরবে, কখনো বা গুমরে গুমরে। ঢুকতেই একটা 'পোর্ট্রেট-হল'। দেওয়ালে তেলরঙে-আঁকা বড় বড় সাবেক কালের ছবি। মাকড়শার জালের ওড়না-ঢাকা নববধূ; অথবা জ্যান্ত টিকটিকি-কাঁধে শিকারী, নিহত বাঘের পিঠে পা রেখে দাঁড়িয়ে। নববধূ, শিকারী আর বাঘ পটে আঁকা। বোঝা যায়, এককালে ওঁরা ছিলেন এই প্রমোদ-ভবনের মালিক-মাল্‌কিন—এখন যে প্রাসাদ ঐ মাকড়শা আর টিকটিকির বাসস্থান। ছবিগুলি সব নিষ্প্রাণ।

নিষ্প্রাণ ? কি জানি !

গাইড দরজাটা বন্ধ করে দিতেই মনে হল যেন লিফ্‌ট্-এ চড়েছি। মেঝেটা কোন অতল খাদে তলিয়ে যাচ্ছে ; অথবা সিলিংটা উঠে যাচ্ছে আকাশপানে। তখনই নজর হবে, পটে-আঁকা ছবিগুলো সব নড়ে চড়ে বসছে। নববধূ হঠাৎ ফিক্ করে হেসে ফেল্‌ল ! শিকারী ডান পাটা বাঘের কাঁধ থেকে নামিয়ে বাঁ-পাটা তুলে দিল—আর তৎক্ষণাৎ ওর কাঁধের টিক্-টিকিটা তরতর করে ছুটে পালালো।

এঘর-সেঘর ঘুরে একটা 'রাইড' নিতে বসলে তুমি—মৃত্যুর শেষপ্রান্তে !

না ! এবার আর টু-সীটার গাড়ি নয়।

মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয় একা একা। রাজা-উজির যাই হও না কেন। এবার তুমি তাই একাই রওনা দিলে। কোথায় ? কে জানে ! অন্ধকার ভূগর্ভের একটা ক্যাটাকুম্ব[৬]। অতৃপ্ত আত্মাই শুধু নয়, এটা মৃতদেহদের খাশ্-মহল। কফিনে সারি সারি শুয়ে আছে ওরা। এখনও ওদের কবরস্থ করা হয়নি। তোমার গাড়িটা যখন দুই-সারি কফিনের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ হয়তো কফিনের ডালা খুলে উঠে বসে একটা মৃতদেহ ! মুণ্ডহীন একটা ধড়। মুখ তো নেই—তাহলে ও কথা বলল কী করে ? তুমি স্পষ্ট শুনলে, 'ওয়েলকাম, স্যার' !

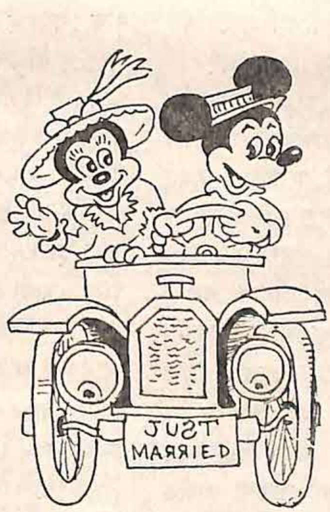
কিম্বা দেওয়ালের ফাটল থেকে হঠাৎ বার হয়ে এল দেহচ্যুত একখানা হাত। তোমার সাথে করমর্দন করতে। শেষাশেষি তুমি দেখবে দেওয়াল-জোড়া প্রকাণ্ড একটা আয়না। সেদিকে তাকালেই দেখতে পাবে গাড়িতে তুমি একা বসে নেই। তোমার পাশেই বসে আছে তোমার যাত্রাসহচরী। বত্রিশপাটি দাঁত বার করে হাসছে। না হেসে তার উপায় নেই। বেচারীর মুখে যে চামড়া-মাংস কিছুই নেই। নিটোল একখানা কঙ্কাল !

গাইডকে প্রশ্ন করেছিলুম—ওটা কি করে হল ?

সে হেসে বলে, আপনি বুঝি 'ভূত' বিশ্বাস করেন না।

বললুম, না। আমার বিশ্বাস ওটা কোন 'স্ক্যাল এ্যাণ্ড স্কেলিটানের রিফ্যাল-ই'মেজ।[৭] কোনও কনভেক্স মিরার্…

লোকটা বাধা দিয়ে বললে, না, স্যার। রিয়্যাল ইমেজ নয়। এটা হলোগ্রাফীর[৮] একটা বাস্তব প্রয়োগ।





ফ্রণ্টিয়ারল্যাণ্ড

'ফ্রণ্টিয়ারল্যাণ্ড' শব্দটা বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'সীমান্তদেশ'। কিন্তু আমাদের কাছে 'সীমান্ত' বলতে যা বোঝায় আমেরিকার কাছে 'ফ্রণ্টিয়ার' তার চেয়ে কিছু বেশি। তাই এ রাজ্যে ঢোকার আগে, এস, ব্যাপারটা সমঝে নিই -

ভারতবর্ষের তিনদিকে সমুদ্র আর উত্তরে মহাহিমালয়। খাইবার, বোলান জাতীয় দু-একটা ফাঁক-ফোকরের কথা বাদ দিলে হিমালয় এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। সম্রাট অশোকের আমল থেকে আকবর আর ইংরাজ রাজত্ব পাড়ি দিয়ে তাই আমাদের কাছে 'সীমান্ত রাজ্য' বললে কোন কিছু ধারণা হয় না। আমাদের ছেলেবেলায়—প্রাক-স্বাধীনতা যুগে 'সীমান্ত' বলতে আমরা বুঝতাম—সেই যেখানে আব্দুল গফুর খান[1] থাকেন। বাহমনী, বিজাপুর তাদের সীমান্ত নিয়ে লড়াই-কাজিয়া করেছে। সমুদ্রগুপ্ত, আলাউদ্দিন খিল্‌জি বা ঔরঙ্গজেবের সীমান্ত নিয়ে এককালে আমাদের রাত জেগে পড়া মুখস্থ করতে হয়—মনে দাগ কাটে না। পরীক্ষার খাতায় অধীত বিদ্যা উগড়ে দিয়ে এসে বিল্‌কুল্ ভুলে মেরে দিই। র‍্যাডক্লিফ[2] সাহেবই আমাদের সর্বপ্রথম বুঝবার সুযোগ দিলেন—'সীমান্ত' কী চীজ !

আমেরিকার কাছে 'সীমান্ত' অন্য জিনিস। দু'শ বছর আগে আমেরিকা ছিল ওয়াশিংটন ডি. সি.[3] এলাকা ঘিরে সামান্য কয়েকটি শহরাঞ্চল। তারপর যেমন যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তেমন তেমন নওজোয়ানেরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে দক্ষিণ ও পশ্চিম মুখে। ওদের এই সীমান্ত অভিযান ওদের সাহিত্য সংস্কৃতিতে স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছে। দুঃসাহসী মানুষ সপরিবারে দলে দলে এগিয়ে গেছে পশ্চিমমুখো। তৃণভূমি অথবা পাইন বন হাঁসিল করে বন কেটে বসত গড়েছে। বানিয়েছে লগ-কেবিন, তৈরী করেছে গীর্জা, গড়ে তুলেছে জনপদ। কোথাও বা ল্যাসোয়িং করে ধরেছে বুনো ঘোড়া। কাউবয় বা ওয়েস্টার্ণ-মার্কা ছবিতে আমরা তার কিছু কিছু আভাস পেয়েছি। বন্যজন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে, ঠেকাতে হয়েছে রেড-ইণ্ডিয়ানদের যৌথ আক্রমণ। সেই দুঃসাহসিকতা ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের এই ফ্রণ্টিয়ারল্যাণ্ডের মূলমন্ত্র।

অ্যাডভেঞ্চারল্যাণ্ডে ছিল বাহাদুরীর সৌখীন মজদুরী। বিশেষ করে অরণ্য-অভিযানে। আফ্রিকার জঙ্গলে এবং আমাদের জঙ্গলেও এককালে সাহেব-বাহাদুর, রাজা-বাহাদুর, জমিদার-বাহাদুরেরা নির্বিচারে হত্যা করেছেন বন্য প্রাণী—হাতীর পিঠে চড়ে অথবা মাচাঙ-এর নিরাপদ দূরত্ব থেকে।

মৃতজন্তুর ঘাড়ে ঠ্যাঙ উঠিয়ে তুলিয়েছেন ফটো, মৃত জন্তুর মুণ্ডু স্টাফ্ড্ করে সাজিয়েছেন ড্রইংরুম।



এখানে তা নয়। এ হচ্ছে জীবন মুঠোয় করে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষা। যেভাবে আমাদের দেশেও—সীমান্ত না থাকলে কী হয় —এককালে পদ্মার চর হাঁসিল করত মিঞার ছাওয়াল অথবা ঘোষের পো! একদিকে বাঘ-সাপ, নদীর বন্যা, অন্যদিকে জমিদারের পাইক-বরকন্দাজ!

(30) **সীমান্তরাজ্যের চাঁদমারি :** তাই পরিকল্পনাকার এ-রাজ্যের প্রবেশদ্বারে বানিয়েছেন একটা চাঁদমারি। ভাবখানা : বাপু হে, এ পাড়ায় যদি ঢুকবার বাসনা থাকে তাহলে হাতের টিপটা আগে বরং পরখ করে দেখ।

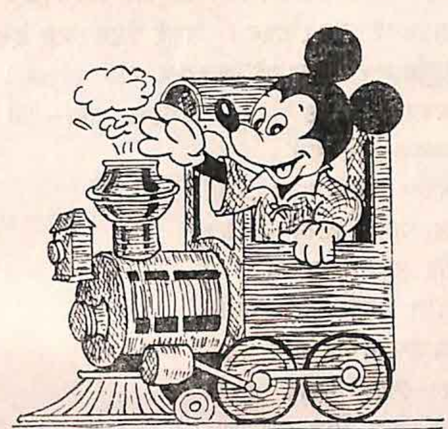


মেলা-প্রাঙ্গণে চাঁদমারি এমন কিছু অভিনব ব্যাপার নয়। আমাদের রথের মেলা, গাজনের মেলাতেও আমরা দনাদ্দন্ বেলুন ফাটাই। এখানে আয়োজনটা একটু স্বতন্ত্র। বেলুন নয়, সঞ্চরমান লক্ষ্যে নিবদ্ধদৃষ্টি হতে হবে, চলমান বন্য-মহিষ, হরিণ, খরগোশ, ভাসমান রাজহংস। বন্দুক ভাড়া পাওয়া যায়। ডলারে ত্রিশটি বুলেট। প্রতিদিন জীব-জন্তু, পশুপাখিকে মেরামত করা হয়। অর্থাৎ দিনের বেলা গুলি লেগে তাদের গায়ে যেখানে যেখানে রঙের চটা উঠে গেছে তা মেরামত করা হয়। একদল রং-মিস্ত্রি তাই রাতের শিফটে এখানে কাজ করেন। যাতে পরদিন সকালে সব-কিছু ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করে।



(31) **সোনালী অশ্বখুরাকৃতি মঞ্চ :** 'গুইনেস্ বুক অব রেকর্ডস্'-এ এই মঞ্চটির উল্লেখ আছে। কারণ এখানে নাকি বত্রিশ মিনিট ধরে এমন একটা অনুষ্ঠান হয়, যা ইতিমধ্যে বিশ্বরেকর্ড করে বসে আছে। সেই নাটক এ পর্যন্ত চল্লিশ হাজার বারের বেশি অভিনীত হয়েছে; এক কোটির বেশি দর্শক তা দেখেছেন! গত বাইশ বছর ধরে। তাই এটি একটি বিশ্বরেকর্ড!

শতাব্দীর এই এক-চতুর্থাংশে কুশীলবদলের বদল হয়েছে—হবারই কথা; কিন্তু নাটকটা বদলায়নি। মাঝে মাঝে বহিরাগত নামজাদা অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও এসে এ নাটকে অংশগ্রহণ করেছেন। যেমন জুলি অ্যাণ্ড্রু, লুসি বল, বব্ হোপ ইত্যাদি। দৈনিক পাঁচটা করে শো হয়। প্রচণ্ড চাহিদা। কারণ এখানেও আলদা টিকিট কাটতে হয় না। ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে ঢোকার টিকিট যার আছে সেই দেখবার অধিকারী। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, সীট আগে-ভাগে রিজার্ভ করিয়ে রাখতে হয়। সকাল নয়টায় যখন ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের



দরজা খোলে তখনই এখানকার রিজার্ভেশান কাউণ্টার খোলা হয়। আমরা জানতাম না। তোমরা এ ভুলটা কর না। ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে ঢুকেই সোজা ট্রেনে চেপে এখানে চলে এস। সীট রিজার্ভ করিয়ে তারপর ডানে বাঁয়ে তাকাবে। তাহলে সময়মত এসে ঐ নাটকটি দেখতে কোন অসুবিধা নেই।

(32) **মহা-বজ্রপর্বতের রেলগাড়ি :** ফ্রাণ্টিয়ার ল্যাণ্ডের উত্তর সীমানায় এই কৃত্রিম পাহাড়টাও রি-ইন-ফোর্সড কংক্রিটের। ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের এভারেস্ট ; মানে সর্বোচ্চ চূড়া। এখানে রেলগাড়িতে চড়ে ঘুরে ঘুরে পাহাড় থেকে নামতে

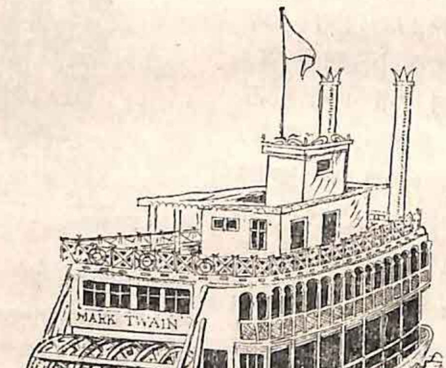
বেশ মজা লাগে। প্রায় দার্জিলিং পাহাড়ের খেলাঘরের রেলগাড়ি চাপার মতো। তবে আশপাশের দৃশ্যগুলি আরও মনোমুগ্ধকর –যদিও কৃত্রিম। পাহাড়ের সুড়ঙ্গ দিয়ে গাড়িটা যখন এগিয়ে যায় তখন দেখতে পাবে সূচালো স্ট্যালেক্‌টাইট[১] রেলগাড়ির পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। ধাক্কা লাগতে লাগতেও লাগছে না। সাপের মতো এঁকে-বেঁকে গাড়িগুলো সুরঙ্গের বাইরে বার হয়ে আসে। এখানেও নোটিশ টাঙানো আছে – দুর্বল ব্যক্তি অথবা গর্ভিণী নারীদের এই রাইডটা নেওয়া মানা।

(33) **মার্ক টোয়েন অভিযান :** মার্ক টোয়েনের নাম তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। প্রখ্যাত মার্কিন সাহিত্যিক (1835-1910)। তাঁর আসল নাম যে স্যামুয়েল লংহর্ন ক্লিমেন্স, সে কথা অনেকেই ভুলে গেছেন। সবাই তাঁকে চেনে ছদ্মনামে। অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর বই লিখেছেন মার্ক টোয়েন। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত দুটি বই ছোটদের জন্য—'টম সয়ার' আর 'হাক্‌ল-বেরি ফিন'।

ক্লিমেন্স গরিব ঘরের ছেলে। কিশোর বয়সে তিনি জাহাজে খালাসীর কাজ করতেন। ঐ মিসিসিপি নদী—যে নদীটা নিউ অর্লিন্স বন্দরে এসে সমুদ্রে পড়েছে –সেই নদীর একটি জাহাজে তাঁর ছিল জলমাপার কাজ। নদীতে চড়া পড়ে। তাই স্টিমারের দুপাশে দুজন বসে বসে জল মাপে। মানে একটা লগি ডুবিয়ে দেখে গভীরতা কত। যদি দুই ফ্যাতমের (প্রায় চার মিটার) বেশী হয় তাহলে হাঁক পাড়ে - মার্ক টোয়েন! (আমাদের ভাগীরথী বা গঙ্গায় আমরা ছেলেবেলায় শুনেছি খালাসীরা হাঁক পাড়তো, "এক-বাম মে - লে না।") শব্দটা বারে বারে শুনে শুনে ক্লিমেন্স তার প্রেমে পড়ে যান। কারণ পরিণত বয়সে ঐ 'মার্ক টোয়েন' ছদ্মনামেই তিনি সাহিত্যসেবা করেন। ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের 'মার্ক টোয়েন' জাহাজটি সেই আমলের মডেলে। মানে, আজ থেকে প্রায় সওয়া শ' বছর আগে কিশোর ক্লিমেন্স এই ধরনের একখানি জাহাজে খালাসীর কাজ করতেন। এই স্টিমারটি 5/8 স্কেলে, অর্থাৎ কিছু ছোট মাপে বানানো। ওজন দেড়শ টন, দৈর্ঘ্য দেড়শ ফুট (প্রায় পঞ্চাশ মিটার), যাত্রীও নেয় দেড়শ জন। এ যেন সেই হ-য-ব-র-লর দেশের হিসাব। গলা-বুক আস্তিন সবই ছাব্বিশ ইঞ্চি! সবই দেড়শ!

স্টিমারের ল্যাজে একটা প্রকাণ্ড চাকা। সেটা ঘুরে ঘুরেই জাহাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সেটারই ওজন নয় টন। এমন প্যাডলার-ওয়ালা স্টিমার আজকাল চলে না। নদীর দুই কিনারে মিসিসিপি নদীতীরের দৃশ্য। এখানেও দু'পাশের গাছগুলো দেড়-দু'শ বছরের পুরানো বলে মনে হয়। জাহাজের মাস্তুলে মার্কিন-ফ্ল্যাগে মাত্র তেরটি স্ট্রাইপ আর চৌত্রিশটা তারা—কারণ সে আমলে তাই ছিল।

(34) **কলোম্বিয়া স্টিমার :** ইনি একটু গরবিনী। সব দিন গতর নাড়ান না। শুধু ছুটির দিনে বের হন। এত গরব কিসের গো? শোনা গেল যে বাস্তব-জাহাজের নামে এঁর নামকরণ সেটি একটি ঐতিহাসিক জলযান। 1787 খ্রীষ্টাব্দে, মানে পলাশীর যুদ্ধের বছর ত্রিশেক পরে তাকে সমুদ্রে ভাসানো হয়েছিল। ম্যাসাচুসেট্‌স্ অঞ্চলের প্লিমাউথ বন্দর থেকে। দুশ' বারো টন ওজনের সেই যুদ্ধ-জাহাজে ছিল বারোটা কামান। পাল-তোলা জাহাজ। ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের কলোম্বিয়াতেও তাই, তবে এর কামানগুলো আছে শোভাবর্ধনের জন্য। তারা গর্জন করে না। আর যদিও আদি অকৃত্রিম কলোম্বিয়ার মতো পাল খাটানো আছে; কিন্তু এটি চলে স্টীমে। ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের কলোম্বিয়া জলে ভাসে 1950 সালে। বানিয়েছেন যে জাহাজ কোম্পানী, তাঁরা পুরানো আমলের পাল-তোলা জাহাজ বানানোতে ওস্তাদ। 'মিউটিনি অন দ্য বাউণ্টি'



মার্ক-টোয়েন

অথবা 'ক্যাপ্টেন কারেজিয়াস' ফিল্মের জাহাজ এঁরাই বানিয়েছিলেন।

(35) **টম-সয়ার দ্বীপ :** নদীপথ আংটির আকারে এই দ্বীপটিকে ঘিরে আছে। ওখানে বেড়াতে যাবার জন্য আলাদা 'ভেলা' আছে ; কিন্তু ঘাটে বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া আছে—"সন্ধ্যার পর খেয়াঘাট বন্ধ হইয়া যাইবেক।"



অর্থাৎ টম-সয়ার দ্বীপে বেড়াতে গেলে গোধূলীলগ্নে ফিরে আসা চাই। না হলে তামাম রাত আটকে পড়ে থাকতে হবে ঐ বিজন জঙ্গলে। আর সে জঙ্গলে শুধু বন্য জন্তুই নয়—আছে রেড-ইণ্ডিয়ানদের বস্তি। গাছের ফাঁকে মাঝে মাঝে দেখা যায় সেই সব আদিবাসীদের আভাস। দূর থেকে ভেসে আসে ঢোলের শব্দ—দ্রিমি-দ্রিমি, দ্রূম-দ্রূম।

দেখতে পাবে আগুন জ্বেলে কী যেন ঝল্সাচ্ছে ওরা। কাছে গিয়ে দেখবার সাহস হল না কারও। কারণ গেলে হয়তো মুণ্ডুখানি গচ্ছিত রেখে ফিরে আসতে হবে। 'টম-সয়ার' বইতে যে সব জিনিসের বর্ণনা আছে, তার অনেক কিছু এখানে দেখতে পাবে। যাদের ঐ বইটা পড়া আছে তাদের দারুণ ভালো লাগবে। এখানেও একটা গাছ-বাড়ি আছে, তবে ছোট। আর আছে, লছমনঝুলার মতো দড়ির একটা ঝুলন্ত সেতু। এছাড়া একটা ব্যারেল ব্রীজ। সেটা পার হওয়া নাকি রীতিমতো কসরতের ব্যাপার। বেতালা পা ফেলেছ কি অমনি চিৎ পট্টাং।

একটা পুরনো আমলের দুর্গ আছে। তার নাম – 'ফোর্ট উইলডারনেস'। আসলে দুর্গটা বানানো হয়েছে বছর কুড়ি আগে, কিন্তু এমন কায়দায় যে, দেখলে মনে হয় দু-তিন শ' বছর ওর বয়স হবেই!



আমাদের টম-সয়ার দ্বীপ দেখা হয়নি। কারণ আমাদের দেরী হয়ে গিয়েছিল। আমরা যখন খেয়াঘাটে এসে পৌঁছালুম তখন খেয়াঘাট বন্ধ হয়ে গেছে।

জ্যাক-জিল দুজনেই টম-সয়ারের গল্প জানে। আমিও। তাই সকলেরই ভারি আপশোস রয়ে গেল।







বেয়ার কান্ট্রি

A HONEY OF A PLACE
Since 1972. Permits must be obtained for tree-climbing, scratching, hibernating etc.
[Permanent residents cxcepted]

ঊনিশ শত বাহাত্তর খ্রীষ্টাব্দে উন্মুখ এই মধুময়রাজ্যে বৃক্ষাধিরোহণেচ্ছুক, বৃক্ষকাণ্ডে নখর-চিহ্নদানেচ্ছুক তথা কুম্ভকর্ণনিভ-নাসিকাদানেচ্ছুক অতিথিবর্গকে পূর্বেই অনুমতি লইতে হইবেক।
[স্থায়ী-স্থানীয় বাসিন্দাগণ ব্যতিরেকে]

প্রবেশ পথে লেখা আছে ঐ বিজ্ঞপ্তিটি। যন সদ্যসাক্ষর কোন বাচ্চা ছেলের হাতের লেখা। ভালুক-রাজ্য ডিজ্‌নে-ল্যাণ্ডের শেষ সংযোজন। ওয়াল্ট ডিজ্‌নের খান-কয়েক চলচ্চিত্র অত্যন্ত জনপ্রিয় আর বক্স-অফিস ফাটানো সাফল্য লাভ করায় উনি ভালুকদের জন্য একটি পৃথক রাজ্যই বানিয়ে দিলেন। 'উনি' বলছি, আসলে ডিজ্‌নেল্যাণ্ড কর্তৃপক্ষ। কারণ ততদিনে ডিজ্‌নে-সাহেব পরলোকগমণ করেছেন। তা এত জন্তু থাকতে হঠাৎ ভালুক কেন?

শোনা গেল, যে ছবিগুলি সাফল্যলাভ করেছিল সেগুলি আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের যে দেশটা নাকি ভালুক-দের। ওঁর সেই ছবিগুলি : বেয়ার কাণ্ট্রি; দ্য অলিম্পিক এল্‌ক্; দ্য ভ্যানিশিং প্রেয়ারি ইত্যাদি।

ভাল কথা। প্রবেশ পথের ঐ ইংরাজি বিজ্ঞপ্তির মানেটা বুঝেছ তো? এটা ভালুকদের রাজ্য তো? তাই ভালুকরাজ্যের নগরপাল এই বিজ্ঞপ্তিটা দিয়ে বহিরাগতদের সাবধান করে দিচ্ছেন।

জ্যাক-জিল দুজনেই জানালো যে, ভালুকের মতো গাছে চড়তে, গাছের কাণ্ড নখ দিয়ে আঁচড়াতে অথবা তামাম শীত-কাল ভোঁস-ভোঁস ঘুমাবার বাসনা ওদের নেই।

ফলে আমরা বিনা পারমিটেই ঢুকে পড়ি ভালুকরাজ্যে। প্রথমে ভালুকদের একটা নাচগানের আসর।

36. **গেঁয়ো ভালুকদের জলসা :** মাঝারি মাপের থিয়েটার হল। আন্দাজ শ-পাঁচেক দর্শক বসতে পারে। প্রেক্ষাগৃহে ঢুকতেই নজরে পড়ল অডিটোরিয়ামের দু-প্রান্তে দুটি প্রকাণ্ড ভালুকের মাথা।



দেওয়ালে টাঙানো স্টাফ্‌ড্‌ ভালুকের মুণ্ডু। একটা ব্রাউন রঙের 'গ্রিজলে ভালুক'[1] আর একটা ধবধবে সাদা পোলার ভালুক[2]।

আমরা আসন গ্রহণ করার পর শোনা গেল, পরবর্তী অনুষ্ঠান শুরু হতে মিনিট দশেক দেরি আছে। জ্যাক-জিল দুজনে গুজুর গুজুর করছে, নীস বোধ হয় দশ মিনিটের একটা 'বেড়াল ঘুম' দেবার তালে আছে। সময় কাটাতে আমি স্কেচখাতায় ঐ স্টাফ্‌ড্‌ পোলার-বেয়ারের মুণ্ডুটাকে আঁকতে থাকি। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল ওর কাচের চোখ দিয়ে সেও আমাকে দেখছে। খানিকক্ষণ ছবি এঁকে দেখি—ভালুকটা অন্য দিকে তাকিয়ে আছে!

মুণ্ডুটা নড়েনি, কিন্তু চোখের মণিদুটো সরে গেছে। নিশ্চয় আমার দৃষ্টিবিভ্রম। ব্যাপারটা সমঝে নেবার আগেই আলো নিবে গেল। শুরু হল ভালুকদের গীতিনাট্য।

দু-পাঁচ-দশটা নয়, গোণাগুনতি কুড়িটা ভালুক অংশ নিল এই গীতিনাট্যে। এরা যান্ত্রিক ভালুক—Audio Animatronics প্রযুক্তিবিদ্যায় পরিচালিত—কিন্তু এবারও মনে হল, সত্যিকারের ভালুকই অভিনয় করছে। ওরা যে গান গাইল, যে বাজনা বাজালো তা প্রখ্যাত মার্কিন সঙ্গীতজ্ঞদের রেকর্ড করা গান-বাজনা। কিন্তু একটুও বোঝা গেল না—'ডাবিং' এত নিখুঁত।



আমার সবচেয়ে ভাল লাগল অনুষ্ঠানটি যখন একেবারে শেষ হল। মানে শেষেরও শেষে।

যবনিকাপাতের পর 'কার্টেন-কল'। আবার উঠে গেল পর্দা। বিশটি ভালুক এসে দাঁড়িয়ে মাজা ভেঙে 'বাও' করছে। তারপর নেমে এল শেষ যবনিকা। মঞ্চের আলো নিবে গেল। ঘোর অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

এবার প্রেক্ষাগৃহের আলো জ্বলে ওঠা উচিত। তা কিন্তু জ্বলল না। নীরন্ধ্র অন্ধকার। ব্যাপার কি? এখানে তো 'লোড-শেডিং' হয় না। ঠিক তখনই অন্ধকারে কে যেন গম্ভীর গলায় বললে, কই, তুমি তো হাততালি দিলে না?

কে বলল কথাটা? অন্ধকারে ঠাওর হয় না। কিন্তু কণ্ঠস্বর বেশ সোচ্চার। আবার কে যেন জবাবে বললে, হাত-তালি তো আমিও দিতে চাই। কিন্তু কেমন করে দিই ভাই? আমার কি হাত আছে যে, হাততালি দেব?

এবার জ্বলে উঠ্‌ল দুটো স্পট-লাইট—প্রেক্ষাগৃহের দু'-প্রান্তে দুই স্টাফ্‌ড্‌-ভালুকদের মুখে পড়ল আলো। ওরাই কথা বলছে। গ্রিজলে ভালুক এখন বলছে, তা বটে! শিকার করার পরে ছালটা ছাড়িয়ে নেবার সময় ওরা আমার হাত দুটো কেটে ফেলেছে। নাহলে আমি নিজেই তোমার চোখের জলটা মুছিয়ে দিতুম!

দেখি, পোলার-ভালুকের চোখ থেকে টপ্‌ টপ্‌ করে জল পড়ছে।

বেচারির হাত নেই তো।

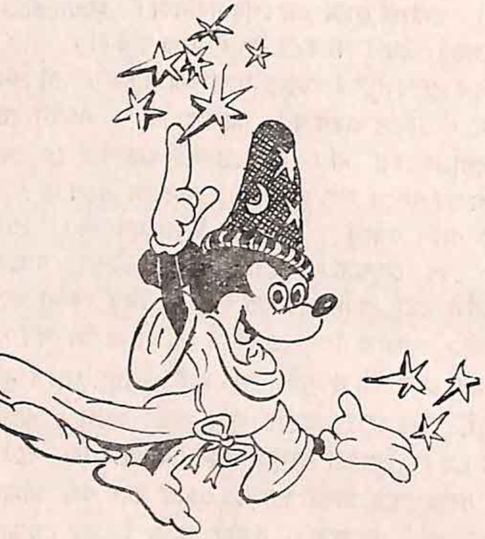
তাই চোখের জলটা মুছতে পারছে না।

আমি স্তম্ভিত। একজোড়া সজীব ভালুকের মাথা! কে কবে ঐ ভালুক দুটোকে মেরে এই সৌখিন আসবাব বানিয়েছে জানিনা, কিন্তু লোকটাকে তখন যদি হাতের কাছে পেতুম...

এটাই শিল্পের শেষ কথা।

এভাবেই 'ক্র্যাফ্‌ট্‌' হয়ে ওঠে 'আর্ট'।

স্ট্যাফ্‌ড্‌ জন্তুর মাথা তো কতবার কত বড় লোকের বাড়িতে দেখেছি, কিন্তু 'না-মানুষ'-দের উপর মানুষ যুগ যুগ ধরে যে কী প্রচণ্ড অত্যাচার চালিয়েছে তা কি কোনদিন এভাবে ভেবে দেখেছি? এজন্যই বলব—এই গীতি-নাট্যটি ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ! চার্লি চাপলিনের ছবিতে—গোল্ড রাশ, দ্য কিড্‌, সিটি-লাইট, লাইম-লাইট ইত্যাদিতে যেমন হাসি-অশ্রু মিতালিপাতায়, এখানেও তেমনি এই আনন্দ-মুখর গীতিনাট্য শেষ হল ঃ'perhaps with a drop of tears' দিয়ে।



ফ্যাণ্টাসিল্যাণ্ড

'ডিজ্‌নেল্যাণ্ড-'এর এই সপ্তম তথা শেষ রাজ্যটি দেখে যে মানুষ মুগ্ধ হবে না, হয় তার মন মানুষের নয়, নয় তার মন বনমানুষের। বুড়ো বাচ্চা সব বয়সের মানুষই এখানে এলে 'সবাই রাজা'।

সারা ইউরোপ আমেরিকায় অনেক অনেক অ্যামুজমেণ্ট পার্ক দেখেছি ; আমাদের দেশেও দেখেছি কত-কত চিল-ড্রেন্স পার্ক ; কিন্তু ডিজ্‌নেল্যাণ্ড-এর এই কল্পরাজ্য অতুলনীয়। মুশকিল এই যে, এর অনবদ্যতা ভাষায় বোঝানো যায় না। অনবদ্য, অপূর্ব, ফ্যাণ্টাস্‌টিক জাতীয় কতকগুলো বিশেষণই শুধু আমাদের পুঁজি। আমি চেষ্টা করব—যা দেখেছি, তার হুবহু বর্ণনা দিতে। বাকি কাজটা তোমাদের। কল্পনার রঙে সেই সাদামাটা ছবিটাকে রঙিন করে তোলা। বিজ্ঞানের অতি-আধুনিক সব প্রযুক্তিবিদ্যা, multiple vision, Audio Animatronics, steriophonic sound, holography ইত্যাদির সমন্বয়ে এঁরা অসম্ভবকে সম্ভব করে নানান বিজ্ঞানের ভেল্‌কি দেখিয়েছেন। অচেতন পদার্থকে বারে বারে সচেতন মনে হয়েছে। পুতুলেরা হাসে-কাঁদে, গান গায়, ত্রিংত্রিং নাচে—যেন তুমি আমি।

তার চেয়েও আর একটা বড় কথা আছে !

এখানে বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদেরা কাজ করেছেন প্রকৃত-শিল্পীর অধীনে। শিল্পীর নির্দেশে পরিচালিত হয়ে। তার ফলে যান্ত্রিক ভেল্‌কিগুলো শুধু ম্যাজিকের বিস্ময় হয়েই থেমে থাকেনি, হয়েছে রসোত্তীর্ণ শিল্প। একটু আগেই যেমন ভালুক রাজ্যের ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করেছি। ডিজ্‌নে প্রায়ই ঠাট্টা করে বলতেন—

"আমি এঞ্জিনিয়ার (engineer) চাই না, চাই ইম্যা-জিনিয়ার (imagineer) ; আমি জিনিয়াস (genius) চাই না, চাই ইম্যাজিনিয়াস (imagenius)।"

এই লাইনটার ভিতর দিয়েই তাঁর মনোভাবকে বোঝা যাবে। Imagineer এবং imagenius শব্দ-দুটো অভিধানে নেই। না থাক—ওঁর বক্তব্যটুকু বোঝা যাচ্ছে। অ্যালিসের বিস্ময় বোঝাতে লুই ক্যারলের সেই 'Curiouser, and curiouser' শব্দগুলির অর্থ বোঝা গেছিল, অভিধান বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও ! Imagineer হচ্ছে তারা, যারা এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা আয়ত্ত করেও মনের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে ফর্মূলার স্তূপে কবরস্থ হতে দেয়নি।'প্রতিভা' (genius) থাকলেই শুধু চলবে না, তা যেন কল্পরাজ্যে 'প্রতিভাত' (imagenius) হয়।

তাই হয়েছে। বারে বারে।

বিজ্ঞানের ভেল্‌কি তাই কল্পনা-রাজ্যের সামনে এসে বারে বারে হাঁক পাড়ে ঃ চিচিং ফাঁক।

যা দেখি তা মনে গাঁথা হয়ে যায়।

আমরা যখন ফ্যাণ্টাসিল্যাণ্ডে এসে পৌঁছালুম তখন দিনান্তের ক্লান্ত সূর্য পশ্চিম দিগ্বলয়ে ঢলে পড়েছে। আমরাও ক্লান্ত! সকাল আটটা থেকে হাঁটছি। আমি একা নই, আমরা সবাই। সন্ধ্যা হবহব। দু-একটি করে বাতি জ্বলে উঠছে এখানে ওখানে।

জিলের মাকে বলি, জিরুবে?

ম্লান হাসে। বলে, এখনো যে অনেককিছু বাকি!

তা বটে!

জ্যাক পরামর্শ দেয়, গ্র্যাণ্ড-পা, তোমার হাঁটুজোড়াকে একটু আদর করে বল—লক্ষ্মীসোনা! আর একটু কষ্ট কর বাছা! কাল তোমাকে আইসক্রীম খাওয়াব!

তাই বলি। হ্যাঁ, ঠ্যাঙ জোড়াকে।

এখানে এই ফ্যাণ্টাসিল্যাণ্ডে সেটা কিছুই অসম্ভব নয়।

(37) **স্লীপিং বিউটি রাজপ্রাসাদ:** সেণ্ট্রাল প্লাজা থেকে উত্তরমুখো এগিয়ে গেলেই ফ্যাণ্টাসিল্যাণ্ডের প্রবেশ পথে এই স্লিপিং বিউটি প্রাসাদ। গল্পটি ফরাসী রূপকথা। তাই প্রাসাদ-স্থাপত্য ফরাসী শৈলীতে বানানো। কিছুটা বা জার্মানির ব্যাভেরিয়ান স্টাইল। এই প্রসঙ্গে ম্যাটারহর্ণ পাহাড়ের সামনে যে দুর্গটা আছে তা একবার দেখে নিতে পার, পরিশিষ্টে। স্লিপিং বিউটি প্রাসাদটা ভারি সুন্দর দেখতে। জলতল থেকে প্রাসাদটা উঠে গেছে আকাশপানে, খাড়া তেইশ মিটার। এখানেও আর্কিটেক্ট সেই 'আরোপিত পরিপ্রেক্ষিতের' কায়দায় চোখকে ধাঁধায় ফেলেছেন। মানে, আসলে বাড়িটা যত উঁচু, তার চেয়েও বেশি মনে হয়। পাথরের অ্যাশ্‌লার গাঁথনি। মানে, পাথরের টুকরোগুলোকে সমান মাপে কেটে বড় বড় ব্লক গেঁথে বাড়িটি বানানো হয়েছে। 'সমান মাপে' হওয়ার কথা, কিন্তু যেহেতু স্থপতিবিদ দর্শকের চোখকে 'আপোরিত পরিপ্রেক্ষিত'-এর ধাঁধায় ফেলতে চান, তাই নিচের দিকের চেয়ে উপর দিকের 'অ্যাশ্‌-

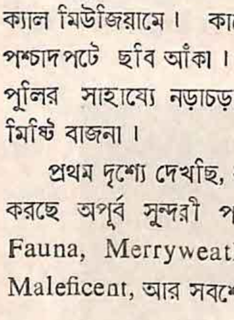


স্লিপিং বিউটি প্রাসাদে আতস-বাজির রোশনাই

লার ব্লকগুলো মাপে ছোট। আগেই বলেছি, চোখ মনে করে উপরেরগুলোও সমান মাপের—দূরে আছে বলে ছোট লাগছে; অর্থাৎ বাড়িটা আসলে যত উঁচু তার চেয়ে বেশি উঁচু মনে হয়।

প্রাসাদের চারিদিকে টলটলে স্ফটিকস্বচ্ছ জল। একটা পরিখায়। পরিখাটা বাড়িটাকে চারিদিকে বেষ্টন করে আছে। শুধু সামনের দিকে আছে একটা সাবেকি 'ড্র-ব্রীজ'। অর্থাৎ সাঁকোটা চেন-পুলির সাহায্যে ওঠানো-নামানো যায়। মধ্যযুগীয় কেল্লায় যেমন থাকত আর কি। একতলায় প্রকাণ্ড হল-কামরায় 'স্লিপিং বিউটি' গল্পটা 'ডায়োরামা'র (diorama) মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। ডায়োরামা বোঝ তো? ত্রিমাত্রিক মডেল খোপে খোপে সাজানো। যেমন কলকাতাতে তোমরা দেখতে পাবে জওহর শিশু সংগ্রহ শালায় চৌরঙ্গীতে, অথবা গুরুসদয় দত্ত রোডে বিড়লা সায়েন্স অ্যাণ্ড টেক্‌নলজিক্যাল মিউজিয়ামে। কাচের ঘরে ত্রিমাত্রিক মডেল, পিছনের পশ্চাদপটে ছবি আঁকা। এখানেও কিছু কিছু পুতুল চেন-পুলির সাহায্যে নড়াচড়া করে। নেপথ্যে বাজতে থাকে মিষ্টি বাজনা।

প্রথম দৃশ্যে দেখছি, কুচবরণ ছোট্ট রাজকন্যাকে আশীর্বাদ করছে অপূর্ব সুন্দরী পরীর দল। তাদের নাম: Flora, Fauna, Merryweather। তারপরে সেই হিংসুটে পরী Maleficent, আর সবশেষে লক্ষ্মীপরী Benevolent.



দাঁড়াও, দাঁড়াও। স্লিপিং বিউটি গল্পটা জান তো? কী বললে? কেউ কেউ জান না? আচ্ছা, সংক্ষেপে গল্পটা না হয় আগে বলি:

এক দেশে এক রাজা ছিল। রাজার হাতিশালে ঘোড়া, ঘোড়াশালে হাতী ইত্যাদি যেখানে যা থাকবার তা ঠিক ঠিকই ছিল। ছিল না যে, 'কী' তা তো তোমরা জানই। যা হোক, সে দুঃখও ঘুচল। রাণীমায়ের কোল আলো করে জন্ম নিল ফুটফুটে এক কুচবরণ রাজকন্যা।

তার অন্নপ্রাশনের দিনে রাজা পরীরাজ্য থেকে পাঁচজন পরীকে নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু নিমন্ত্রণ রাখতে এল পাঁচজন নয়, ছয়-ছয়জন পরী। কী ব্যাপার? শোনা গেল, পরী রাজ্যে এক থুথ্থুড়ে বুড়ি পরী আজও বেঁচে আছে। রাজা ভুল খবর পেয়েছিলেন যে, তিনি নাকি স্বর্গে গেছেন [পরীরা মরলে স্বর্গে যায় নাকি? ভূত মরলে মার্বেল হয়[1], কিন্তু পরীরা?]

সেই বুড়ি পরীটা ছিল ভীষণ হিংসুটে। এতদিন অসুখে ভুগছিল, বিছানায় পড়ে কাতরাতো। পাঁচ পরী তার সেবাযত্ন করত। এখন নিমন্ত্রণের গন্ধ পেয়ে হিংসুটে বুড়ি পরীটা ত্রিং করে লাফিয়ে উঠেছে। ওদের পিছু পিছু কোমর বেঁধে এসেছে অন্নপ্রাশনের নেমতন্ন খেতে।



রাজারানী অবশ্য তাতে খুশিই হলেন। রাজা বলেন, আপনিও যে এখানে আসতে পারবেন, তা আশা করিনি।

বুড়ি বলে, কেন মিছে কথা বলছ বাছা? ভেবেছিলে আমি অক্কা পেয়েছি, তাই না?

—ছি ছি ছি। এ কী বলছেন? রাজা বিব্রত।

ছয় পরীকে রাজা যত্ন করে খাওয়ালেন। দামী দামী উপহার দিলেন। তারপর পরীরা এল বাচ্চাকে আশীর্বাদ করতে। প্রথম পরী বললে, আমার বরে রাজকন্যার গায়ের রঙ হবে চাঁপার কলির মতো। দু-নম্বর পরী বলে, ওর মাথার চুল হবে সোনার বরণ। তিন নম্বর পরী বলে, আর গানের গলা হবে নাইটিঙ্গেল পাখির মতো মিষ্টি। বজ্জাত পরীটা ছিল সবার পিছনে। আর সহ্য হল না তার। হিংসায় ফেটে পড়ছে যেন। এক লাফে আগের পরীকে ডিঙিয়ে এসে বুড়ি পরী বললে, হুঁ হুঁ বাবা। অত সুন্দরী হলে কী হবে? তোমরা সবাই শুনে রাখ—রাজকন্যার বয়স যখন ষোল বছর পূর্ণ হবে, তখন একদিন সেলাই করতে গিয়ে ওর হাতে সূঁচ ফুটবে, পট্ করে ফুটবে, আর তৎক্ষণাৎ মট করে অক্কা পাবে। কী মজা! কী মজা!



হায় হায় করে ওঠে ঘরসুদ্ধ সবাই।

যে লক্ষ্মীপরীকে ডিঙিয়ে গিয়ে বুড়িটা অভিশাপ দিয়েছিল তার আশীর্বাদ তখনো বাকি। সে বুদ্ধি করে বললে, বুড়ি পরীদিদির কথা তো আর ফেরানো যাবে না, তাই বলি, সবাই ভাববে যে, রাজকন্যা মারা গেছে, কিন্তু আসলে সে

মরবে না, সে শুধু অক্কা পাবে।

সবাই অবাক। অক্কা পাবে! তার মানে কি? অক্কা পাওয়া মানেই তো—

পাঁচনম্বর পরী বলে, তোমরা কিছুই জান না দেখছি। 'অক্কা পাওয়া' মানে একশ বছর ধরে একটানা ঘুমানো। বুড়ি-পরীদিদিকেই না হয় জিজ্ঞেস করে দেখ। বুড়ি-পরীদিদি তো আর হিংসুটে নয় যে, এক পেট নেমতন্ন খেয়ে এখন ঢেকুর তুলতে তুলতে অভিশাপ দেবে। তাই না, বুড়ি-পরী দিদি? ঠিক বলিনি?

বুড়ি-পরী লজ্জা পায়। একঘর লোকের সামনে সে কোন লজ্জায় স্বীকার করে। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলে, বটেই তো। বটেই তো। আমি কি তেমন হিংসুটে? রাজকন্যা মরবে না, শুধু অক্কা পাবে। মানে শুধু একশ বছর একটানা ঘুমাবে। শুধু ঘুমাবে আর ঘুমাবে।

—একশ বছর! তারপর? কী করে তার ঘুম ভাঙবে? ছয় নম্বর পরী এবার এগিয়ে এসে বলে, শোন বলি—একশ বছর পরে অচিন-দেশের রাজপুত্তুর এসে আবিষ্কার করবে ওকে। ফুলের মতো ঘুমন্ত রাজকন্যাকে। এই একশ বছরে রাজকন্যার বয়স কিন্তু বাড়বে না। সে সেই ষোল বছরের ফুটফুটে সুন্দরীই থেকে যাবে।

এ সেই স্লিপিং বিউটির রাজপ্রাসাদ।

সমস্ত গপ্পটাই নানান মডেল দিয়ে সাজানো। দেখতে পাচ্ছি—হাতে সূঁচ ফোটার দৃশ্য! রাজা রানীর সবরকম সাবধানতা সত্ত্বেও সেই দুর্ঘটনা ঘটল। রাজকন্যা ঘুমিয়ে পড়ল। শেষদৃশ্যে দেখছি অচিনপুরের রাজপুত্র এসেছে ঘোড়ায় চেপে। ভাঙা প'ড়ো বাড়িটায় ঢুকে ঘুরে ঘুরে দেখছে সে। হঠাৎ দেখতে পেল—বিরাট একটা পালঙ্কে শুয়ে আছে একটি অপূর্ব সুন্দরী রাজকন্যা।

তার কুচবরণ রঙ, সোনার বরণ চুল। অবাক হয়ে গেল রাজপুত্র। এই বিজন বনে ভাঙা রাজপ্রাসাদে কোথা থেকে এল এমন একটি রাজকন্যা? নিচু হয়ে যেই রাজকন্যার গলায় নিজের গলার মালাটা পরিয়ে দিয়েছে অমনি ঘুম ভেঙে উঠে বসল রাজকন্যা। বললে, 'কে পরালে মালা?'

যেন নাইটিঙ্গেল পাখির গান।

তারপর? তারপর বাংলামতে সেই ঢাক-ঢোল কাড়া-নাকাড়া, আর ইংরাজি-মতে And they lived happily ever afterwards।

(38) **স্নো-হোয়াইট আর সাতবামন:** স্নো-হোয়াইট যেন কার্ত্তিক ঠাকুরটি—'একবার আসেন মায়ের সঙ্গে, একবার আসেন একলা।'

আচ্ছা, তোমরা আমাকে বুঝিয়ে বলতে পার—কেন কার্ত্তিক ঠাকুরের ঐ বদনাম? গণেশও তো দুর্গাপূজার পরে এসে হাজির হন পয়লা বৈশাখে? কোন কিছু পূজা করতে গেলেই সবার আগে, 'গণেশায় নমঃ' করতে হয়। সরস্বতীও আসেন মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে। আর একজন আছেন—নাম করব না বাবা, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে যাব তাহলে—তিনি তো বছরে বাহান্নবার বাতাসা-সন্দেশের লোভে জাঁকিয়ে বসেন ঠাকুরঘরে। প্রতি বিষ্যুৎবারে। তাহলে?

স্নো-হোয়াইট-এরও তেমনি কপাল মন্দ। সবাই বলে, সিণ্ডেরেলা, অ্যালিস, পিনোকিও, স্লিপিং বিউটিদের জন্য এক একটি শো-রুম আছে; কিন্তু স্নো-হোয়াইটের জন্য দু-দুটি মণ্ডপ! তার মানে কি স্নো-হোয়াইট হ্যাংলা?

একটার নাম—'স্নো-হোয়াইট গ্রোটো' আর একটার নাম—'স্নো-হোয়াইট্স্ স্কেয়ারি অ্যাড্ভেঞ্চার।' স্লিপিং বিউটি প্রাসাদ-ঘেরা পরিখার পূর্বপ্রান্তে আছে একটা 'উইশিং-ওয়েল', বাংলায় 'ইচ্ছাপূরণ কূপ'। সেখানে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াতে হবে। তারপর সিকি বা দশ নয়া, থুড়ি, 'কোয়ার্টার' বা 'ডাইম' হাতে নিয়ে মাথার উপর দিয়ে পিছনের ঐ চৌবাচ্চায় ফেলতে হবে। আর ঠিক তখনই মনে মনে একটা ইচ্ছে করতে হবে। ব্যস! তাহলেই আর দেখতে হবে না। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাপূরণ। তবে একটা শর্ত আছে!

ঐ ইচ্ছার কথাটা কাউকে বলতে পারবে না!

জ্যাক-জিল দুজনেই 'ডাইম' ফেল্ল। আর একটু পরে প্রথম সুযোগেই তাদের কুড়িয়ে-পাওয়া-দাদুর কানে কানে জানালো—ওরা দুজনেই প্রার্থনা করেছে, আবার যেন এই ডিজ্নেল্যাণ্ডে ফিরে আসতে পারে।

আমাকে কানে কানে বলায় নাকি দোষ হয়না, আমি যে থাকি পৃথিবীর হু—ই ও-প্রান্তে।

ঐ স্নো-হোয়াইট গ্রোটোতে বসে তুষারশুভ্র মেয়েটি গান গায়—আয়াম উইশিং...

এ গানটা ওয়াল্ট ডিজ্নের অস্কার-বিজয়ী ফিল্মের বিখ্যাত গান। রেকর্ড করা। গানের সঙ্গে সঙ্গে ঐ মাঝ-খানকার ফোয়ারায় পিচকারি দিয়ে জল ওঠে। ছাতার মতো গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। রাত্রে মনে হয় সাতরঙা যেন একটা

রামধনু। সেই সঙ্গে লাল-নীল অসংখ্য জ্যান্ত মাছ ছিট্‌কে পড়ে চৌবাচ্চায়। মনে হল, মাছগুলোর এ খেলা ভালই লাগে! বারে-বারে লাফ খেতে।

দেখি, সাতবামন বসে আছে ঐ চৌ-বাচ্চাটা ঘিরে। তন্ময় হয়ে গান শুনছে। সবগুলি মূর্তিই কারারা[৫] মার্বেলে বানানো।

দ্বিতীয় প্রদর্শনীটা হচ্ছে স্নো-হোয়াইটের ভয়াবহ অভিযান—'স্নো-হোয়াইট্‌স্ স্ক্যারি অ্যাডভেঞ্চার!

তুলনামূলকভাবে এটা বেশি আনন্দদায়ক। একটা কথা বলে রাখি, এটা এমন জায়গায় বানানো যে, সহজে নজর পড়ে না। তাই বলি—যদি কখনো ডিজ্‌নেল্যাণ্ড যাবার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়, তাহলে এখানে মার্জিনে পেন্সিলে দাগ দিয়ে রেখ: V.V.I!

স্লিপিং বিউটি প্রাসাদের পশ্চিমে আছে 'টিঙ্কার বেল ক্রয় শপ'। ঠিক তার পাশ দিয়েই এই প্রদর্শনীতে ঢুকবার এটা সরু গলি-পথ। তাড়াহুড়ায় যেন গলিপথটা নজর এড়িয়ে না যায়। খুব সাবধান।

ভিতরে ঢুকলে তুমি। সামনেই দেখবে, সাতবামনের নামাঙ্কিত সারি সারি গাড়ি। সবই টু-সীটার। সাতবামনের নাম জানো তো? - গ্রাম্পি, স্লিপি, ডোপি, ব্যাশ্‌ফুল, হ্যাপি, ডক, আর স্নীজী। এই 'সাত-দাদা-চম্পার' পারুল-বোন হচ্ছে মেয়েটি।

যে কোন একটায় চড়ে বসলে। গাড়ি চালু হতেই একটু ঘাবড়ে যাবে তুমি। ভাবতে বসবে - ভুল করে সেই ভূতালয়ে আবার ঢুকে পড়েছ বুঝি! কেমন যেন গা-ছম্‌ছম্ ভাব! হঠাৎ নজরে পড়বে একটা ভাঙা প'ড়ো বাড়ি। হোক ভাঙা, বেশ বোঝা যায়—এককালে তা প্রাসাদ ছিল। দোতলার ঐ জানলাটা খোলা নয়? হ্যাঁ, তাই তো! মনে হবে, লাল ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে কে যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঠিক তোমাকেই লক্ষ্য করছে। কে ও? হঠাৎ চিনতে পারলে তুমি। এ সেই স্নো-হোয়াইটের বজ্জাৎ সৎমাটা। সেই যে হিংসুটেটা মায়ামুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে নিত্যি ঘ্যানঘ্যান করত, বল্ তো মায়ামুকুর, এ দুনিয়ায় সবচেয়ে সুন্দরী কে?

বাড়ির স্থাপত্য গথিক শৈলীর[৭]। জানলার পাশে, পাথরের গম্বুজের উপর একটা নরমুণ্ডের স্কাল বা কঙ্কাল। তার উপর বসে আছে কুচকুচে কালো একটা দাঁড়কাক। কালো মার্বেলে বানানো। দু-একটা রক্তাক্ত হরতন এখানে ওখানে ছড়ানো। হরতন কেন বুঝেছ তো? – ভগ্নহৃদয়!

রক্তাক্ত – কারণ তাদের গায়ে নানান অস্ত্র বেঁধা।

গাড়ি চলেছে রেল লাইনের উপর দিয়ে। অনেকটা ট্রলির মতো গাড়ি। দুজন-দুজন বসেছি আমরা। চালাতে হয় না। আপনিই চলে। সাপের মতো এঁকে বেঁকে। দু-পাশে দেখতে পাচ্ছি মাকড়শা-জালের চাদর মুড়ি দেওয়া ঝোপ-ঝাড় আগাছা। জোনাক পোকা জ্বলছে অন্ধকারে। জ্বলছে আর নিবছে। মাকড়শার জালগুলোও নিত্যি মেরামত করা হয়। হঠাৎ তোমার মাথার উপর দিকে উড়ে গেল কী একটা রাতচরা পাখি! ক্যাঁক ক্যাঁক – ক্যাঁক।

এতক্ষণে তোমার গা-ছমছম করছে। বাঁকের মুখে আবার দেখতে পেলে একটা বুড়িকে। ডাইনি বুড়ি। কী যেন রান্না করছে উনানে। তোমার চোখে চোখ পড়তেই জানলাটা বন্ধ করে দিল। কিন্তু তার আগেই তুমি দেখে নিয়েছ—ও রাঁধছে সেই বিষাক্ত 'অ্যাপল্-পাঈ', মানে আপেলের মোরব্বা। গ্রিম-ভাইদের[৮] গপ্পটা পড়া আছে যে তোমার, অথবা দেখা আছে ডিজ্‌নের সেই অস্কার-বিজয়ী ছবিটা।



স্নো-হোয়াইট আর সাত বামন

গাড়ি বাঁক ঘুরেই ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল। দেখলে, রেল-লাইনের মাঝখানে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। পাগলী নাকি? এক্ষুণি চাপা পড়ত যে! না, ও পাগলী নয়, তুমি চিনতে পেরেছ হঠাৎ! এ সেই ডাইনি বুড়িটা, যে তখন আপেলের সেই বিষাক্ত মোরব্বাটা বানাচ্ছিল। কী সর্বনাশ! তোমাকে দেখেই ডাইনিটা নিদন্ত-হাসি হেসে বলবে, খাও না বাছা

ভারি মিষ্টি আপেল। লজ্জা কী ?

তুমি দেখলে, সেই বিষাক্ত আপেলটা বাড়িয়ে ধরে ডাইনিটা তোমাকেই ডাকছে। মোরব্বা খেতে বলছে।

স্বয়ংচালিত গাড়িটার বুদ্ধি আছে। হঠাৎ স্টার্ট দিয়ে বুড়িটাকে চাপা দিতে চাইবে।

কিন্তু তাই কি পারে ? ও কত চালাক ! ত্রিং করে এক লাফে সরে যাবে বুড়িটা। দূর থেকে ভেসে আসবে তার খন্‌খনে গলায় হাসি—ওরে বোকা গাড়ি ! আমাকে চাপা দেওয়া কি অত সহজ রে ?

তারপর এক সময়ে তুমি পৌঁছবে সেই সাত-বামনের গুহার ধারে। হাসি-খুশি সাত-বামন মিলে মিশে থাকে। লম্বা দাড়ি, লম্বা চুল, মাথায় লাল টুপি, মুখে সদাই হাসি।

গান-বাজনা ভালবাসে তারা। গ্রাম্পি বাজায় পিয়ানো, স্লীপী বাজায় ফিড্‌ল, ব্যাশকুল তান তুলেছে গীটারে। হ্যাপির হাতে ঐ যন্ত্রটার নাম বোধ হয় accordion, বাংলা নাম জানি না। ডক বাজাচ্ছে ম্যাণ্ডোলীন। আর পুঁচকে 'ডোপি' চড়ে বসেছে স্নীজীর কাঁধে। স্নীজী যথারীতি হাঁচছে—হ্যাঁচ ছো।

ট্রলিতে যেতে যেতে গোটা গল্পটাই উপভোগ করবে তুমি। পাহাড়-চূড়ো থেকে উল্টে পড়ে ডাইনিটাকে মরতে দেখবে। সব শেষে তুষারশুভ্রা আর সাত-বামনের সেই হাত-ধরাধরি করে ধেই-ধেই নৃত্য।

শেষের পরেও একটা শেষ আছে। নটেগাছটি মুড়ানোর মতো : and they lived happily ever afterwards।

(39) **পিনোক্কিও :** চেন তাকে ? স্নো-হোয়াইট, সিণ্ডেরেলা বা ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের অ্যালিস-এর মতো আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সবাই ওকে চেনে না। কিন্তু ইটালীতে পিনোক্কিওর ভারি কদর। ইতালী দেশের গল্প যে। দাঁড়াও, আগে ছোট্ট করে গল্পটা বলে নিই—

গেপ্পেতোর নাম শুনেছ ? গরিব বুড়ো ছুতোর। তিন কুলে তার কেউ নেই। মাথায় কদমছাঁট চুল, চোখে ডিমের মতো চশমা, কানে পেনসিল গোঁজা। দারুণ দারুণ কাঠের পুতুল বানাতো আর হাটে বেচে আসত। একদিন হয়েছে কি — গেপ্পেতো সারাদিন ধরে একটা জবর কাঠের পুতুল বানালো। বাচ্চা ছেলে। হাতে গ্লাভ্‌স্‌, মাথায় টুপি, তাতে আবার একটা পাখির পালক গোঁজা। নাটানাটা চোখ, তাতে দুষ্টু-দুষ্টু চাহনি। ভারি চালাক চতুর। বুড়ো আদর করে তার নাম রাখল 'পিনোক্কিও'।

সারাদিন কাজ করে বুড়ো ক্লান্ত। টেবিলের উপর পিনোক্কিওকে বসিয়ে ও বিছানায় শুয়ে পড়ে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে মোমবাতির আলোয় তার পুতুলের মুখখানা দেখতে দেখতে বুড়োর মনে হল, 'আহা, আমার যদি অমন একটা ছেলে থাকত ! তাহলে কী মজা হত ? আমি তাকে মানুষ করতুম। লেখাপড়া শেখাতুম, আর শিখিয়ে দিতুম এই ছুতোরের কাজটাও। তাহলে বুড়ো বয়সে ছেলেটাই আমার দেখভাল করতে পারত।'

এখন হয়েছে কী—'ইচ্ছাপূরণ পরী' ঠিক তখনি ওর জানলার তলা দিয়ে যাচ্ছিল। বুড়োর কথাটা কানে গেল ঐ ইচ্ছাপূরণ-পরীর।

পরদিন সকালে গেপ্পেতোর ঘুম ভাঙল কার যেন ডাকা-ডাকিতে, হাই ড্যাড্‌। ওঠ। আর কত ঘুমাবে ?

চোখ চেয়ে বুড়ো তো একেবারে তাজ্জব !

পিনোক্কিও ওকে ঠেলাঠেলি করছে !

বুড়ো বলে, তুই জ্যান্ত হয়ে গেছিস ?

পিনোক্কিও ত্রিং করে এক লাভ মেরে বলে, বিশ্বাস হচ্ছে না ? ওঠ, ওঠ। আমার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।

বুড়ো তো দারুণ খুশি। তার পুতুলের কাঠের হাত-পা, কিন্তু ঠিক মানুষের বাচ্চার মতোই সে হাসে, খেলে, গান গায়, ত্রিং-ম্রিং লাফায়। ইচ্ছাপূরণ পরীর বরে।

বুড়ো তাকে খুব যত্ন-আত্তি করে। নিজে হাতে খাইয়ে দেয়, নাইয়ে দেয়, ইস্ক্রুপ আল্‌গা হয়ে গেলে স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে কষে দেয়।

একদিন বুড়ো বললে, পিনোক্কিও, শোন, তোমাকে ইস্কুলে ভর্তি হতে হবে। তোমার বয়সী বাচ্চারা সবাই ইস্কুলে পড়ে।

পিনোক্কিও ত্রিং করে এক লাফ মারে। বলে, ধু—স। পড়া টড়া আমার দ্বারা হবে না।

—ওমা সে কী। তাহলে কেমন করে তুমি মানুষ হবে ?

পিনোক্কিও খেঁকিয়ে ওঠে, কী বাজে বকছ ! আমি তো মানুষ হয়েই গেছি। আমি কি কাঠের পুতুল ?

—না, না সে কথা বলছি না। লেখাপড়া না শিখলে তুমি বড় হয়ে কী করবে ?

—কী আবার করব ? 'মাছ মারব খাব ভাত, লেখাপড়া কী উৎপাত ?' ও সব পড়া-টড়া আমার দ্বারা হবে না।

আসল দোষ কিন্তু গেপ্পেতোর। সে কেন তার কাঠের

পুতুলটার মুখ অমন দুষ্টু-দুষ্টু করে বানালো ? 'গোপাল-গোপাল' চেহারার বানালেই পারত ? তাহলে পিনোক্কিও হত 'অতি সুবোধ বালক'। বাপ যেমন বানিয়েছে বেটা তো তেমনই হবে। ওর কাঠের গাঁঠে-গাঁঠে দুষ্টুমির বুদ্ধি—ইস্কুপে-ইস্কুপে বদমাইসির প্যাঁচ। প্রতিবেশীরা ক্রমে অস্থির হয়ে ওঠে ওর দুষ্টামিতে। শেষ-মেশ গেপ্পেতো একদিন জোর করে তার ছেলেকে ধরে ইস্কুলে নিয়ে চল্‌ল। আজ ওকে ভর্তি করে দিতেই হবে।

কিন্তু যেই বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমেছে অমনি বুড়োর হাত ছাড়িয়ে পিনোক্কিও দিলে এক ছুট ! বেচারি গেপ্পেতো বুড়ো মানুষ। কী করবে সে ? পিছন পিছন সেও ছুটতে থাকে। কিন্তু পারবে কেন ? এক লহমার মধ্যে পিনোক্কিও এর দোকানে ঢুকে জিনিষপত্র ছড়ায়, ওর দোকানে কাচের বাসন-গুলো ঝন্‌ঝনিয়ে চুরমার করে ! সে এক বিশ্রী কাণ্ড ! দ্যাখ-দ্যাখ্‌ ধর ধর করতে করতেই সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেল।

পুলিসে ধরল বেচারি গেপ্পেতোকে। আটক করে রাখল কয়েদখানায়। বেটার দোষে বাপ গেল জেলে।

পিনোক্কিও-র তো পোয়া-বারো ! এখন আর তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। সে বাড়ি ছেড়ে বার হয়ে পড়ল দিগ্বিজয়ে। দুনিয়াটা কেমন, তা ওকে দেখতে হবে ভাল করে।

অনেক-অনেক কাণ্ড হল তারপর। সব কথা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তোমরা বরং পড়ে নিও পিনোক্কিও-র কাহিনী। তোমাদের স্কুল-লাইব্রেরির বইতে।



ছোট্ট করে বলি : প্রথমেই সে পড়ল একজন পুতুল-নাচ-ওয়ালার খপ্পরে। সে লোকটা ভারি পাজি ! সেখানে পিনোক্কিও প্রায় মরতে বসেছিল।

শেষ পর্যন্ত একটি লক্ষী-পরীর দয়ায় সে-যাত্রা সে প্রাণে বেঁচে যায়। মুক্তি পায়। লক্ষীপরী ওকে আড়ালে ডেকে কত করে বোঝালো – 'দুষ্টুমি করতে নেই !'

কিন্তু চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী !

শেষে পরীটা জানতে চাইল তার নাম, বাবার নাম, ঠিকানা ! কিন্তু পিনোক্কিওর পেটে পেটে ইস্কুপের প্যাঁচ। সে বুঝতে পারে, সত্যিকথা বললেই লক্ষীপরী তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। বাড়ি ফিরে যাবার ইচ্ছে তার একটুও নেই। তাই দুষ্টুটা বলে গেল—একঝুড়ি মিছে কথা !

আর সঙ্গে সঙ্গে তার নাকটা হয়ে গেল ই-য়া লম্বা। মিছে কথা বলার পাপে।

লক্ষীপরী বললে, তোমার শিক্ষা এখনো হয়নি দেখছি। ঠিক আছে, যা-ইচ্ছে কর।

পরীর হাত থেকে ছাড়া পেয়েই পিনোক্কিও দিলে প্রিং করে এক লাফ। দারুন খুশি সে মুক্তি পেয়ে। পাঁই-পাঁই ছুট লাগায়। যেদিকে মন চায়।

ইতিমধ্যে গেপ্পেতো ছাড়া পেয়েছে কয়েদখানা থেকে। বাড়িতে ফিরে ছেলেটাকে দেখতে না পেয়ে বুড়ো চোখের জলে ভাসল ! আহা রে ! কোথায় গেল তার দুধের বাছা। আতি-পাঁতি সে খুঁজতে থাকে। দোরে-দোরে গিয়ে শুধায়, ওগো, তোমরা আমার পিনোক্কিও-কে দেখেছ ?

প্রতিবেশীরা সবাই পিনোক্কিও-র উপর খাপ্পা ছিল। কিন্তু বুড়োর চোখের জলে বুক ভাসছে দেখে সকলের দয়া হল। সবাই মিলে সারা শহরটা তারা আতি-পাঁতি খুঁজল।

কিন্তু বুড়োর 'দুধের বাছা' কি আর ওখানে আছে ? সে অতি খলিফা। অনেক অনেক দূরে চলে গেছে সে।

ইতালী দেশটা—তোমরা তো জানই – দুই সাগরের মাঝখানে বুট-জুতো-পরা ঠ্যাঙের মতো। তার উত্তরে অ্যাড্রি-য়াটিক আর দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর। স্বদেশে ছেলেকে খুঁজে না পেয়ে বুড়ো একটা নৌকা বানিয়ে সাগরে পাড়ি জমালো।

বেচারির কপালই মন্দ। এল ভীষণ সমুদ্র ঝড়। ঝড়ের বেগে নৌকা গেল উল্‌টে। বুড়ো ছিটকে পড়ল সমুদ্রে। আর হবি তো হ ঠিক সেখানেই 'যোনহা'-নামে একটা তিমি তখন জল থেকে নিশ্বাস নিতে উঠেছে। কপাৎ করে তিমিটা গিলে ফেলল ওকে।[5]

পিনোক্কিও এসব কিছুই জানে না। মনের আনন্দে সে পথে পথে দুষ্টুমি করে বেড়ায়। এবার সে পড়ল একজন বজ্জাত সার্কাস-ওয়ালার পাল্লায়।

লোকটা অনেক মন্তর-তন্তর জানত। বাচ্চা ছেলেদের সে মন্তর পড়ে গাধা বানিয়ে নানান খেলা দেখায়। অনেক অনেক বাচ্চা ছেলে—ঐ যারা বাপ-মায়ের কথা না শুনে একা একা পথে বেরিয়েছে- তাদের ধরে সে গাধা বানিয়েছে। তার নয়টা গাধা আছে, নয়টা বাচ্চা ছেলে ! পিনোক্কিও-কে নিয়ে দশটা হবে। কিন্তু পিনোক্কিও-কে সে কিছুতেই গাধা বানাতে পারল না। কি করে পারবে ? সে যদি ওকে বলে,

'এই ওষুধটা খেয়ে নাও তো খোকন' অমনি পিনোক্কিও থু-থু করে ওষুধটা ফেলে দেয়। সার্কাস-ওয়ালা রেগে মেগে বললে, তবে রে! আমার কথা না শুনলে কী হয় এবার দ্যাখ!

হাত-পা বেঁধে পিনোক্কিও-কে একটা পাহাড়ের উপর থেকে সে ছুঁড়ে ফেলে দিল সমুদ্রে! কিন্তু পিনোক্কিও তো রক্তমাংসের নয়। কাঠের। তাই সে জলে ডুবল না। সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে সে ভাস্‌তে ভাস্‌তে কোন্ ভিন দেশে চলে গেল। কাঠ, তাই ডুবছে না, কিন্তু খেতেও পাচ্ছে না কিছু। খিদের জ্বালায় বেচারি মরমর।

তখন হল আর এক কাণ্ড! একটা তিমিমাছও ওর মতো খিদের জ্বালায় ইতিউতি ঘুরছিল। ওকে দেখতে পেয়েই—ব্যস্! কপাৎ!

তোমরা ঠিকই আন্দাজ করেছ। সেই তিমিটাই! যোনহা! তিমির পেটে বাপ্-বেটায় দেখা হয়ে গেল।

—তুমি! এখানে?

—তুই! এখানে?

গেপ্পেতো আনন্দে জড়িয়ে ধরল ছেলেকে। পিনোক্কিও বলে, ওসব আদর সোহাগ পরে হবে, আপাতত একটা ফন্দি কর দিকি—কীভাবে এই তিমির পেট থেকে বার হওয়া যায়!

বুড়ো বলে, কোনো উপায় নেই রে! তবে সান্ত্বনা এই যে, দুজনে একসাথেই মরব। বাপবেট এক সাথে!

পিনোক্কিও ধমকে ওঠে, ঈশ্! বললেই হল? এমন উপযুক্ত পুত্র থাকতে তুমি মরবে কেন? শোন! আমার বাঁধন খুলে দাও। আর আমার নাইকুণ্ডলির কাছে ইস্ক্রুপটা আল্‌গা হয়ে গেছে। সেটা বেশ কষে সেঁটে দাও দিকি।

বুড়ো তাই দিলে। ওর হিপ্-পকেটে সব সময় স্ক্রু-ড্রাইভার মজুত থাকে। জাত ছুতোর কি না!

পিনোক্কিও এতক্ষণে সারা দেহে বল ফিরে পায়।

বলে, ড্যাড! তিমিটার নাকে তোমার ঐ স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে একটু সুড়সুড়ি দাও দিকিন—

বুড়ো তো অবাক! বলে, কেন রে? তাতে কী হবে?

—দিয়েই দেখ না।

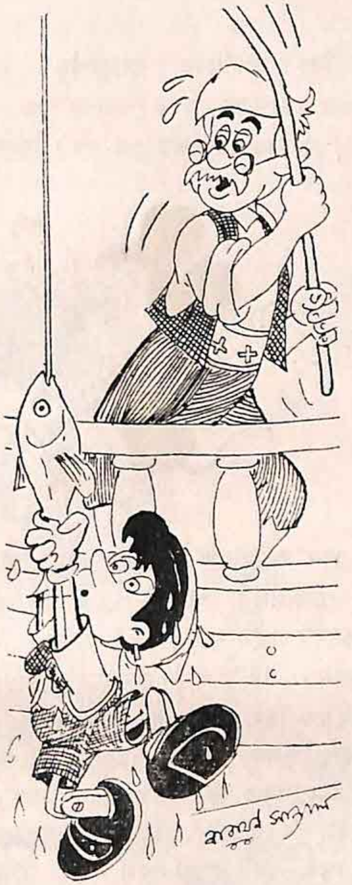
বুড়ো তাই দিলে।

নাকে সুড়সুড়ি দিতেই তিমিটা হাঁচে—হ্যাঁচ-চ্ছো!

তার ফল কী হল বুঝেছ? তিমির হাঁচি বলে কথা! বাপ-বেটায় ছিট্‌কে বেরিয়ে এসে পড়ল সমুদ্রে।

সাঁৎরাতে সাঁৎরাতে পৌঁছে গেল সেই নৌকাটায়। নৌকায় খাবার-দাবার যা ছিল এ্যাদ্দিনে সব নষ্ট হয়েছে। কিন্তু মাছ-ধরা ছিপটা ছিল। বাপ বল্‌লে, আয় কিছু মাছ ধরি।

পিনোক্কিও তো এক পায়ে খাড়া। 'মাছ মারব খাব ভাত'—এই ছিল ওর জীবনের মূলমন্ত্র। দুজনে অনেক মাছ ধরল। টাট্‌কা মাছের ঝোল বানিয়ে খেল দুজনে।



বাপবেটায় মাছ ধরা

তারপর ওরা ফিরে এল স্বদেশে।

শোনা যায়, এরপর থেকে পিনোক্কিও আর কখনো দুষ্টামি করেনি। এমন কি সেই লক্ষীপরীর বরে ওর নাকটাও স্বাভাবিক হয়ে গেল। কাঠের পুতুল থেকে সে হয়ে গেল সত্যিকারের লক্ষী ছেলে। ইস্কুলে ভর্তি হল এবার। লেখা-পড়া শিখে মানুষ হল। বাপের জাত-ব্যবসাটাও শিখে ফেলল। বুড়ো গেপ্পেতোর দুঃখ ঘুচল।

এই আজব কিন্তু মিষ্টি গল্পটা তোমরা দেখতে পাবে 'পিনোক্কিও অভিযানে'। এখানেই 'হলোগ্রাফী' প্রযুক্তিবিদ্যার

প্রথম প্রয়োগ করা হয়। ঐ যেখানে সার্কাস-ওয়ালা বাচ্চা-ছেলেদের গাধা বানাচ্ছে। এই দেখছ ফুটফুটে বাচ্ছা – এই হয়ে গেল গাধা! রীতিমতো ভেল্‌কি। কিন্তু নিছক বিজ্ঞানের খেলা। লক্ষ্মীপরীও 'ফাইবার অপটিক্স'-এর একটি অনবদ্য প্রয়োগ।

(40) **কিং আর্থারের ঘোড়দৌড় :** মেলা-প্রাঙ্গণে কাঠের ঘোড়ায় চড়ে চক্কর মারতে কোন্‌-না বাচ্চা খুশি হয়? এখানে ঘোড়-দৌড়ের ঘূর্ণিপাকে এক-এক সারিতে চার-চারটে



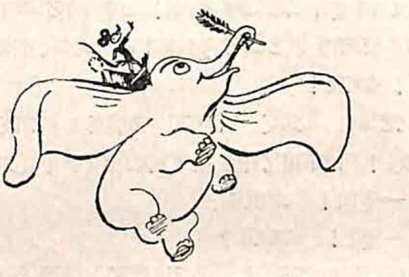
ঘোড়া। এমন আঠারোটি সারিতে সব মিলিয়ে আছে বাহাত্তরটি পক্ষিরাজ। শুনেছি, তা-সত্ত্বেও ছুটির দিনে এখানে বাচ্চাদের লাইন পড়ে। এই চরকিটা ডিজনেল্যাণ্ডে বানানো হয়নি। 1875 সালে কানাডার একটি প্রদর্শনীতে এই চরকিটা চালু ছিল। সেখানে অবশ্য ঘোড়া ছাড়াও ছিল —হাতী, উট, জিরাফ, সিংহ। ডিজ্‌নে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড দরে চরকিটা কিনে নতুন করে সাজালেন। বাদ গেল অন্যান্য জন্তু। রইল শুধু ঘোড়া! মজা হচ্ছে' বাহাত্তরটি ঘোড়াই মৌলিক ভাস্কর্য—কেউ কারও নকল নয়। কিন্তু কেউ সেটা নজর করে দেখে না!

কিং-আর্থার ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন। কিংবদন্তির। তাঁর আমলেই নাকি প্রথম 'রাউণ্ড-টেবল্‌ কনফারেন্স' হয়। বহিরাগত স্যাক্সনদের তাড়িয়ে কিং-আর্থার নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ইংলণ্ডের ছোট-খাটো রাজা-জমিদারদের নিয়ে একটি একচ্ছত্র রাজ্য গড়ে তোলেন। রাজা আর্থার আর তাঁর অসমসাহসিক 'নাইট'-দের[6] নিয়ে অনেক-অনেক গল্প চালু আছে। ইতিহাস কিন্তু বলে, স্যাক্সনদের তাড়িয়ে ইংলণ্ডে ডেন-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা যিনি করেছিলেন তিনি রাজা ক্যানিউট—যে সময় ভারতবর্ষে গজনীর মামুদ মথুরার মন্দির লুণ্ঠন করছে।

এই ঘোড়দৌড়-ঘূর্ণিপাকের আসরে যে চাঁদোয়াটা টাঙানো আছে—লক্ষ্য করলে দেখবে, তাতে আঁকা আছে নানান সীল-মোহর—নাইটদের।

(41) **উড়ন্ত-হাতী ডাম্বো :** দূর থেকে দেখেই জিল চিক্কুড় পাড়ে—ঐ দেখ, গ্র্যাণ্ড-পা! সেই উড়ন্ত হাতী!

কাছে এসে দেখি, তাই তো! এদেরই দেখেছি সকালে। রামধনু-পথে আকাশে ভাসতে ভাসতে। একটা ড্রামের গায়ে আট দশটা ডাণ্ডা—আট-দশ হাত লম্বা। তাদের ও-প্রান্ত



হাতীর পেটে সাঁটা। প্রতিটি হাওদায় চারজনের বসার জায়গা। তাতে চড়ে বসলেই হাতী পাঁই-পাঁই আকাশে ওড়ে। ড্রামের উপর একটা বেলুন। তার চূড়োয়—নৈবেদ্যের উপর সন্দেশটির মতো একটা চুন্নুমুন্নু ইঁদুরছানা। ইঁদুরের হাতে একটা পুঁচকে চাবুক। সার্কাসের রিং-মাস্টারের হাতে যেমন থাকে। আর ঐ পুঁচকে ইঁদুরটার কী দুঃসাহস! চাবুক আস্ফালন করে হুকুম চালাচ্ছে—এ্যা-ই নাদা-পেটা! অব্‌ উড়তে রহো! অব্‌ গিরতে রহো!

আর তার নির্দেশ মেনে হাতীগুলো উঠছে, নামছে!

জিল বলে, হাতীগুলো ইঁদুরটার কথা শুনছে কেন?

আমি বলি, ওরা যে বন্ধু!

—বন্ধু! হাতীর সঙ্গে ইঁদুরের বন্ধুত্ব?

—হ্যাঁ তাই। গল্পটা জান না তোমরা?

—না। বল না দাদু?

গল্পটা আমার মনে ছিল। সংক্ষেপে জানাই ওদের। 'ডাম্বো' (1941) ওয়াল্ট ডিজ্‌নের একটা বিখ্যাত 'অ্যানি-মেটেড ফিল্ম'। মনে আছে, সিনেমার প্রথম দৃশ্যে দেখে-ছিলুম একটা সার্কাসের ময়দানে অনেক অনেক জন্তু জড়ো হয়েছে। আকাশপানে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। কী ব্যাপার? বোঝা গেল, ওরা খবর পেয়েছে সেদিন সন্ধ্যায় একঝাঁক সারসপাখি ওদের সদ্যোজাত সন্তানদের পৌঁছে

দেবে। মা-জিরাফ, সিংহী আর মা-হাতীর বাচ্চা আসার কথা। আগেভাগেই খবরটা জানিয়ে গেছে ম্যাগপাই পাখি।

সার্কাসটা নাকি পরের দিনই অন্য একটা শহরে চলে যাবে। চারিদিকে তাই গোছগাছ হচ্ছে। আর সন্ধ্যেবেলায় সব জীব-জন্তু, পশু-পাখির দল জমায়েত হয়েছে সার্কাস ময়দানে। আকাশপথে যে কোন সময় এসে হাজির হতে পারে সারসের ঝাঁক—বাচ্চাদের নিয়ে।

একটু পরেই দেখা গেল তাদের। এক ঝাঁক সারস পাখি উড়তে উড়তে এদিকপানেই আসছে। প্রত্যেকের ঠোঁট থেকে ঝুলছে একটা করে পুঁটুলি। তাতে নানান জীব-জন্তুর সদ্যোজাত বাচ্চা।

জিরাফের খোকা এল, সিংহীর যমজ শিশু, শিম্পাঞ্জীর খুকু। কিন্তু মা-হাতীর বাচ্চা? সারসেরা হায় হায় করে ওঠে! ওরা বলে, আমাদের সর্দারদাদা নিজেই মা-হাতীর বাচ্চাকে নিয়ে আসছিল সবার পিছন পিছন। পথে আমরা ভীষণ ঝড়ের মুখে পড়ি। বোধহয় সেই ঝড়ের ঝাপ্‌টা সর্দারদাদা সইতে পারেনি। বাচ্চা সমেত সমুদ্রে পড়েছে!

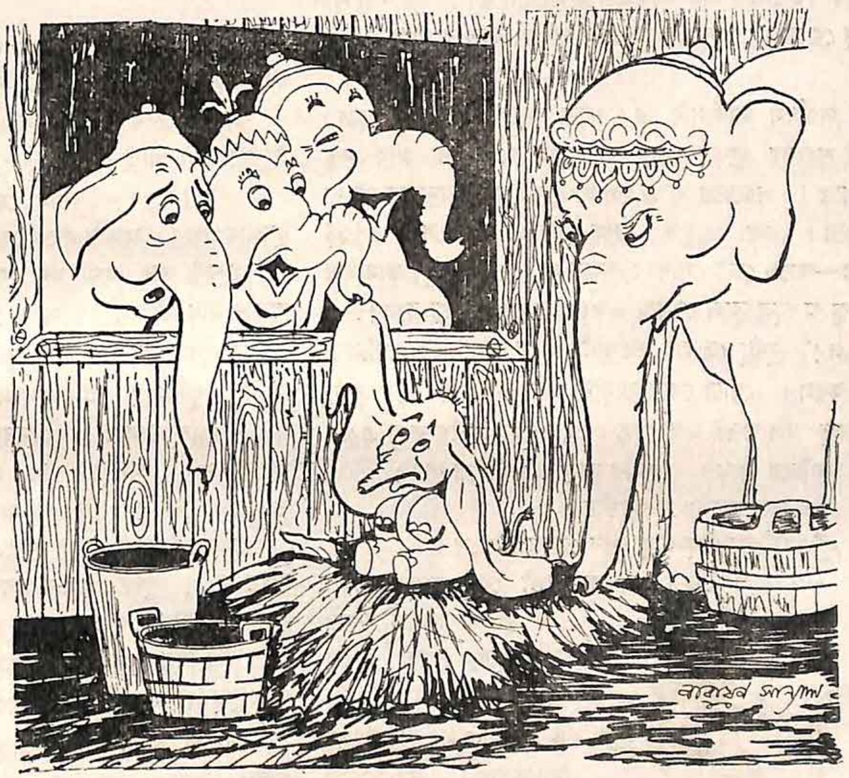
অনেকের বাচ্চা এসেছে। তারা সন্তান নিয়ে ব্যস্ত। শুধু সারসের দল মনমরা। তাদের সর্দারদাদা...আর লুকিয়ে চোখের জল মুছছে মা-হাতী। বাচ্চাটাকে চোখের দেখাও দেখা হল না। পরদিন ভোররাতে সবাই যখন প্রস্তুত হচ্ছে তখনি এসে পোঁছালো সেই সর্দার-সারস। ঝড়ের মুখে সে মরেনি। দেরী হয়েছে শুধু। হবেই তো। হোক বাচ্চা, তবু হাতী বলে কথা! সর্দারদাদা একেবারে হাপ্‌সে পড়েছে। সর্দারকে ফিরে পেয়ে সারসের দল ভারি খুশি। মা-হাতী ছাড়াও সার্কাসে ছিল আরও তিনটে হাতী। তারা তাড়াতাড়ি সর্দার-সারসের ঠোঁট থেকে খুলে পুঁটুলিটা নিয়ে থপ্ থপ্ করতে করতে মা-হাতীর ঘরে এসে হাজির। বলে, ও মা-হাতী, দেখ দেখ, কে এসেছে। তোমার খোকন সোনা! মা-হাতী আনন্দে একেবারে আটখানা।

কিন্তু পুঁটুলি খুলতেই—এ ম্যা! এটা কী গো? বার হয়ে এল একটা অদ্ভুত-দর্শন জীব! বাচ্চা হাতীর মতোই দেখতে, কিন্তু কান দুটো ই—য়া পেল্লায় বড়!

—এ ছিঃছিঃ! কী কুচ্ছিৎ!

—সাতজন্মে এমন হাতীর বাচ্চা দেখিনি বাপু!

হেসে সবাই এ-ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ে। মা-হাতীর



সাতজন্মে এমন কুচ্ছিৎ হাতীর বাচ্চা দেখিনি বাপু

চোখ দিয়ে টপ্-টপ্ করে জল ঝরে পড়ে। বিকলাঙ্গ নয়, কিন্তু বাচ্চা হাতীটার কান অস্বাভাবিক বড়। প্রমাণ হাতীর চেয়েও বড়। মাটিতে লট্‌পট্ করছে! তারই নাম ডাম্‌বো।

সবাই হাসতে হাসতে চলে যাবার পর মা-হাতী ওকে কাছে টেনে নেয়। বলে, আয় খোকন, কাছে আয়, আমি

তোর মা। খাবি কিছু? খিদে পেয়েছে?

ডাম্‌বো অবাক হয়ে যায়। বলে, তুমি আমাকে ডাকছ? দুধ খেতে? কিন্তু আমি যে কুচ্ছিৎ! আমার কান যে—

—তাতে কী? সেটা ভগবানের মার। তোর কী দোষ?

বেচারি ডাম্‌বো। মায়ের কথা শুনে হুহু করে কেঁদে ফেলে সে। সকলের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুনে সে বেচারি ভেবেছিল তার মাও তাকে হতচ্ছেদ্দা করবে।

মা আর ছাঁ-র মধ্যে গড়ে ওঠে ভালবাসা। শিশু হলে কি হবে, সার্কাস শুদ্ধ সব জীবজন্তু ডাম্‌বোকে দিনরাত ক্ষেপায়। তার লেজ ধরে টানে, কান ধরে হ্যাঁচকা মারে। অথবা দূর থেকে নাক সিঁটকায়। ছ্যা ছ্যা ছ্যা! কী কদাকার জন্তু রে বাবা! সাতজন্মে এমন কুচ্ছিৎ হাতীর বাচ্চা ··

পরদিন সার্কাসটা এক নতুন শহরে এসে তাঁবু গাড়ল। সেই শহরের বুড়ো-বাচ্চার দল এল সার্কাসের জীব-জন্তু দেখতে। সবচেয়ে ভীড় হল মা-হাতী আর ডাম্‌বোর খাঁচার সামনে। বাঘ, ভালুক, সিংহ, জিরাফ হিংসেয় ছট্‌ফট্‌ করে—কারণ কেউ সেদিকে যাচ্ছে না। সবাই শুধু ডাম্‌বোর দিকে আঙুল তুলে দেখায়—'দ্যাখ, দ্যাখ কত্তবড় কান! এ ম্যা গ!' দুষ্টু ছেলের দল লাঠি দিয়ে ডাম্‌বোকে খোঁচাতে শুরু করল। খোঁচা খেয়ে ডাম্‌বো যত কুঁই-কাঁই করে দুষ্টু ছেলের দল ততই মজা পায়। হো-হো হি-হি করে এ-ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ে। বেচারি ডাম্‌বো সিঁটিয়ে যায়!

আর সহ্য হল না মা-হাতীর।

শুঁড় উঁচিয়ে গাঁক্‌-গাঁক্‌ করে তেড়ে এল সে।

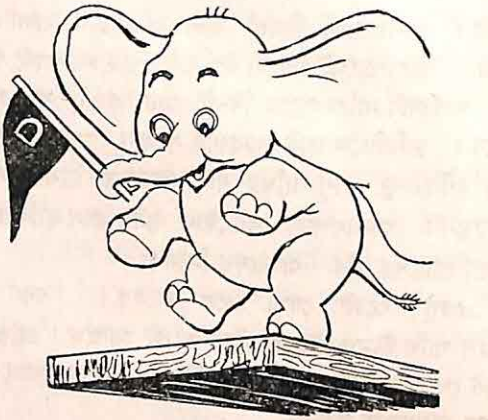
—ও বাবা গো! পাগলা-হাতী মেরে ফেললে গো!



ছুটে পালাতে গিয়ে বাচ্চাগুলো পড়ল এ-ওর ঘাড়ে।

ছুটে এল সার্কাসের ম্যানেজার। রিং-মাস্টার বললে, মা-হাতী ক্ষেপে গেছে। ওকে চেন দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে।

যে কথা সেই কাজ। মা-হাতীকে মোটা শেকল দিয়ে বেঁধে ওরা বন্দী করে রাখল অন্য একটা খাঁচায়। ডাম্‌বো বেচারি দিন ভর শুধু কাঁদে আর কাঁদে।



তারপর মাঝ-রাতে ডাম্‌বোর ঘুম ভেঙে গেল কার ঠেলা-ঠেলিতে—এ্যাই! তুই কে রে? এখানে কবে এলি?

ডাম্‌বো চোখ চেয়ে দেখে একটা পুঁচকে নেংটি ইঁদুর। ইঁদুরটা বলে, এ্যাই! তুই কাঁদছিস কেন রে?

—কাঁদব না? আমি যে কুচ্ছিৎ! আমার কান যে কুলোর মত। আমার মাকে যে ওরা…

ইঁদুরটা সব কথা মন দিয়ে শুনল। তারপর বললে, আমার নাম টিমোথী। আমি তোর বন্ধু! বুঝলি?

ডাম্‌বো চোখ মুছে বলে, তুমি আমার বন্ধু হবে? কিন্তু আমি যে কুচ্ছিৎ! আমার কান যে…

—দ্যাখ্‌ ডাম্‌বো! দিনরাত 'কান কান' করে ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ করবি না! কানদুটো কি তুই বানিয়েছিস্‌? ও তো ভগবানের দোষ! তুই কেন মন খারাপ করছিস?

ডাম্‌বোর মনে পড়ে গেল, ওর মা ঠিক এই ধরনের কথা বলত বটে! দুজনে গলায়-গলায় বন্ধুত্ব হয়ে গেল। না, ভুল বললাম। বাচ্চা হলেও ডাম্‌বো আকারে ঐ টিমোথীর চেয়ে দশ-বিশ গুণ বড়। গলায়-গলায় বন্ধুত্ব হবে কি করে? তবে দুজনের মধ্যে নিবিড় ভালবাসা হল।

ডাম্‌বো বলে, বন্ধু টিমোথী, তুমি যখন-তখন আমার খাঁচায় এস না। ম্যানেজার দেখতে পেলে…

টিমোথী তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, ফুঃ! আমি কি সার্কাসে চাকরি করি নাকি? আমি হচ্ছি মুক্ত প্রাণী! সার্কাসের ঐ চালের-বস্তায় আমার বাসা। এটা-ওটা খাই, ডুগডুগি বাজাই, মনের আনন্দে তিড়িং তিড়িং লাফাই! আমাকে ধরবে বলে তোদের ম্যানেজার একটা ম্যাও পুষেছে। কিন্তু টিমোথীকে জ্যান্ত ধরবে যে বেড়াল, সে এখনো মায়ের পেটে।

ডাম্‌বো ভারী খুশি হল বন্ধুকে পেয়ে। টিমোথী খুব চালাক-চতুর। তুর্‌তুর করে আসে, আর খুর্‌খুর করে পালায়।

কিছুদিন পরে ম্যানেজার একদিন রিং-মাস্টারকে বললে, এই কুচ্ছিং হাতীর বাচ্ছাটাকে শুধু শুধু বসিয়ে খাওয়াব কেন? ওকে কোন খেলা শিখিয়ে দাও।

রিং-মাস্টার বলে, ঐ লম্ববর্ণ একটা বুদ্ধুর বেহদ্দ! খেলা শেখা ওর কম্মো নয়!

—তাহলে নাকে-মুখে রঙ মাখিয়ে ওকে জোকার করে দাও। ক্লাউন সাজাও। দিব্যি মানাবে লম্বা কানে!

রিং-মাস্টার তাই দিলে। একেই বেচারি কুচ্ছিং, তার-উপর একগাদা রঙ মেখে আরও বিশ্রি দেখাচ্ছে ওকে। রিং-মাস্টার যখন ওকে সার্কাসে ঘুরিয়ে আনল তখন সবাই হো-হো হি-হি করে হেসে লুটিয়ে পড়ে—এ-ওর গায়ে।

রাত্রে টিমোথী এসে বন্ধুকে চিনতে পারল না। বললে, এ কীরে! মুখে ও-সব কী মেখেছিস্?

ডাম্‌বো আর কী বলবে! কান্নার বেগে সে কোন কথাই তখন বলতে পারছে না।

যাহোক, একটু সামলে ডাম্‌বো সব কথা বন্ধুকে খুলে বলল। সব শুনে টিমোথী বললে, এ অপমান সহ্য হয় না। আমরা এর প্রতিশোধ নেব।

—কিন্তু কেমন করে?

একটু ভেবে নিয়ে টিমোথী বলে, শোন ডাম্‌বো, আমার মনে হয়—ঐ যে ভগবান তোকে অতবড় একজোড়া কান দিয়েছেন, তার একটা অর্থ আছে। ভগবান তো বোকা নন, যে ভুল করে এটা করবেন।

—কী অর্থ থাকতে পারে?

—আমার মনে হয়, ওদুটো ভগবান তোকে দিয়েছেন ওড়বার জন্য। তুই চেষ্টা করলে নিশ্চয় উড়তে পারবি। দ্যাখ্ চেষ্টা করে। দ্যাখ না একবার!

এত দুঃখেও ডাম্‌বো হেসে ফেলে। বলে, ধু—স্! কী পাগল রে তুই টিমোথী! হাতী কখনো ওড়ে?

—সব হাতী ওড়ে না। কারণ তাদের ভগবান অত বড় কান দেননি। তোকে দিয়েছেন। তুই চেষ্টা কর! দেখিস্, একদিন না একদিন তুই ঠিক উড়তে পারবি। আমি রিং-মাস্টারের মতো চাবুক আপ্‌সিয়ে বলব: উড়তে রহো! আর তুই কান নেড়ে আকাশপানে উঠে যাবার চেষ্টা করবি।

ডাম্‌বো কী আর করে? তার একটুও বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বন্ধুর উৎসাহে তাকে চেষ্টা করে দেখতে হয়। চোখ-মুখ ধুয়ে সে স্প্রিং-বোর্ডের উপর উঠে দাঁড়ায়। টিমোথী নিচে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিতে থাকে। আর স্প্রিং-বোর্ডের উপর দাঁড়িয়ে ডাম্‌বো লাফাতে থাকে। মাঝে-মাঝে কান নাড়তে নাড়তে সে ঝাঁপ খায়। আর ধপাস্ করে মাটিতে উল্টে পড়ে।

একটু পরেই ছুটে এল রিং-মাস্টার। বলে, এ্যাই ব্যাটা লম্বকর্ণ! শব্দ করছিস্ কেন? শব্দ হলে চেন দিয়ে বেঁধে রাখব। তোর মায়ের মতো।

রিং-মাস্টারকে দেখতে পেয়েই টিমোথী তুরতুর করে তার ইঁদুরের গর্তে সেঁদিয়ে গেছে।

পরদিন টিমোথী ওকে নিয়ে গেল ফাঁকা ময়দানে। আজ আর ডাম্‌বো মুখের কালি-ঝুলি ধুয়ে আসার সময় পায়নি। টিমোথীর উৎসাহে ডাম্‌বোরও এতক্ষণে ধারণা হয়েছে—চেষ্টা করলে সে উড়তে পারবে। এক মুখ রং-চঙ মাখা অবস্থায় ডাম্‌বোর সেই উড়বার চেষ্টা দেখলে তোমরা হেসে ফেলতে কিনা জানি না। টিমোথী কিন্তু হাসেনি। সে বললে, একান্ত সাধনা এইভাবেই করতে হয়। সবার চোখের আড়ালে। লজ্জা-ঘৃণা-ভয় - তিন থাকতে নয়!



"এ কীরে, মুখে কী মেখেছিস?"

ডাম্‌বো ধুপ্‌ধাপ্‌ লাফাচ্ছে, ক্রমাগত কান নাড়ছে। ধুলোর ঝড়ে সারামাঠ ভরে গেল ; কিন্তু অন্ধকার রাত্রে কেউ বাধা দিতে এল না। সারা রাত ব্যর্থ চেষ্টা করে প্রায় শেষরাত্রে



ধুলোর ঝড়ে ঘাঠ ভরে গেল

ওরা দুই বন্ধু ফিরে এল সার্কাসের তাঁবুতে। টিমোথী আজ আর তার গর্তে গেল না। বন্ধুর টুপির খাঁজে ঠ্যাঙ দুটো ছড়িয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন টিমোথির ঘুম ভাঙল কাকের ডাকে। কিন্তু চোখ মেলেই টিমোথী অবাক হয়ে যায়। তার সামনে বসে আছে তিন-তিনটে কাক! এমনটা তো হবার কথা নয়। সার্কাসের তাঁবুর ভিতর এত কাছে কাক এল কেমন করে? সর্দার-কাকটা ছিল সবার সামনে। সে একটা ধমক লাগায় টিমোথীকে, অ্যাই ব্যাটা ইঁদুরের বাচ্চা! তুই আমাদের গাছের ডালে এসেছিস্‌ কেন রে?

কাকটা পাগল নাকি?—টিমোথী ভাবে। গাছের ডাল হতে যাবে কোন দুঃখে? কিন্তু কাকের ধমক হজম করবার মতো জীব টিমোথী নয়। সে উল্টে ধমক লাগায়, তোদের গাছের ডাল মানে? এটা তো সার্কাসের তাঁবু?

কাকেশ্বর চিক্কুড় পাড়ে, ইয়ার্কি মারার জায়গা পাস্‌নি? চোখ খুলে দ্যাখ! এটা কি তোদের সার্কাসের তাঁবু?

টিমোথী এবার ভাল করে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। সর্বনাশ! এ কোথায় এসেছে ওরা?

ডাম্‌বো বসে আছে বিরাট একটা যজ্ঞ-ডুমুর গাছের মগ্‌ডালে, দু-দিকে দুই পা ঝুলিয়ে। আর সে নিজে বসে আছে ডাম্‌বোর টুপির খাঁজে। এটা কেমন করে ঘটল?

তবে টিমোথী হচ্ছে ভারী শেয়ানা ইঁদুর। মুহূর্ত মধ্যে সে বুঝে নিল—কী ঘটেছে! ডাম্‌বো নিশ্চয় একজন—'সোমনামফ্লায়ার!' মানে ডাম্‌বো ঘুমের মধ্যে উড়তে পারে। কেমন করে? শোন বুঝিয়ে বলি: কোন কোন মানুষ ঘুমের মধ্যে হেঁটে চলে বেড়ায়, শুনেছ তো? তাদের বলে – 'সোমনামবলিস্ট'। ঘুম ভেঙে গেলে সে টের পায় – ঘুমের মধ্যেই বিছানা ছেড়ে সে অনেকটা হেঁটে এসেছে! ডাম্‌বোও তেমনি 'সোমনামফ্লায়ার'! অর্থাৎ সে ঘুমের মধ্যে উড়তে পারে। শেষ রাত্রে ডাম্‌বো নিশ্চয় উড়বার স্বপ্ন দেখছিল—আর নিজের অজান্তে কান নাড়তে নাড়তে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এই যজ্ঞ-ডুমুর গাছের মগডালে। টিমোথী নিজে ঘুমাচ্ছিল ডাম্‌বোর টুপির খাঁজে। তাই সে কিছুই টের পায়নি। টুপির উপর বসেই এখানে এসেছে!

কিন্তু!

ঘুমের মধ্যে যেসব মানুষ হেঁটে-চলে বেড়ায়, যাদের বলে 'সোমনামবলিস্ট' বা 'নিদ্রাবিহারী', তারা হাঁটতে জানে। ঘুমের মধ্যে কোন মানুষ কখনো উড়তে পারে না—মানে স্বপ্নের ওড়া নয়, বাস্তবে ওড়া। টিমোথী এ থেকে সিদ্ধান্তে এল—ডাম্‌বো উড়তে জানে—কিন্তু সে জানে না যে, সে উড়তে জানে।

টিমোথী তার বন্ধুকে ঘুম থেকে টেনে তুলল। সব কথা খুলে বলে। ডাম্‌বোর বিশ্বাসই হয় না। বলে, ধু—স্‌! তাই কখনো হয়? জেগে জেগেও আমি উড়তে পারিনা, ঘুমের মধ্যে উড়ব কিরে? হাতী কখনো আকাশে ওড়ে!

—ওড়ে কিনা বল্‌ছি, কিন্তু আগে তুই আমাকে বল তো, হাতী কখনো যজ্ঞডুমুর গাছের মগডালে চড়ে?

—ধু—স্‌! তাই কি পারে?

—তাহলে তুই কেমন করে মগডালে চড়্‌লি?

—আমি! মানে? কই? কবে? কখন?

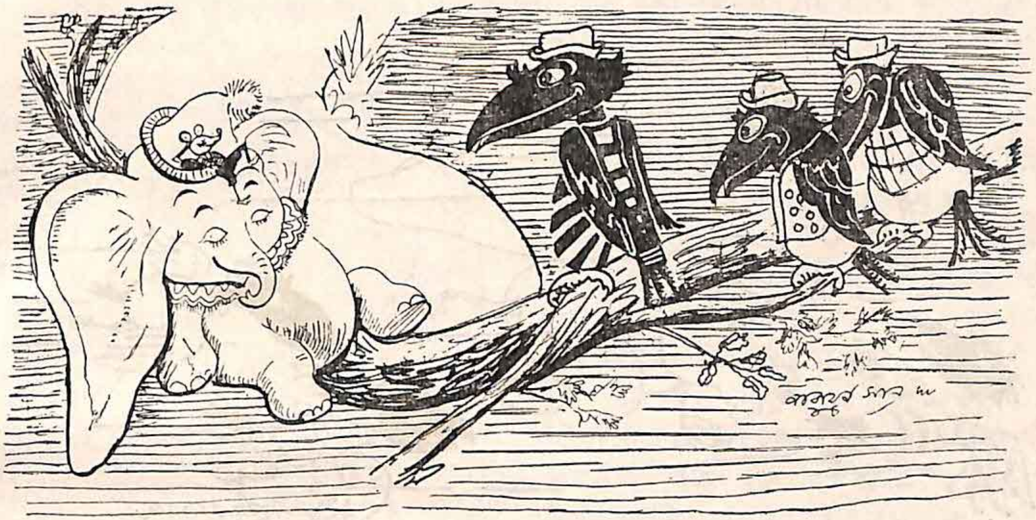
—নিচে তাকিয়ে দ্যাখ্‌।

নিচের দিকে তাকিয়েই মাথা ঘুরে উঠ্‌ল ডাম্‌বোর। কী সর্বনাশ! সে বসে আছে গাছের মগডালে। যেই সে কথাটা বুঝেছে অমনি তার হাত-পা থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। আর তার পরেই, ওরে বাপরে!—ধপাৎ!

কাকের দল হেসে ওঠে: কা—কা—কা!

ভারী রাগ হল টিমোথীর। সে কাকদের ডেকে বলল, লজ্জা করে না তোদের? আমার বন্ধু ডাম্‌বো একটা নতুন বিদ্যা আয়ত্ত করতে চাইছে, কোথায় তোরা ওকে সাহায্য করবি, তা নয় খালি—ক্যা-ক্যা-ক্যা! ডাম্‌বো চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই উড়তে পারবে। তোদের উচিত ওকে সাহায্য করা। ঠিক কিনা তোরাই বল্‌!

সব কথা শুনে কাকদের দয়া হল। সর্দার-কাক বললে, তুই ঠিক কথাই বলেছিস্‌ টিমোথী! আমরা তো এত কথা



'গাছের মগডালে উঠেছিস কেন রে?'

জানতুম না। আমরা ওকে সাহায্য করব। আমার কাছে একটা 'তুক্‌' আছে। তোকে বাৎলে দিচ্ছি। শোন্‌! এদিকে সরে আয়। গোপন কথা, কানে-কানে বলব!

কাক্কেশ্বর বলে, তা তুমি রাগ কর আর যাই কর, হাসির কথায় হাসব না? হাতীর বাচ্চা কখনো উড়তে পারে? কখনো দেখেছিস্‌ কোন হাতী এই আমাদের মতো আকাশে উড়ছে?

—তুই কখনো দেখেছিস্‌—এত্তটুকু হাতীর এত্ত বড় কান?

—তা বটে!

টিমোথী বলে, তাহলে শোন আমাদের দুঃখের কথা।

সব কথা সে খুলে বলল কাকদের।

কীভাবে সবাই ডাম্‌বোকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। কী ভাবে মা-হাতীকে শেকল পরিয়ে খাঁচায় বন্দী করে রেখেছে ম্যানেজার, ডাম্‌বোর মুখে কালিঝুলি মাখিয়েছে, কীভাবে আজ কদিন ডাম্‌বো চেষ্টা করছে, ওর ওই ঘৃণিত জীবন থেকে মুক্তি পেতে। সব কথা শেষ করে টিমোথী বলে, ভগবান যে ওকে এতবড় একজোড়া কান দিয়েছেন তা কি শুধুমুধু? তাছাড়া কাল রাত্রে ভগবানই তো ওকে 'সোমনামবুলিস্ট' করে এই গাছের ডালে উড়িয়ে নিয়ে এসেছেন। ডাম্‌বো তো স্বেচ্ছায় আসেনি। তার মানে ভগবান ইঙ্গিতে বলছেন,

আড়ালে ডেকে এনে কাক্কেশ্বর টিমোথীকে বললে, আমার কাছে একটা 'ম্যাজিক-পালক' আছে; সেটা দিয়ে আমরা আমাদের বাচ্চাদের উড়তে শেখাই। প্রথমবার উড়তে ওরা যখন ভয় পায় তখন বলি, 'এই পালকটা ঠোঁটে কামড়ে ধরে ঝাঁপ খা, কিছুতেই মাটিতে পড়বি না। বাতাসে ভাসবি।' ওরা তাই করে, আর বাতাসে ভাসে। উড়ে চলে।

টিমোথী বললে, এটা কী এমন গোপন কথা যে, আমাকে আড়ালে ডেকে কানে-কানে বল্‌ছিস্‌?

—গোপন কথাটা এই যে, ম্যাজিক-ফ্যাজিক কিছু নেই। বাচ্চাদের ভয় ভাঙাবার জন্যই আমরা ঐ মিথ্যে-কথাটা বলি। তুই এই পালকটা ঐ ডাম্‌বোকে দে। ওকে বল, 'এইটা শুঁড়ে নিয়ে লাফ্‌ খেলে ও মাটিতে পড়বে না। বাতাসে ভাসতে ভাসতে উড়ে চলবে।' ও তাহলে মনে জোর পাবে। চেষ্টা করেই দেখ না। তাহলেই ডাম্‌বো আকাশে উড়বে।

টিমোথী তাই করলে। ডাম্‌বো তো জানে না যে, পালকটা মন্তর-পড়া নয়। তার বিশ্বাস হল, ঐ পালকটা শুঁড়ে নিয়ে লাফ খেলে, আর খুব জোরে জোরে কান-ডানা নাড়তে থাকলে সে মাটিতে পড়বে না—কাকদের মতো বাতাসে ভাসবে।

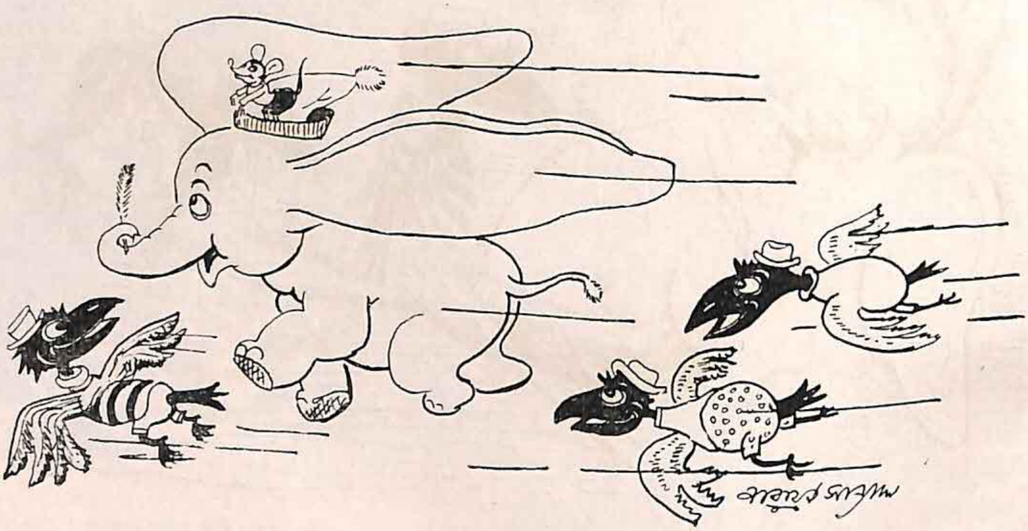
তাই করল ডাম্‌বো।

—আমার বন্ধু টিমোথী।— ডাম্‌বো বললে।

ম্যানেজার বলে, সাবাস! আজ থেকে আর তোমাকে ক্লাউন সাজতে হবে না। তুমি শুধু ঐ খেলাটা দেখাবে!

ডাম্‌বো বলে, আমি রাজী। কিন্তু দুটি শর্ত আছে।

— বল, কী শর্ত। আমি সবই মেনে নেব।



'এই তো উড়েছে!'

কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! ডাম্‌বো মাটিতে পড়ল না। দুই কান নাড়তে নাড়তে ভেসে চলল। কাক তিনটেও তার সঙ্গে উড়তে থাকে আর চিল্লাতে থাকে: কা কা—কা! এই তো উড়েছে! এই তো উড়েছে!!

পরদিন সার্কাসে যখন খেলা চলছে তখন ডাম্‌বো হুড়মুড় করে সার্কাস এরিনাতে ঢুকে পড়ল। রিং-মাস্টার তো ক্ষেপে ব্যোম্‌। চাবুকটা দিয়ে যেই ডাম্‌বোকে মারতে গেছে অমনি সে কান-দুটো নেড়ে উঠে গেল আকাশে। সবাই তাজ্জব!

রিং-মাস্টার আকাশপানে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। দর্শকেরাও সবাই ঊর্ধ্বমুখ। তারা অবাক হয়ে দেখছে সার্কাসের নতুন খেলা: 'উড়ন্ত-হাতী!' আর সেই উড়ন্ত-হাতীর টুপির খাঁজে একটি চুন্‌নুমুন্‌নু ইঁদুরছানা!

এরপর কী হল তা তো তোমরা বুঝতেই পারছ। কাগজে কাগজে ছাপা হল ডাম্‌বোর অদ্ভুত খেলার কথা। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষজন ভীড় করে এল 'উড়ন্ত-হাতী'র খেলা দেখতে।

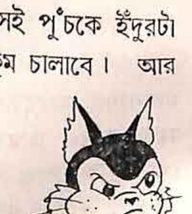
ম্যানেজার বলে, এ খেলা তুমি কেমন করে শিখলে হে ডাম্‌বো? কে শেখালো তোমাকে?

—এক নম্বর: আমার মাকে মুক্তি দিতে হবে। সে আর খেলা দেখাবে না। তাকে পেনশন দিতে হবে। তার বাচ্চাই তো এখন রোজগেরে।

— আমি রাজী। বাকী শর্তটা কী?

—দু-নম্বর শর্ত: তোমার পোষা বেড়াল যে খেলাটা দেখায় তার রিং-মাস্টার হবে আমার বন্ধু টিমোথী!

শুনে বেড়ালটার কী অবস্থা হল তোমরা নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছ! এতদিন আপ্রাণ চেষ্টা করেও সে টিমোথীকে কব্‌জা করতে পারেনি। আর এখন সেই পুঁচকে ইঁদুরটা চাবুক আপ্‌সিয়ে সার্কাস-এরিনায় হুকুম চালাবে। আর ইঁদুরের হুকুম-মোতাবেক বেড়ালকে দুপায়ে হাঁটতে হবে, আগুনের উপর দিয়ে লাফ দিতে হবে!



বেড়ালটা মুখ ব্যাজার করে। কিন্তু ম্যানেজার সে-কথা শুনল না। বললে, ঠিক আছে, তাই হবে। টিমোথী আজ থেকে দুটি খেলার রিং-মাস্টার: 'ম্যাও-দমন' আর 'উড়ন্ত-হাতী'!

ম্যানেজারের হুকুমে তখনই বন্দিশালা থেকে মা-হাতীকে নিয়ে আসা হল সার্কাস-এরিনায়। ছেলের কৃতিত্বের কথা শুনে মা-হাতী তো আহ্লাদে আটখানা। মা-ছেলের মিলন দৃশ্যে আনন্দে সকলের চোখ সজল হয়ে ওঠে। একমাত্র ব্যতিক্রম ঐ ম্যাও-সাহেব! তার চোখও সজল। তবে অন্য কারণে। কারণটা তোমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে কি?



মা আর খোকনসোনা

গল্পটা শেষ হলে নীস বলে, আঙ্কল, এ গল্পটার সঙ্গে হান্স্-অ্যাণ্ডারসনের রবিখ্যাত গল্প—'আগ্লি ডাকলিং' এর কিছুটা মিল আছে, নয়?

আমি বলি, তা আছে। তবে আমি নিজেও বাংলায় গপ্পো-টপ্পো লিখি। আমার মনে হয়, এ গল্পটা বেশি ভালো।

জ্যাক বলে, কেন? এ গল্পটা বেশি ভাল কেন?

ওর মা বলে, আমি তোমার সঙ্গে একমত, আঙ্কল! ভেবে দেখ, 'আগলি ডাকলিং' আসলে ছিল একটা রাজহাঁসের বাচ্চা। ছেলেবেলায় তাকে কেউ চিনতে পারেনি। এই বিষয়বস্তু নিয়েই আগলি-ডাকলিং-এর মিষ্টি গল্পটা। কিন্তু এখানে ডাম্‌বো ছিল একটা বিকলাঙ্গ। নিজের চেষ্টায় সে তার জীবনকে সার্থক করে তুলল। তাছাড়া টিমোথীর বন্ধুকৃত্যতেও আমরা অভিভূত হই। সে বরাবর আশা আর উৎসাহ জুগিয়ে এসেছে, কাকদের মনের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তাই এটা বেশি ভাল, তাই না আঙ্কল?

আমি বলি, ঠিক তাই!

জ্যাক-জিল এক-একটা আইসক্রীমের কাপ নিয়ে ডাম্‌বোর পিঠে চাপল। আমি আর নীস্ কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কফি পান করতে থাকি। নীস্ বলে, জান আঙ্কল, তোমার গল্পটা শুনে আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার সহপাঠিনী মারিয়ার কথা। শৈশবে 'পোলিও' হয়ে তার দুটি পা-ই নষ্ট হয়ে যায়। সে হুইল্‌ড্ চেয়ারে করে ক্লাস করতে আসত। আমাদের যখন পি. টি. ক্লাস হত অথবা নাচ শেখার ক্লাস, তখন মারিয়া গিয়ে বসে থাকত মিউজিক রুমে। একা-একা গলা সাধত। আমরা বেচারি মারিয়াকে করুণা করতাম। কেউ কেউ আড়ালে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও যে না করত তা নয়। সেই মারিয়া আজ হলিউডের একজন অতি বিখ্যাত প্লে-ব্যাক সিঙ্গার! আমাদের ক্লাসের সব কয়টি ছেলেমেয়ের চেয়ে আজ তার রোজগার বেশি, সবচেয়ে বিখ্যাত হয়েছে। সবচেয়ে সার্থক তার জীবন।

আমি বলি, নীস, তোমার এই গল্পটা জ্যাক-জিলকে শুনিয়ে দিও। আজ রাত্রে হোটেলে ফিরে গিয়ে।

বার-কতক পাক খেয়ে জ্যাক-জিল ফিরে এল। জিল তার মায়ের হাত ধরে টানতে থাকে। বলে, চল না মম্, তোমরাও ডাম্‌বোর পিঠে চাপবে! ভারি মজা হবে!

আমাদের দু-জনেরই কেমন-যেন লজ্জা-লজ্জা করছে। ধেড়ে বয়সে হাতীর পিঠে চেপে আকাশে উড়ব, এ কেমন কথা! আমরা এতক্ষণ কফিপান করেছি, স্যাম্পেন নয়!

জ্যাকও মায়ের হাত ধরে টানে।

নীস্ বলে, না! আমরা ডাম্‌বোর পিঠে চাপলে কি তার আর দুটো ডানা গজাবে?

জ্যাক লাজুক-লাজুক মুখে বলে, মম্, একটা কথা বলব?

— কী কথা?

— ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে ঢোকা-ইস্তক তুমি তোমার ঐ বাঁধা বুলিটা এগারোবার বলেছ। ছয়বার আমাকে, চারবার জিলকে আর একবার গ্র্যাণ্ড-পা-কে। প্রতিবারই আমরা অবাক হয়েছি। এই দ্বাদশ-বারের বার ডাম্‌বো কিন্তু অবাক হচ্ছে না তোমার কথাটা শুনে!

—আমার কোন্ কথাটা?

—ডাম্‌বোর আর এক-জোড়া ডানা-গজানোর কথাটা !

পথে শোভাযাত্রা : উড়ন্ত হাতীর এলাকাটা পার হয়ে পথে নেমেছি, হঠাৎ একটা হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড ! টগ্‌বগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে কে যেন এদিকপানেই আসছে। ঘোড়াটা ছোট্ট ; মানুষটাও। এখানে যেন সব কিছুই 5/8 স্কেলে বানানো। সওয়ারের সারা দেহ বর্ম-সাঁটা—যেন কিং আর্থারের নাইট ! উচ্চতায় সে সাত-বামনের এক বামন। বাচ্চা ছেলে না কি ? পোশাকটা ঢলঢলে - যেন সাঙ্কো-পাঞ্জার[৪] সাজ। কণ্ঠস্বর পাগ্‌লা মেহেরালির মতো :[৭]

—'তফাৎ যাও ! তথাৎ যাও !'

দেখি, মানুষজন পথের দুপাশে থাপনজুড়ে বসে পড়ছে। রাস্তার মাঝখানটা খালি রেখে। যেন সাবেক নিমন্ত্রণ বাড়ির পংক্তিভোজ। যেন, মাঝখানের ঐ ফাঁকা গলি দিয়ে এখনি এসে পড়বে—গরমাগরম লুচি, বেগুন ভাজা, ছঁ্যাচড়া !

এমনভাবে ফুটপাথে বসে পড়ব কেন রে বাবা ? কে যেন বললে, এটাই নিয়ম। এর মানে এখনি একটা 'প্রসেশন' এসে পড়বে। এমন শোভাযাত্রা সন্ধ্যার ঝোঁকে প্রায়ই বার হয় ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে। তাকে বলে, 'ইলেক্‌ট্রনিক প্যারেড !'

— কীসের প্রসেশন ?

— তা কে জানে ! এখনি দেখতে পাবে।

আমরা ঝুপ-ঝাপ ফুটপাথে বসে পড়ি। পথে ধুলো-বালি একটুও নেই। হঠাৎ দেখি, গোটা ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে বাতির তেজ যেন কমে গেল। একটু আঁধার-আঁধার ভাব। আর ঠিক তখনি স্লিপিং-বিউটি কাস্‌ল্‌-এর দুপাশে একসঙ্গে কয়েক শ' আতস বাজী উঠে গেল আকাশে। আলোয়-আলো হয়ে গেল গোটা ডিজ্‌নেল্যাণ্ড—লাল-নীল-সবুজ-হলুদ ! সহস্র-ধারায় আলোর আকাশগঙ্গা জলপ্রপাতের মতো ঝরে পড়ল। বার বার তিন বার। তার পরেই রাস্তার দু-ধারে ল্যাম্প-পোস্টের বাতি ফিরে পেল তাদের ঔজ্জ্বল্য।

—ঝমর-ঝম্‌, ঝমর-ঝম্‌—ভঁ্যাপো !

একটা ব্যাণ্ড-পার্টি আসছে। দুই-দুই বাজনদারের লম্বা সারি। সবই চেনা-মুখ : মিকি-মিনি, ডোনাল্ড ডাক, বানি-র‍্যাবিট, আর সাত-দুকুনে চৌদ্দ বামন। তার পেছনে অদ্ভুত একটা ছয়-ঘোড়ায়-টানা ফিটন গাড়ি। না ফিটন নয়, ব্রুহাম। অথবা ল্যাণ্ডো, নাকি - হ্যানসম ? ও সব কিছু নয়, একটা প্রকাণ্ড কুমড়ো ! প্রায় দু-মিটার ব্যাসের। তিন-দুকুনে ছয়টা ঘোড়াই জ্যান্ত—পুতুল নয় ; কিন্তু ঐ – 5/8 স্কেলে খাটো ! ধব্‌ধবে সাদা। বুঝতে পারি, মেইনস্ট্রীটে যে পক্ষিরাজের দল ট্রামগাড়ি টানে - এরা তাদেরই ছানা-পোনা। গাড়ির পিছনে এক জোড়া সহিস, উপরে চাবুক হাতে কোচ-ম্যান। কিন্তু গাড়ির ভিতর বসে আছে ওটা কে ?

দুধে আলতা রঙ। ঠোঁট দুটি তুলতুলে, চেরী ফুলের বরণ ; গাল দুটি পাকা আপেল, আর ঢেউ খেলানো চুল—যেন সুবর্ণরেখা নদীতে পড়েছে উদয়-সূর্যের আলো ! বছর পনের বয়স। পরনে রাজ-হাঁসের পালকের মতো সাদা গাউন। কে এই সুন্দরী কুচবরণ রাজকন্যা ?

স্নো হোয়াইট ? অ্যালিস ? স্লিপিং বিউটি ?

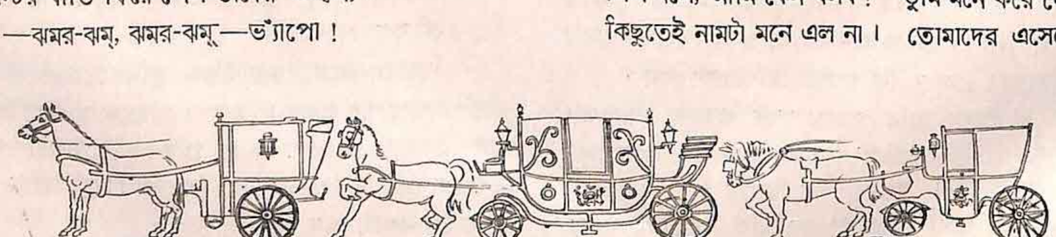
জিল বলে, তুমি কী বোকা গ্র্যাণ্ড-পা ! একে চিনতে পারছ না ? চেয়ে দেখ ওর পায়ের দিকে।

পায়ের দিকে ? কী আছে সেখানে ?

এতক্ষণে নজর হল—তাই তো ! ওর একপায়ে একটা হিল-তোলা জুতো আর পায়ে শুধু মোজা। জুতো নেই ! কেন গো ? ওর একপাটি জুতো কেন হঠাৎ ? মনে পড়ল ! না, না, পড়ল না ! নামটা কিছুতেই মনে আসছে না। নেহাৎ ছেলেবেলায় গল্পটা পড়েছিলুম। রাজকন্যা বল-ড্যান্সের আসরে গেল, আর একপাটি জুতো খুইয়ে ফিরে এল ! তারপর কী হল যেন ? রাজপুত্তর ঐ একপাটি জুতো নিয়ে খুঁজতে বার হল ! যতদূর মনে হচ্ছে শেষ-মেষ সে মেয়েটিকে খুঁজে পেয়েও ছিল। কিন্তু কী নাম সেই রাজকন্যার ?

জিল বলে, আমি কেন বলব ? তুমি মনে করে দেখ।

কিছুতেই নামটা মনে এল না। তোমাদের এসেছে ?

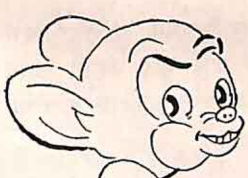


(42) ম্যাটারহর্ন :[10] ফ্র্যাণ্টাসিল্যাণ্ডের পূব দিকে আবার একটা কৃত্রিম পাহাড়। তার নাম ম্যাটারহর্ন।

তাকে ঘিরে তিন তিনটে আকর্ষণ—ম্যাটারহর্ন বব্‌স্লেড্‌স্ (43), মটোর-বোট ক্রুইজ (44) আর ফ্যাণ্টাসি ল্যাণ্ড অটোপিয়া (45)। ফ্যাণ্টাসিল্যাণ্ড অটোপিয়ার কথা আগেই বলেছি। বাকি দুটোর কথা বলি। কিন্তু তার আগে ম্যাটারহর্ন পাহাড়ের কথাটা বলতে হয় : ম্যাটারহর্ন সুইজারল্যাণ্ডের একটি বিচিত্র-দর্শন পর্বতশৃঙ্গ। ডিজ্‌নে 1959 সালে একটা ফিল্‌ম্ করেন ; তার নাম—'থার্ড ম্যান অন দ্য মাউন্টেন।' ঐ পাহাড়টা চড়ার ব্যাপার নিয়েই গল্পটা দানা বেঁধে উঠেছে। পাহাড়টাতে ছবি তুলতে গিয়ে ডিজ্‌নে-সাহেব তাকে ভালবেসে ফেলেন।



দেশে ফিরে তিনি ঐ পাহাড়টার মতো করে বানিয়ে দেন এক কৃত্রিম ম্যাটারহর্ন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিটার উঁচু। এটাও কংক্রিটের। ফ্রণ্টিয়ার ল্যাণ্ডের বিগ্‌থাণ্ডার পাহাড়ের (32) সঙ্গে আকাশ-পথে এর যোগাযোগ আছে গণ্ডোলার মধ্যেমে, রামধনু-পথে।



(43) ম্যাটারহর্ন বব্‌-স্লেড্‌স্ : গাড়িতে চড়ে প্রথমে উঠে যেতে পার পাহাড়ের মাথায়। তার পর ভীম বেগে নেমে এস। মনে হবে—এই বুঝি উল্টে গেল গাড়িটা। কিন্তু যাবে না। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে টানেল। আধো অন্ধকারে টানেল-পথে যখন গাড়ি চড়ে নামবে তখন দেখতে পাবে কৃত্রিম বরফ, তুষার আর 'আইসিক্‌ল্‌স'।[11] সব কিছু আবছা। হঠাৎ তোমার পথ রোধ করে দাঁড়াবে প্রকাণ্ড বড় এক ইয়াতি[12]—তুষার মানব !

(44) মটোর বোট অভিযান : গাড়িতে চড়ে নদীপথে এবার এঁকে-বেঁকে পাহাড় থেকে নামতে হবে। তিনজনের উপযোগী ছোট ছোট মটোর-বোট। এই 'অধঃপতন' বব্‌স্লেড্‌স্-এর মতো ভয়াবহ নয়। তাই যাদের হার্টের অসুখ আছে অথবা সঙ্গে আছে নিতান্ত শিশু, তারা এই পথে পাহাড় থেকে নামে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

(45) আজবদেশে অ্যালিস : অ্যালিসের আজব দেশের এই অভিযানটি এ বছর (1984) একেবারে আনকোরা নতুন করে বানানো হয়েছে। নিঃসন্দেহে গোটা ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ—বিশেষ যাদের বইটা পড়া আছে। গল্পটা জান তো ? আমি বাপু আবার বলতে পারব না। বাংলায় যেমন 'আবোল-তাবোল', 'হ-য-ব-র-ল,' ইংরাজীতে তেমনি লুই ক্যারলের লেখা—Alice Adventure in Wonderland.



জ্যাককে পাশে নিয়ে আমি একটা ছোট্ট টু-সীটার গাড়িতে চেপে বসি। জিল্ বসল তার মায়ের সঙ্গে। শুরু হল আজবদেশের অভিযান।



প্রথমেই ধুপুস্ করে পড়ে গেলাম এক গর্তে। তাই পড়ার কথা—কাহিনী অনুযায়ী। অ্যালিস্‌ও গল্পের প্রথম দিকে পড়ে গিয়েছিল একটা খরগোশের গর্তে। গোটা গল্পটাই তুমি এখানে অভিনীত হতে দেখবে। যারা ছিল কল্পলোকের অদ্ভুত জীবজন্তু—মক্‌-টার্টল, গ্রিফিংস্, শুঁয়ো-পোকা, ব্যাঙ-পিয়ন, চেশায়ার বেড়াল, হরতনের রাজা-রাণী, তাসের দেশের টেক্কা-দুরি-নহলা-দহলা, সবাই আসবে ভীড় করে। গাড়িতে চড়ে তুমি এগিয়ে যাচ্ছ

আর ওরা একে- একে এসে অভিনয় করে নেপথ্যে সরে যাচ্ছে। মিলিয়ে যাচ্ছে।

এক জায়গায় দেখি, পথ হারিয়ে অ্যালিস ইতি-উতি চাইছে; তার হঠাৎ নজরে পড়ল একটা সাইন-বোর্ডের উপর বসে আছে 'চেশায়ার-ক্যাট'। চেশায়ার দেশের বেড়ালের নাকি সর্বদাই হাসি-হাসি মুখ। অ্যালিস জানতে চাইল, কোন পথে যাবে। আর চেশায়ার বেড়াল এক গাল হেসে পথ নির্দেশ দিল—ডাইনে যাও, মানে বাঁয়ে, অর্থাৎ কিনা ডাইনে। কিংবা বাঁয়ে, অর্থাৎ...



আমড়াতলার পথ-নির্দেশ

অ্যালিস অবাক হয়ে বলে, তার মানে কি হল?

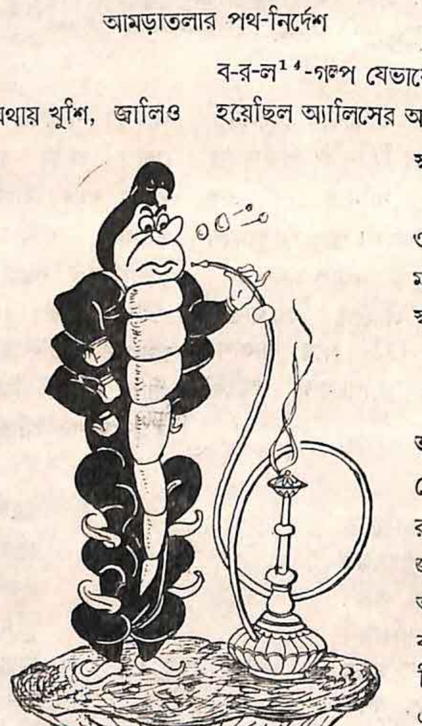
—তার মানে হল, 'এর পরে যাও যেথায় খুশি, জ্বালিও না ক' মোরে।' সোজা হিসেব!

টুইড্‌লডাম আর টুইডল্‌ডী যমজ দুই ভাই, হাত-ধরাধরি করে নাচছে—তা-ধিন্ ধিন্‌তা!

এরপর একটা ব্যাঙের ছাতার উপর বসে আছেন শুঁয়ো-খুড়ো।

বসে আছেন, না দাঁড়িয়ে, তা ঠিক মালুম হল না। অনেক গুলো ঠ্যাঙ কিনা! ডান দিকের তিনটি হাত মাজায়; বাঁ-দিকের উপরের হাতে ফরসির নল। আলবোলায় গুড়ুক-গুড়ুক তামাক খাচ্ছেন শুঁয়োপোকা-খুড়ো। একটু পরেই তিনি প্রজাপতি হয়ে ফড়াৎ করে উড়ে গেলেন।

এটিও 'হলোগ্রাফি'র একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ! বিজ্ঞানের বিস্ময়।


শুঁয়ো-খুড়োর গুড়ুক খাওয়া

'অ্যালিস অ্যাডভেঞ্চার' আমার খুব প্রিয় বই। ছেলে-বেলায় পড়ে পড়ে আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছিল। তাই অনেকদিন পরে পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের ফিরে পেয়ে আমার খুব ভাল লাগছিল। অভিযানের শেষাশেষি একটা ফুলের বাগান। বাগানে জমায়েত হয়েছেন 'ক্রোকে' খেলার না না ন খেলোয়াড়—ডাচেস, হরতনের রাজা ও রাণী। রাজার হাতে শাসনদণ্ড—হরতন-মার্কা। তাঁর গোঁফ-জোড়া দেখার মতো। আর রাণীর তন্বী দেহটিও নজর কাড়ে! কী বিচিত্র পোশাক তাঁর! গাউনটায় পাছে কাদা লাগে তাই এক হাতে উঁচু করে ধরেছেন। কঙ্কাবতী[13] অথবা হ-য-ব-র-ল[14]-গল্প যেভাবে শেষ হয়েছিল ঠিক সেভাবেই শেষ হয়েছিল অ্যালিসের আজবদেশে অভিযানের গল্পও। অর্থাৎ স্বপ্নভঙ্গে।

আমরা সবাই যখন আলোকোজ্জ্বল ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড পার হয়ে এলাম তখন মনে হল—এতক্ষণ আমরাও বুঝি শুধু স্বপ্ন দেখছিলাম।

(46) **পাগলা টুপি-আলার চায়ের আসর**; 'টুপি-আলা' মানে এ নয় যে, লোকটা টুপি বিক্রি করে। ওর ঐ রকম নাম হয়েছে মাথার টুপিটার জন্য। লুই ক্যারলের 'আজবদেশে অ্যালিস' বইতেই আছে এই 'টুলি-আলা' বা ম্যাড-হ্যাটারের কথা। লোকটা ছিটগ্রস্ত। দোকান থেকে সে যখন একটি টুপি খরিদ করে, তখন টুপির গায়ে 'প্রাইস্ ট্যাগ' সাঁটা ছিল, মানে টুপিটার দাম উল্লেখ করে। পাগল মানুষ তো? তাই টুপিটা কেনার পর

দাম-লেখা কাগজটা সে খুলে ফেলেনি। টুপির গায়ে তা সাঁটাই আছে। দশ-শিলিঙ ছয়-পেন্স ট্যাগটা।

এখানে দেখছি, বসেছে একটা চা-পানের আসর। অ্যালিসের গল্পে ঐ পাগলা টুপি-আলা অ্যালিসকে চায়ের আসরে আমন্ত্রণ করেছিল। এখানে চায়ের আসরটা বসেছে একটা প্রকাণ্ড বড় গোল কাঠের প্ল্যাটফর্মে। সেখানে ই—য়া বড় কা-বড়কা কাপ-ডিশ্। তা বিশ-পঁচিশটা হবে। এক-একটা চায়ের কাপে তিন-চার জনের বসার ব্যবস্থা। ওর ভিতর বসে বসে চা-পান করতে পার। কাপের গায়ে হরতন-রুহিতন-ইস্কাপন-চিড়ের ছাপ। দর্শকেরা ইচ্ছে করলে কাপের ভিতর উঠে বসতে পারে। মাঝের একটা কাপের ভিতর টুপি-আলা অ্যালিসকে চায়ে আপ্যায়ন করছে। কাপগুলো ডিশ্ সমেত ধীরে ধীরে পাক খায়।



হরতনী তন্বী রানী



ম্যাড-হ্যাটারের চা-য়ের আসর

এটাকেই সকালবেলা আমরা দেখেছিলুম আকাশ পথে যেতে যেতে। জ্যাক-জিল চা খেল না, তার বদলে পাক খেল। কাপের ভিতর বসে। আমরা খুড়ো-ভাই ঝি উঠিনি।

(47) **পীটার প্যান-এর অভিযান** : 'পীটার প্যান' ওয়াল্ট ডিজ্‌নের আর একটি নাম করা 'অ্যানিমেটেড ফিল্‌ম' (1953) ; অর্থাৎ তুলি দিয়ে আঁকা চলচ্চিত্র।

মূল গল্পের লেখক স্যার জেমস্ বেরি। রূপ-কথার আইনে পীটার প্যান চিরকাল খোকা রয়ে গেল। বড় হল না কখনো।

এই রাইডটাও খুব মজার। সত্যি কারের ফ্যাণ্টাসিল্যাণ্ডের রাইড। তুমি গাড়িতে উঠে বসা মাত্র সেটা উঠে যাবে আকাশ-পানে। মেঘের সঙ্গে তুমি ভাস্‌তে ভাস্‌তে চলেছ। কোথায় ? সে জন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন ?

— যেথায় খুশির দেশে ! তুমি গান ধরতে পার—

"আয় যেখানে খ্যাপার গানে নাইকো মানে, নাইকো সুর
আয়রে যেথায় উধাও হাওয়ায় মন ভেসে যায় কোন সুদূর।"[15]

মনে হচ্ছে নিচে, অ-নে-ক নিচে পড়ে আছে পৃথিবী। এ কিন্তু এয়ারোপ্লেনে চড়ার মতো নয়। এয়ারোপ্লেনে কি অমন জোনাক-পোকার মতো মুঠো মুঠো নক্ষত্র তোমার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে? হঠাৎ হয়তো দেখতে পাবে – আকাশ-গঙ্গা থেকে ঝর-ঝর করে জলপ্রপাত ঝরে পড়ছে। জলের নয়, আলোর! গাড়িটা সেই জলপ্রপাতের দিকে এগিয়ে চলেছে বাতাসে ভাসতে ভাসতে। তুমি ঘাবড়ে গেছ! এবার জামাকাপড় বুঝি ভিজে একসা হবে! তা কিন্তু হবে না। জলপ্রপাত ভেদ করে এসে দেখবে এক ফোঁটা জলও লাগেনি তোমার গায়ে। পরিচিত পৃথিবীতে ফিরে আসবে পীটার প্যানের সাথে সাথে। স্বপ্নরাজ্য পাড়ি দিয়ে!

(48) **ব্যাঙ-সাহেবের ট্যাক্সিতে :** ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে এলো-পাতাড়ি অভিযানের যেন আর শেষ নেই। তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে, কিন্তু ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের অভিযান শেষ হবে না।

এই অভিযানটিও একটি ওয়াল্ট-ডিজ্‌নে ফিল্ম্ অবলম্বনে : The Adventures of Ichabad & Mr. Toad (1949).



ব্যাঙ-সাহেব একজন জবরদস্ত ট্যাক্সি-ড্রাইভার। অনেক অনেক মটোর-র‍্যালিতে প্রাইজ পেয়েছেন তিনি। স্বয়ং ব্যাঙ-সাহেব যখন স্টিয়ারিং ধরেছেন, তখন তুমি নিশ্চিন্ত মনে ট্যাক্সিতে চাপতে পার। কিন্তু গাড়ি স্টার্ট নেবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার চক্ষু চড়কগাছ! সে কী ড্রাইভিং!

একে ধাক্কা দিয়ে, ওকে চাপা দিয়ে গাড়ি ছুটছে এলো-পাতাড়ি। প্যাঁক-প্যাঁক, কঁক্-কঁক্ করতে করতে ছুটে পালাচ্ছে ঝাঁক-ঝাঁক হাঁস-মুরগী। সামনে লেভেল-ক্রসিং বন্ধ। ব্যাঙ-সাহেব 'হেন-অন কলিশন' করল লোহার গেটের সঙ্গে। দ্রাম করে খুলে গেল গেটটা। গেট-ম্যান তারস্বরে চিল্লাচ্ছে। মটোরগাড়ি উঠল রেল লাইনে আর ট্রেনটাও গাঁৎ-গাঁৎ করতে করতে ছুটে এল। তুমি হয়তো ভয়ে চোখ বন্ধ করে দিয়েছ। মুহূর্তের জন্যে ভুলে গেছ—স্টিয়ারিং যাঁর হাতে তিনি স্বয়ং ব্যাঙ-সাহেব! রেলগাড়ির ছোঁয়া বাঁচিয়ে ততক্ষণে ট্যাক্সিটা হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়েছে বুঝি কার বৈঠকখানায়!

কোন মানে হয়! রাস্তা ছেড়ে ড্রইং-রুমে কেন?

ঝন্‌ঝনিয়ে ভেঙে পড়ল একরাশ কাঁচের বাসন। প্রকাণ্ড একটা কাচের জানলা ভেদ করে আবার গাড়িটা বের হয়ে গেল অন্যদিকের সড়কে। খোদায় মালুম—কী করে সব আবার জোড়া লাগে! তবে লাগে। কারণ আমরা সব্বাই একই দৃশ্য দেখেছি। দু-চার সেকেণ্ড আগে পিছে। আমার স্বচক্ষে দেখা—ভাঙা-আয়না, কাবার্ড, চীনামাটির জিনিসপত্র নীস্ দু-চার সেকেণ্ড পরে অটুট অবস্থায় দেখেছে; এবং আবার দেখেছে ঝন্‌ঝনিয়ে সশব্দে ভেঙে পড়তে।

পরে এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কথাও হয়েছে। হয়তো ঐ টুকু আমরা সিনেমার মাল্‌টিপ্ল-স্ক্রীনে দেখি, বুঝতে পারিনে।

তারপর পুলিসের হাতে ধরা পড়লেন ব্যাঙ-সাহেব। বেতালা ট্যাক্সি চালানোর অপরাধে আদালতে হাজির করা হল তাঁকে। আমরা তো গাড়ি থেকে বার হতে পারছি না; তাই যাত্রীসমেত গাড়িটাকে আনা হল আদালতে।

জজ্‌সাহেব ব্যাঙ-সাহেবকে দেখেই বলেন, চিনি, চিনি, ওকে চিনি! অনেকবার ওকে ক্ষমা করা হয়েছে। বিচার টিচার করতে হবে না—যাত্রীসমেত গাড়ি, আর ড্রাইভারকে ঝেড়ে দাও আগুনের কুণ্ডে! ল্যাঠা চুকে যাক!

আমি হাঁ-হাঁ করে আপত্তি জানাতে যাই—'এ কী রকম বিচার হল ধর্মাবতার। আমাদের কী দোষ?'

কে-কার কথা শোনে! ওরা তোল্লাতুল্লি করে গাড়িটাকে ফেলে দিল একটা বারুদের স্তূপে, আর জেলে দিল একটা দেশলাইয়ের কাঠি—দ্রূম্!

আমি জ্যাককে জড়িয়ে ধরেছি, না সেই আমাকে ধরেছিল মনে নেই। বিস্ফোরণের পরে দেখা গেল দাদু-নাতি আলিঙ্গনবদ্ধ। গাড়িটা অক্ষত। আর অক্ষত সেই ড্রাইভার —ব্যাঙ সাহেব। মিটি-মিটি হাসতে হাসতে বলছেন, "আবার আইবেন ছার! ব্যাঙ-ছায়েব যহন ইস্টিয়ারিঙে বইয়া আছেন, তহন বেহুদা ডরেন কিয়েল্লেগে?"

(49) **শিশু-সাহিত্যের কল্পলোকে :** পাইরেটস্ অব

দ্য ক্যারেবিয়ান', 'বিগ্ থাণ্ডার মাউণ্টেন' বা 'ব্যাঙ-সাহেবের অভিযান' ইত্যাদি ছিল উত্তেনায় ঠাশা —লোমহর্ষক। এটা আদৌ তা নয়। গতির চেয়ে যতিই এখানে বড় কথা। নৌকা অতি ধীর গতিতে এগিয়ে যায়। যায় আর থামে। ঘাটে ঘাটে মণিমুক্তা কুড়িয়ে নেবার সুযোগ তুমি পাবে। তুমি যে চলেছ আঁকা-বাঁকা নদীপথে, বিশ্ব-শিশুসাহিত্য রাজ্যের ঘাটে-ঘাটে থামতে থামতে। নার্সারী রাইম, মানে ছড়ার রাজ্য থেকে যাত্রা শুরু—সেটা নিতান্ত শৈশবে: 'মেরী হ্যাড এ লিট্‌ল্ ল্যাম্ব্' অথবা 'জ্যাক এ্যাণ্ড জিল', কিম্বা 'হিকরি-ডিকরি ডক্'। তারপর বাল্যকালের বাল-সাহিত্য। এরপর কৈশোরে পড়া বই গুলো। অবশ্য শুধু ইংরাজি, ফরাসী, জার্মান ভাষায় লেখা বইগুলো। তাই দেখতে পেলুম না আমার ছেলেবেলার সাথীদের কঙ্কাবতী, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, ক্ষীরের পুতুল অথবা কুমড়ো-পটাশ, পাগলা দাশু, হিজ-বিজ-বিজদের।

তবে বিদেশী বন্ধুদের অনেকের দেখা পেলুম। 'টোয়েণ্টি থাউজেণ্ড লীগ্স্'-এর জায়েণ্ট স্কুইড, 'রবিনসন ক্রুশো'র ফ্রাইডে; মবিডিক, আইভ্যান হো, ট্রেজার আইল্যাণ্ড। হঠাৎ দেখি, জিল জুতো খুলে পা গুটিয়ে বসেছে। জ্যাক বলে, এক-পাটি জুতো যদি জলে পড়ে যায় তাহলে কে খুঁজে দেবে?

আমি বলি, জিল বোধ হয় আশা করে আছে ওর জুতো খুঁজে দিতে আসবে কোন রাজপুত্তুর—সিণ্ডেরেলার মতো...

জিল হাততালি দিয়ে ওঠে: কার মতো?

— সিণ্ডেরেলা, কেন?

—ঐ তো মনে পড়ে গেছে তোমার?

—কী?

—বাঃ! তখন যাকে দেখেছিলে প্রসেশনে!

(50) **'ছোট্ট মোদের জগৎখানা'**: জাপানে একটি প্রবাদ আছে—'নিক্কো এ কেক্কো'!

তার মানে? মানে হল, জাপানে বেড়াতে এসে যেখানে সেখানে 'কেক্কো' বলতে নেই। কথাটা দামী। ওটা সযত্নে জমিয়ে রেখ সেই অনবদ্য নিক্কো বাগানের জন্য।

তাতেও মানেটা পরিষ্কার হল না?

শোন, বুঝিয়ে বলি—'নিক্কো' একটি অপূর্ব ফুলের বাগান। টোকিওর কাছাকাছি। ফুল-ফল, পশু-পাখি, পাহাড়-ঝরনায় সে এক নন্দন কানন। আর 'কেক্কো' মানে: অতুলনীয়! ম্যাগ্‌নি ফিসেণ্ট! লা-জবাব!

প্রাচ্যের প্রাজ্ঞ পণ্ডিত তাই বিদেশী টুরিস্টদের ডেকে বলছেন, বাপুহে! জাপানে বেড়াতে এসে মানুষের গড়া যান্ত্রিক ভেল্‌কি দেখে যেখানে সেখানে 'কেক্কো' বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ কর না। কথাটা সযত্নে জমিয়ে রেখ 'নিক্কো' বাগিচার জন্যে।

আমারও সেই দশা। ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে মাথা গলিয়েছি, সেই সকাল নয়টায়। বারে-বারে বলে বসেছি অতুলনীয়! ম্যাগনিফিসেণ্ট! লা-জবাব! কেক্কো!

এতক্ষণে মনে হচ্ছে, বেজায়গায় কথাটা বেহুদ্দো খরচ করেছি। ওটা এই মণ্ডপের জন্য!

1964 সালে নিউইয়র্কে বিশ্বমেলা হয়েছিল। তার উদ্যোগপর্বে, আগের বছর, পেপ্‌সিকোলা কোম্পানি ডিজ্‌নে সাহেবকে অনুরোধ করেন —বিশ্বমেলা প্রাঙ্গণে একটি বিশ্বশিশু-মেলার মণ্ডপ বানিয়ে দিতে। শিশুদের ব্যাপারে ডিজ্‌নে তো সব সময়ে একপায়ে খাড়া। নিউইয়র্কের মেলায় তৈরী হল এই অপূর্ব মণ্ডপটি। একবছর পরে মেলা যখন ভাঙল, তখন পেপ্‌সিকোলা কোম্পানি আর ইউনিসেফ্ ডিজ্‌নেকে বলল, এমন অপূর্ব মণ্ডপটিকে স্থায়ী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে। ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা এগিয়ে এল অর্থসাহায্যে। ডিজ্‌নে তাঁর ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে নতুন করে গড়ে তুললেন এই মণ্ডপটি —

—ইট্স্ এ স্মল ওয়ার্ল্ড'!

—ছোট্ট মোদের জগৎখানা!

যেমন বাগান, তেমনি বাড়ি, তেমনি সব সজীব-পুতুল। সুরের ঝলকানি আর আলোর সঙ্গীত। বাড়ির সামনের দিকটা, যাকে বলে facade, সেখানে নজর করলে দেখতে পাবে বিশ্বসংস্কৃতির নানান দিকচিহ্ন—পীসার হেলানো টাওয়ার, পারীর ঈফেল-টাওয়ার, লণ্ডনের বিগ্‌বেন, মস্কোর ক্রেমলিন আর আগ্রার তাজমহলের আভাস। সামনের বাগানে সবুজ ঝাঁকড়া গাছ ছেঁটে ছেঁটে (ইংরাজিতে যাকে বলে topiary) নানান জীবজন্তু বানানো—বাঘ, সিংহ, হাতী, জিরাফ, উট, লামা। মায় কল্পলোকের ড্র্যাগন, ইউনিকর্ণ।

বাগানের গা-ঘেঁষে স্ফটিক-স্বচ্ছ জল। আঁকা-বাঁকা একটা নদী বাড়িটাকে ঘিরে ধরেছে। বিরাট তোরণ-দ্বারের ভিতর দিয়ে নদীটা ঢুকে গেছে প্রাসাদের ভিতর। ওখানে হাঁটা চলা মানা। যা-কিছু দেখবে তা ঐ নৌকাতে বসে বসে। নদীটার নাম —'সাত সাগর আর তের নদীর তীর্থসলিল।'

কারণ আছে।

উদ্বোধনের আগে ডিজ্‌নে-সাহেব বিশ্বের বিভিন্ন মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানালেন সারা পৃথিবীর শিশু-দলকে। অনুরোধ করেছিলেন, প্রতিটি শিশু যেন সঙ্গে করে



নিয়ে আসে এক-এক ঘটি জল! তাদের দেশের কোন বড় নদী অথবা সাগরের জল। যে জলের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে সেসব দেশের চাষীভাই অথবা মৎস্যজীবী। ওরা এল দলে দলে। প্রত্যেকের হাতে এক-এক ঘটি জল। প্রত্যেকটি শিশু লগ্‌-বুকে লিখে দিল নিজের নাম, দেশের নাম, আর কোন নদী-সাগরের জল সে বয়ে এনেছে। আঁকা-বাঁকা কাঁচা হরফে। তারপর ওরা সার দিয়ে দাঁড়াল। সবাই মিলে গাইলইল: বিশ্বশিশুর জাতীয় সঙ্গীত! ইটস্ এ স্মল ওয়ল্ড

সে গানটা এমন যে, যারা ইংরাজি ভাষা জানে না, তারাও তা-না-না-না করে সুর মেলাতে পারে। সহজ সুর, সহজ ভাষা। গান শেষ হলে প্রত্যেকে ঢেলে দিল নিজের নিজের ঘটির জল—ঐ নদীতে। ইয়াং সিকিয়াং মিশে গেল আমেজন নদীর জলে, গঙ্গা মিতালী পাতালো ভল্‌গার সাথে। ভূমধ্যসাগর হাত মিলালো প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে। তাই এ নদীর নাম রাখা হল—'সাত সাগর আর তের নদীর তীর্থসলিল।'



এই সাড়ম্বর উদ্বোধনের কিছু দিন পরেই তাঁর ছোট্ট জগৎ থেকে চিরবিদায় নিলেন ওয়াল্ট ডিজ্‌নে। রওনা দিলেন একলা-চলার পথে! গানটা কিন্তু তা বলে থেমে গেল না।

তুমি যখন নৌকায় বসে এ প্রাসাদের সাত রাজ্যে পাক মারবে তখন দেখবে ও শুনবে—সব দেশের সব পুতুল ঐ গানটা গাইছে! বিশ্বশিশুর মিলনসঙ্গীত!



একটু পরে খেয়াল হবে নিজের অজান্তেই তুমি ওদের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছ! শিখে ফেলেছে সেই গানটা!

সব মিলিয়ে 297টি কলের শিশু আর 256টি কলের জীবজন্তু আছে এই মণ্ডপে। সবাই আপাতদৃষ্টিতে সজীব। Audio Animatronics প্রযুক্তি-বিদ্যার কল্যাণে তারা নড়ে-চড়ে, হেলে দুলে গান গায়, হাসতে হাসতে তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে।



আবার যাত্রাশেষে যখন শেষ খিলানের নিচে দিয়ে তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ তখন পুতুলগুলো নিজের নিজের দেশের ভাষায় তোমাকে বিদায় জানাবে। কেউ ইংরাজিতে বলছে—'ফেয়ারওয়েল'; কেউ ফরাসীতে 'অ্যাডিয়ু'; কেউ বা জাপানী ভাষায়—'সায়োনারা'। তুমিও হয়তো বলে বসবে: 'ফির মিলেঙ্গে' অথবা 'বিদায়'!

অবাক হয়ে লক্ষ্য করবে, ঐ ভিন্‌দেশী পুতুলগুলোর কাছে বিদায় নিতে তোমার চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে।

গানটা তুলনাহীন—এক কথায়: 'কেক্কো'!

নৌকো চলছে এঁকে বেঁকে। এ-দেশ থেকে সে-দেশে। ময়ূরপঙ্খী নাও যেন। সবার আগে ইউরোপ। একেবারে উত্তরতম প্রান্ত। এস্কিমোদের দেশ...সীলমাছ, শ্বেত ভল্লুক, অরোরা বোরিওলিস্।[১৬] মাঝরাতের চাঁদপানা সুয্যিঠাকুর[১৭]। বরফের 'ইগ্‌লু'[১৮] থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা বাচ্চা ছেলে। হাতে বর্শা—মাছ ধরার। হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

এরপর ডেনমার্ক। কোপেনহেগেনের সমুদ্রতীরে বসে আছে নিঃসঙ্গ লিট্‌ল্ মারমেড। ...বেলজিয়ামের একটা বছর-ছয়েকের ফুট্‌ফুটে মেয়েকে এক-ঝলক্ দেখা গেল—এক ঝাঁক হাঁসকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে খোঁয়াড়ে—শেয়ালে না খায়।



গুটি কয়েক ছেলে-মেয়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে। ওরা কোন দেশের গো? বাঃ! চিনতে পারলে না? স্কটল্যাণ্ডের। ওদেরই তো বলে' হাইল্যাণ্ডার গারার ব্যাণ্ডপার্টি'! ঢোবা ঢোবা-



গাল ফুলিয়ে ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে। 'ছোট্ট মোদের জগৎখানা!'

জোড়ায় জোড়ায় 'ফক্সট্রট' নাচছে জার্মান খোকা-খুকুর দল।

তারপর লণ্ডনের বিগবেনের পাশে, পীসার হেলানো টাওয়ারের মাথায়, ফ্রান্সের পাকা-গমের ক্ষেতে, স্পেনের সমুদ্র-তীরে, সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড়ের ধারে, হল্যাণ্ডের উইণ্ডমিল ঘেঁষে নাচছে সেই-সেই দেশের ছেলে-মেয়ে—জোড়ায় জোড়ায়; গাইছে: "ছোট্ট মোদের জগৎখানা, যাই বল"!

তারপর ওরিয়েন্ট! পূবের দেশ! ইউরোপ ছেড়ে এশিয়ায়। প্রথমেই একদল বালখিল্যের উদ্দাম ধেই-ধেই! রীতিমতো কশরতের নাচ। ওরা না-ইউরোপের, না এশিয়ার। মাথায় সাদা টুপি, পায়ে কালো জুতো। কশাক-শিশু। ওদের ঐ বিচিত্র নাচের নাম- গোপাক!



আকাশে ওটা কী উড়ছে রে? আরে, আরে ওটা না সেই ম্যাজিক-কার্পেট! তার মানে ইতিমধ্যে পারস্যে পৌঁছে গেছি!

বাগদাদ্! হারুন-অল-রসিদের দেশ! রাজপুত্তুর আর রাজকন্যাকে নিয়ে ম্যাজিক-কার্পেট পাড়ি জমিয়েছে আকাশ পথে। ঠিক যেমন আজ সকালে জ্যাক-জিলকে নিয়ে আমি উড়েছি রামধনু-পথে!...

ঐ তো আলিবাবার সেই গুহাটা! চিচিং ফাঁক! ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ করে খুলে গেল প্রকাণ্ড পাল্লাটা। ভিতরে - বললে বিশ্বাস করবে না ভাই—ঘড়া-ঘড়া মোহর!...



ঐ পেঁয়াজী গম্বুজটা চেনা-চেনা লাগছে কেন?

ও হরি! ওটা যে তাজমহল! তাই তো! ফিরে এসেছি ভারতে! মার্কিন পুতুল এমন দারুণ কথক-নাচ শিখল কার কাছে গো? ধা-ধা ধিন্‌ধা!... ওর পাশেই বসে আছে মেরজাই গায়ে বুড়ো সারেঙ্গি আর তবল্‌চি।...বুলন্দ্ দরওয়াজার সামনে বসে একটা নেংটিসার সাপুড়ে-বাচ্চা খেলা দেখাচ্ছে। এরা আমাদের চির-চেনা। ঐ তবলচি, সারেঙ্গি, বাইজী আর উদাম-গা নেংটিসার সাপুড়ে।



নৌকা ইতিমধ্যে মঙ্গোলিয়া পার হয়েছে। পৌঁছে গেছি মহাচীনে। ঐ-তো চীনের প্রাচীর! পাশে ধানের ক্ষেত। টোকা-মাথায় চীনে মেয়েরা পাকা-ধানের ক্ষেতে জড়ো হয়েছে। একটা চীনা দিদিকে দেখতে পেলুম - তার পুঁচকে ভাইকে আগলে রেখেছে। ভাইয়ের মাথায় মস্ত টোকা!...

জাপান! রঙিন ছাতা...ফানুস...ড্র্যাগন...ফুজিয়ামা পাহাড়ের সামনে অদ্ভুতদর্শন একটা বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে জাপানী গাইসা।[19] ছোট্ট মেয়ে কিন্তু সে। শিশু শিল্পী!

হাকাডি—হাইডি—হাঈ!

আফ্রিকা! একদিকে দিগন্ত-অনুসারী সাহারা, অন্য দিকে নিবিড় অরণ্য। মরুভূমির মাঝে মাঝে মরুদ্যান।... পাতায়-ছাওয়া কুটির, খেজুর গাছ। প্রথমেই দেখতে পেলুম একটা মিশরীয় রাজ-প্রাসাদ। সোনার পালঙ্কে ঘুম যাচ্ছে কুচবরণ কল্পলোকের রাজকন্যা। না, না, কল্পলোকের তো নয়! ও যে ঐতিহাসিক চরিত্র—আমাদের অতি চেনা: মিশর-সুন্দরী ক্লিওপেট্রা!...

ধূসর মরুভূমির পথে উটের সারি। দূর থেকে ভেসে আসছে সাম-ওয়াক্তের আজানধ্বনি,[20] মুয়াজ্জিন মিনার থেকে। ...মধ্য আফ্রিকায় দেখতে পাচ্ছি কিলিমাঞ্জেরোর[21] সানুদেশে এক দল জিরাফ-জেব্রা। এখানেও আফ্রিকান কাফ্রি খোকা-খুকু বাজাচ্ছে: হাকাডি হাইডি—হাঈ!



নৌকাটা কখন বুঝি পাড়ি দিয়েছে আমাদের অজান্তে অতলান্তিক! এবার শুরু হল

দক্ষিণ থেকে। প্রথমেই 'পেলে'র দেশে; ব্রেজিল।... অ্যাণ্ডিজ[২২] পাহাড়ের উপত্যকার মাঠে ঘাস খাচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার উট, লামা! তারা আমাদের দেখে ভয় পেল না কিন্তু। কেন পাবে? ওরা যে জানে, এই 'ছোট্ট মোদের জগৎখানায়' শিকার করা মানা।... আর্জেণ্টিনার একটা কার্নিভাল, একটা জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি...মেক্সিকোর টুপিনাচ... কুমোর বসে মাটির হাঁড়ি বানাচ্ছে।

উঠে এলুম উত্তর দিকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ডিজ্‌নে-সাহেবের দেশ। দেখলুম, নায়গ্রা জলপ্রপাত।

এবার পাড়ি দেওয়া গেল প্রশান্ত মহাসাগর। হাওয়াই দ্বীপে দেখি, ছোট্ট একটি মেয়ে নাচছে—হুলা-হুলা নাচ! ...ঈস্টার দ্বীপে দেখতে পেলুম নিঃসঙ্গ পাথরের দেবতা উদাস দৃষ্টি মেলে দেখছে সমুদ্রকে। নিউজিল্যাণ্ডের কিউঈ পাখি।... অস্ট্রেলিয়ায় হাত ধরাধরি করে নাচছে ক্যাঙ্গারু। জোড়ায়-জোড়ায়। না, ভুল হল। আড়াইয়ে আড়াইয়ে! কারণ মাদী-ক্যাঙ্গারুর ভুঁড়ি-পকেটে যে ঐ সঙ্গে নাচছে তিড়িং-নিড়িং চুন্নুমুন্নু ক্যাঙ্গারু-বাচ্চা!

তারপর একটা অদ্ভুত ভোজবাজি হয়ে গেল যেন!

এঞ্জিনিয়ারদের বদলে এবার দেখি কাজে নেমেছেন ইম্যাজিনিয়াররা! 'জিনিয়াস'-এর বদলে 'ইম্যাজিনিয়াস'!

ধূপের ধোঁয়া যেভাবে মিলিয়ে যায়, মেঘে মেঘে যেমন মিশে যায়, অথবা স্বপ্নে স্বপ্নে—ঠিক সেই ভাবে সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল! মিলিয়ে গেল যাবতীয় জাগতিক বন্ধন! সব বাধা-বিঘ্ন, বিভেদ বুদ্ধি!

পুতুলগুলো নাচতে নাচতে প্রমাণ দিল—"একটু হাসিই বাজায় প্রাণে সব-মিতালীর তূর্য!"

নদীপারের এই শেষ রাজ্যে দেখছি, ওরা কোন বাধা মানে না—না সাগরের, না পাহাড়ের, না ভাষার।

সবশেষের এটা হচ্ছে—'সবাই রাজা'র দেশ!

কর্পূরের মতো উপে গেল—হিমালয়, আল্পস্, রকি অ্যাণ্ডিজ-এর মেঘমিতালী শৃঙ্গের বাধা। পিচ-গলা গরম রাস্তায় ছলকে-পড়া জলের মতো উপে গেল—অতলান্তিক-প্রশান্ত-ভারত মহাসাগরের ভেদবুদ্ধি। সারা দুনিয়া মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল এই বিশ্বশিশুর স্বপ্নরাজ্যে!

জগৎ পারাবারের তীরে শিশু ভোলানাথের জাত নেই। এখানে পৌঁছে দেখি—ইতিপূর্বে-দেখা সবগুলো পুতুল এসে জড়ো হয়েছে আবার! যেন 'কার্টেন-কলে' শেষ অভিবাদন জানাতে। যেন জগন্নাথের রথের রশি টানতে! তাদের পরনে ভিন্ন ভিন্ন দেশের পোশাক, কিন্তু তারা ভিন্ন ভিন্ন দেশের নয়। তারা সবাই 'ছোট্ট মোদের এই দুনিয়ার' বাসিন্দা। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, মেঘালয় থেকে মহারাষ্ট্রের মানুষ যেমন তাদের পোশাক, ভাষা, খাদ্যাখাদ্যের বিভেদ সত্ত্বেও একান্তভাবে ভারতবাসী!

ইগ্‌লুর সেই উঁকি-মারা এস্কিমো-শিশুটি এখন নাচছে ক্যাঙ্গারুর হাত ধরে!...আফ্রিকান মিশ্‌কালো কাফ্রি খোকা-খুকুর নৃত্যসঙ্গী এখন ধব্‌ধবে পোলার বেয়ার!...কোপেন-হেগেনের নিঃসঙ্গ লিট্‌ল মারমেড এতদিনে বন্ধু খুঁজে পেয়েছে। তার বয়-ফ্রেণ্ড জাপানের সামুরাই! উটের পিঠে ওটা কেরে? হুলাহুলা-নৃত্যপটিয়সী সেই যে মেয়েটিকে আগে দেখেছি, তাকে নিয়ে উটের পিঠে বেড়াতে বের হয়েছে হাতিয়ার-বন্দ্ আরব মরুভূমির নওজোয়ান!..

হায় হায়! শেষ-মেষ সাপ নাচাচ্ছে বেলজিয়ামের খুকু!..

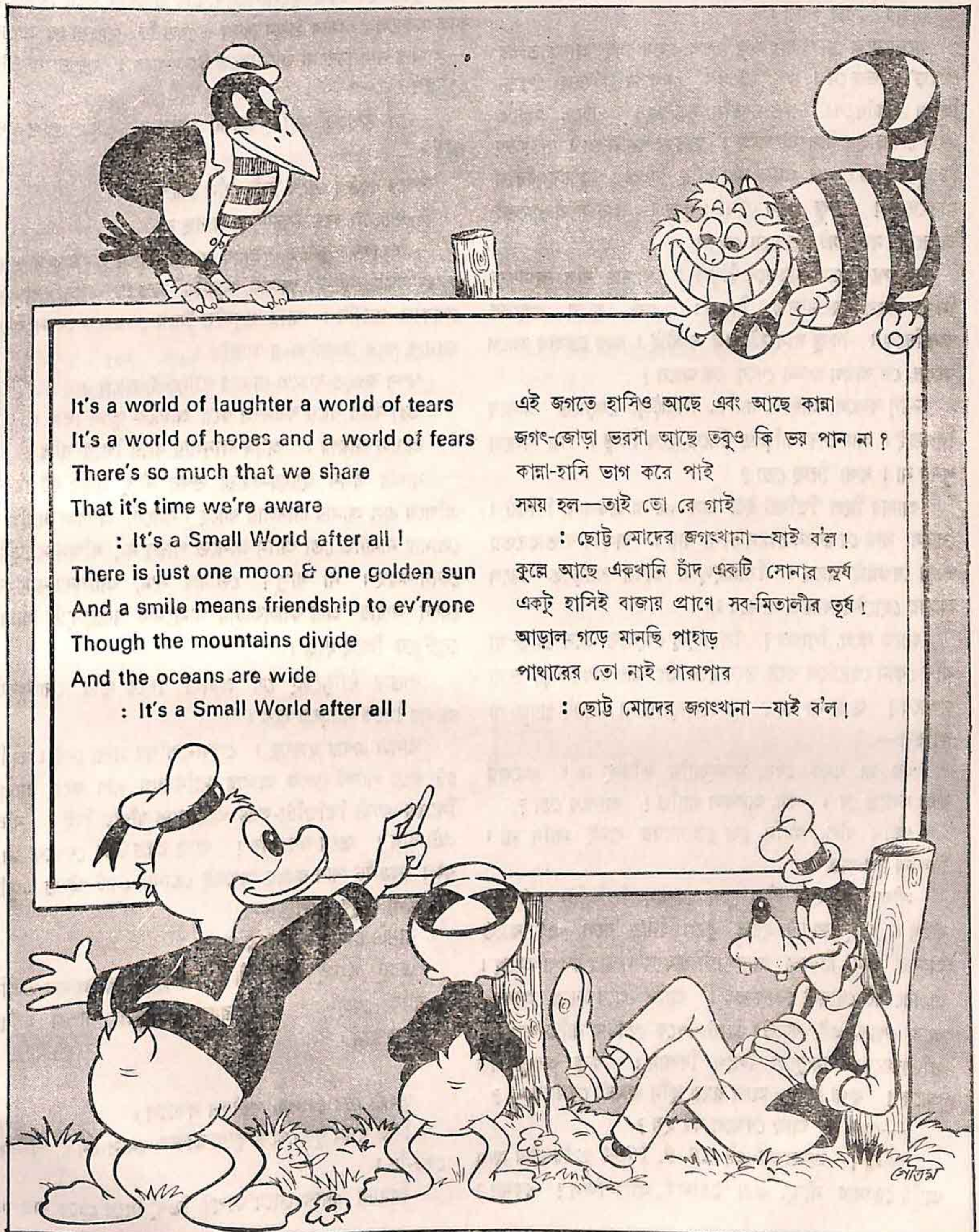
আর নেংটিসার আমাদের সেই চিরচেনা সাপুড়ের ছেলেটা নাচছে ধেই ধেই, ওকাপির হাত ধরে!

'It's a Small World' গানটি অনবদ্য! এর ক্যাসেট কিনতে পাওয়া যায়। সব ভাষায় এ গানটি অনুবাদ করে গাওয়া উচিত। আমি এটা বাংলায় অনুবাদ করে দিলুম। দেখ, তোমরা সুর দিয়ে গাইতে পার কিনা।

যে কথা আগেও বলেছি, আবার তাই বলি—প্রযুক্তি বিদ্যায় যে ভেল্‌কি আছে এই প্রদর্শনীতে তা অনবদ্য, কিন্তু এটা রসোত্তীর্ণ শিল্প হয়ে উঠেছে 'এঞ্জিনিয়ার'দের কাজের পরিচালনা যাঁরা করেছেন সেই 'ইমেজিনিয়ার'দের কৃতিত্বে। অবাস্তব? মানছি। কিন্তু ঐ সঙ্গে কি মনে হয় না—

"রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা
এমন কেন সত্যি হয় না, আহা!"

কী জানি ভাই, আমার তো একটুও অবিশ্বাস্য মনে হল না। কাফ্রির সঙ্গে পোলার বেয়ার, এক্সিমোর সঙ্গে ক্যাঙ্গারুর নাচ এমন কি অসম্ভব? তোমরাও তো এতক্ষণ দেখলে, খাশ-কলকাত্তাইয়া একটা ষাট বছরের বুড়ো কীভাবে ধেই ধেই নাচল এই ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে—সারাটা দিন মান, তার পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া মার্কিন নাতি-নাতনির হাত ধরে!


It's a world of laughter a world of tears
It's a world of hopes and a world of fears
There's so much that we share
That it's time we're aware
: It's a Small World after all !
There is just one moon & one golden sun
And a smile means friendship to ev'ryone
Though the mountains divide
And the oceans are wide
: It's a Small World after all !
এই জগতে হাসিও আছে এবং আছে কান্না
জগৎ-জোড়া ভরসা আছে তবুও কি ভয় পান না ?
কান্না-হাসি ভাগ করে পাই
সময় হল—তাই তো রে গাই
: ছোট্ট মোদের জগৎখানা—যাই ব'ল !
কুলে আছে একখানি চাঁদ একটি সোনার সূর্য
একটু হাসিই বাজায় প্রাণে সব-মিতালীর তূর্য !
আড়াল গড়ে মানছি পাহাড়
পাথারের তো নাই পারাপার
: ছোট্ট মোদের জগৎখানা—যাই ব'ল !


ফ্রন্টিয়ার ল্যান্ড
নিউ অর্লিন্স স্কোয়ার
এ্যাডভেঞ্চার ল্যান্ড
A টুমরোল্যান্ড
① মনোরেল স্টেশান
② ডুবোজাহাজ অভিযান
③ আকাশপথের গণ্ডোলা
④ একচাকার মনোরেল
⑤ অটোপিয়া রাইড
⑥ পরমাণুর প্রাণকেন্দ্র
⑦ স্টার কেড ⑧ মহাকাশ যাত্রা
⑨ মঙ্গলগ্রহে অভিযান
⑩ সার্কল ভিশান ⑪ আমেরিকা গান গায়
⑫ রেল রোড ⑬ গ্র্যান্ড ক্যানিয়ান্স
⑭ প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরের যুগ
B মেইন স্ট্রীট, ইউ.এস.এ
⑮ রেল রোডে মেইন-স্ট্রীট স্টেশন
⑯ দোকান পাট ⑰ লিঙ্কলন্ হল ⑱ পঞ্চম মূর্তি
⑲ ডিজ্‌নেল্যান্ড সিনেমা-হল ⑳ শো-কেস-হল
C এ্যাডভেঞ্চার ল্যান্ড
㉑ বাজার ㉒ ট্রপিক্যাল ইম্পোর্টস ㉓ সাউথ-সী ট্রেডার্স
㉔ গুয়াটামেলা ㉕ অরণ্য অভিযান ㉖ গাছবাড়ী
㉗ টিকি রুম জলসাঘর


সি ল্যান্ড
টুমরো
ল্যান্ড
A
B
E
৩০ চা
৩১ গো
৩৩ মার্ক
৩৫ টম-সয়
F ভালুকদে
৩৬ ভালুক ভাইদে
G ফ্যান্টাসি ল্যা
৩৭ স্লিপিং বিউটি রাজ
৩৮ স্নো-হোয়াইট আর স
৩৯ পিনোক্কিও-র দুষ্টুমী
৪০ কিং আর্থারের ঘোড়দৌড়
৪১ উড়ন্ত হাতী ডাম্বো আর ব
৪২ ম্যাটারহর্ন পর্বত ৪৩ বব্-স্লেড
৪৫ আজবদেশে এ্যালিস ৪৬ ম্যাড-হ
৪৭ পিটার প্যান ৪৮ ব্যাঙ-সাহেবের ট্যা
৫০ "ছোট্ট মোদের জগৎখানা-যাই ব'ল!
টাউন স্কোয়ার
॥ ডিজনে

শেষ হল ডিজ্‌নেল্যাণ্ড দেখা।

এবার ফেরার পালা।

মনোরেলে চেপে চারজনে ফিরে এলুম সেই 'আমড়াতলার মোড়ে'—ডিজ্‌নেল্যাণ্ড হোটেলে। যেখানে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম একদিনের নাতি-নাতনি দুটিকে। হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছালুম বাস-স্টপেজে। রাত তখন নয়টা। সচরাচর ডিজ্‌নেল্যাণ্ড খোলা থাকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত। ছুটির দিনে রাতভোর! কিন্তু এখন ধর্মঘট চলছে। তাই সন্ধ্যে-রাতেই আজকের মত গেট বন্ধ হয়ে গেল।

স্টপেজে এসে চারজনে দাঁড়াই। আমার 'বাস' আমাকে নিয়ে যাবে 'ডার্উইন'র দিকে। ওরা যাবে শহরের অন্যদিকে। কিন্তু বাস-স্টপেজ একটাই। কার চক্রযান আগে আসে, কে আগে রওনা দেবে কে জানে?

নীস্ বললে, আঙ্কল গ্যাণ্ড, সিয়াট্‌ল্, বেড়াতে আসবে নিশ্চয়ই। আমাদের বাড়িতে উঠতে হবে কিন্তু। 'না' বললে শুনব না। কথা দিচ্ছ তো?

আমার ছিল 'ভিজিট ইউ এস. এ.'-র একখানা টিকিট। ষোলো বার যে-কোন প্লেনে চাপা যায়। অর্থাৎ যাতায়াতের ভাড়া দেওয়াই আছে। সিয়াট্‌ল্-এ ওদের বাড়িতে উঠলে আমার হোটেল খরচও লাগবে না।

জ্যাক বলে, শিওর! সিয়াট্‌ল্ বেড়াতে এসে গ্র্যাণ্ড-পা যদি কোন হোটেলে ওঠে, তবে তো ওঁর আর একজোড়া ডানা গজাবে! তাই না মম্? একজোড়া ডানা নিয়েই গ্র্যাণ্ড-পা কাহিল—

ওর মা ধমক দেয়, ফাজ্‌লামি করিস্ না। কাজের কথা বলতে দে। বল, আঙ্কল গ্যাণ্ড! আসবে তো?

আমি বলি, আমি তে তোমাদের নামই জানি না। ঠিকানা দূর-অস্ত।

নীস্ তার হাত-বটুয়া খুলে একখানা ভিজিটিং কার্ড বের করল। ডট্-পেনটা হাতে তুলে নিয়ে বলে, এই কার্ডে আমার নাম, ঠিকানা আর টেলিফোন নাম্বার লেখা আছে। এয়ারপোর্ট থেকেই ফোন কর। আমি গিয়ে নিয়ে আসব। আর শোন, এই কার্ডের উল্টো-দিকে তোমার নাতি-নাতনির সত্যিকারের নাম-দুটো লিখে দিলাম। কিন্তু একটা শর্ত আছে! কথা দাও—আজ রাত্রে তুমি কার্ডটা দেখাবে না?

—কেন? আজ দেখলে কী হয়?

—না! আজকের এই 28. 9. 1984 তারিখটার জন্য আমি তোমার নীস্, এরা তোমার জ্যাক-জিল! কেমন? আর তুমি যে-রকম ভুলো-মানুষ তাই সাবধান করে দিচ্ছি। কাল সকালে তোমার প্রথম কাজ—বেড টি. খাওয়ারও আগে —আমার নাম ঠিকানা ডায়েরিতে টুকে রাখা। যাতে কার্ডটা হারিয়ে গেলেও...

—কে বল্লে আমি ভুলো মানুষ?—আমি প্রতিবাদ করি।

সযত্নে কার্ডটা রেখে দিই মানি ব্যাগে।

—তাহলে কবে সিয়াট্‌ল্ আসছ?

—ওয়ালনাট-ক্রীকে আমার মেয়ে আছে। প্রথমে তার কাছে ফিরে যাই। আমার নাতনি অন্তরা এখন আমার লোকাল গার্জেন। তার অনুমতি নিয়ে তোমাকে ফোন করে জানাব, কবে সিয়াট্‌ল-এ আসছি।

গল্প করতে করতে আমার গাড়িটাই আগে এল।

ওরা বারে বারে করমর্দন করে আমাকে তুলে দিল।

অঢেল জায়গা। আমি জানলার ধারে গিয়ে বসি।

বাসটা যখন ছাড়ো-ছাড়ো, তখন নীস্ হঠাৎ কী ভেবে এগিয়ে এল আমার জানলার কাছে। বললে, আঙ্কল গ্যাণ্ড। তোমার নামটাও তো আমি জানতে পারব না, যদ্দিন না তুমি ফোন করছ। না বাপু! তোমার নাম, ওয়ালনাট-ক্রীকের ফোন নাম্বার আর ক্যালকাটার পার্মানেণ্ট অ্যাড্রেস্‌টা আমার নোটবুকে লিখে দাও।

রাস্তায় দাঁড়িয়েই সে জানলা দিয়ে তার নোটবুকটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে।

বাসটা এবার ছাড়ছে। লেখা-লেখির সময় নেই। আমি চট্ করে পকেট থেকে আমার মানিব্যাগ বার করে আমার নিজের একটা ভিজিটিং-কার্ড ওর হাতে ধরিয়ে দিই। বলি, এটা রাখ। তবে খবরদার! আজ রাত্রে এটা দেখবে না। কাল বেড-টি পান করার আগেই তোমার নোট-বইতে....তুমি যা ভুলো মানুষ....শেষে....

বাসটা চলতে শুরু করেছে।

একটু পরেই পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল আমার ভাইঝি —নাকি বোন্‌ঝি? আর রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া মার্কিন নাতি-নাতনি।

ভুলটা টের পেলাম পরদিন সকালে।

পিউ যখন ঘুম থেকে তুলে ডাকল, মেসোমশাই, আপনার বেড-টি!

বিছানা থেকে নেমে কাপটা ডিশ্ দিয়ে ঢেকে বার করি

মানিব্যাগটা! তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও উদ্ধার করতে পারলুম না নীসের কার্ডখানা!

কি করে হারাতে পারে?

একটু পরেই ব্যাপারটা বুঝতে পারি। তাড়াহুড়োয় মানিব্যাগের খোপ থেকে যে ভিজিটিং কার্ডখানা তখন জ্যাক-জিলের মায়ের হাতে তুলে দিয়েছি, সেটা আমার নামাঙ্কিত ভিজিটিং-কার্ড আদৌ নয়।

সেটা নীসের দেওয়া সেই একই মাপের কার্ডখানা! ভুলো-মানুষ, পাছে হারিয়ে ফেলি বলে যে-কার্ড দেখে ওর নাম-ঠিকানা এই সাত-সকালে আমার ডায়েরিতে লিখে রাখার কথা।

নীস্‌ও নিশ্চয় এখন এক কাপ ঠাণ্ডা-হয়ে-যাওয়া বেড-টির সামনে বসে তার হাত-বটুয়ার কার্ডখানা দেখছে। ওর নিজেরই কার্ড—যার পিছনে জ্যাক-জিলের সত্যিকারের নাম লেখা।

সিয়াট্‌ল্ যাইনি।

ডানা গজাবার ভয়ে নয়, ইচ্ছাই হয়নি!

তবে আমি আশা ছাড়িনি!

কেন ছাড়ব? আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আবার কোন ফ্যান্টাসিল্যাণ্ডে হঠাৎ খুঁজে পাব সেই নীলচোখ, সোনালী চুল আমার নাতি-নাতনীকে। লস্‌-অ্যাঞ্জেল্‌সের লস্ট অ্যাঞ্জেল্‌স্‌-দের! জ্যাক অ্যাণ্ড জিল! কেন পাব না?

It's Small World, after all!

ছোট্ট মোদের জগৎখানা, যাই ব'ল!

তাই না?

পরিশিষ্ট—ক

খুদে পণ্ডিতদের বাড়তি রসদ

চিচিংফাঁক :

1. (পৃষ্ঠা ৪) **মাদাম তুসো**—সুইস্ শিল্পী। মানুষের হুবহু মূর্তিগড়ায় ওস্তাদ। লণ্ডনের বেকার স্ট্রীট স্টেশানের কাছে এঁর অপূর্ব সংগ্রহশালা। বিশ্বের বহু মনীষীর হুবহু মোমের পুতুল বানিয়ে সাজিয়ে রেখেছেন। দেড়শ বছর ধরে প্রত্যহ হাজার হাজার দর্শক দেখতে যায়।

2 (পৃষ্ঠা ৫) **পিথাগোরাস্ থিওরেম**—গ্রীক গণিতজ্ঞের প্রমাণ করা একটি জ্যামিতির সূত্র। পিথাগোরাস প্রায় আমাদের বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। তাঁর নামে প্রচলিত ঐ গাণিতিক সূত্র অঙ্কশাস্ত্রের এক দিক্‌চিহ্ন। এতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, কোন সমকোণী ত্রিভুজের কর্ণের উপর আঁকা একটি বর্গক্ষেত্রের আয়তন অপর দুটি বাহুর উপর আঁকা দুটি বর্গক্ষেত্রের সমান। যারা জ্যামিতি পড় তারা জান, এটা প্রমাণ করতে বেশ সময় লাগে।

টুমরোল্যাণ্ড :

1. (পৃষ্ঠা ৭) **ইউ. এস্. এস্. নটিলাস**—প্রথম পারমাণবিক শক্তি-চালিত মার্কিন ডুবোজাহাজের ভিতরটা ছবিতে আঁকা হয়েছে। ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে যে নটিলাস আছে, তার নয়।

2. (পৃষ্ঠা ৭) **অঁ্যাকাচোরা শহর**— সুকুমার রায়ের ছড়াটা মনে আছে তো ? "কহ ভাই কহ রে, অঁ্যাকাচোরা শহরে বাদ্যিরা কেন কেউ আলুভাতে খায় না ?" / "লেখা আছে কাগজে, আলু খেলে মগজে ঘিলু যায় ভেস্তিয়ে বুদ্ধি গজায় না।" এই মওকায় বলে রাখি, 'অঁ্যাকাচোরা' শব্দটাও অভিধানে খুঁজে পাবে না। এটা সুকুমার রায়ের একটা নিজস্ব শব্দ ; ঠিক যেমন আমরা দেখেছি ডিজ্‌নের তৈরী অভিধান-বহির্ভূত শব্দ : imagineer অথবা imagenius অথবা লুই ক্যারলের, 'curiouser'। সুকুমার রায় এমন আজগুবি অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন যা অভিধানে নেই, কিন্তু যা বুঝতে একটুও অসুবিধা হয় না। যেমন, হাঁসজারু, হাতিমি, ব্যাচারাথেরিয়াম, চিল্লানোসরাস ইত্যাদি।

3. (পৃষ্ঠা ৭) **প্রক্সিমা সেণ্টার**- সৌরমণ্ডলের এইটিই নিকটতম নক্ষত্র। আমাদের গ্যালাক্সিতে সূর্যের নিকটতম প্রতিবেশি। একে সাদা-চোখে দেখা যায় না।

4 (পৃঃ ৭) **আলোকবর্ষ**- আলোকতরঙ্গ (বা বেতার-তরঙ্গ) এক বছরে যতটা দূরত্বে যায়। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার। ঐ প্রচণ্ড গতিতে এক বছর সময়ে আলোক-তরঙ্গ, বা বেতার তরঙ্গ যে দূরত্বে যায় সেটাই এক 'আলোকবর্ষ'। এটা দৈর্ঘ্যের মাপ। মাইলের হিসাবে ছয়ের পর বারোটা শূন্য বসালে যতটা দূরত্ব হয় প্রায় ততটা। এতেও কিছু ধারণা হল না, তাই নয় ? বরং বলি, আলোক-তরঙ্গ প্রতি-সেকেণ্ডে বার-সাতেক পৃথিবীকে বেষ্টন করে আসতে পারে বিষুবরেখা বরাবর। সূর্য থেকে পৃথিবীতে ঐ আলোক-তরঙ্গ আসতে সময় লাগে মাত্র আট মিনিট।

5. (পৃঃ ৭) **জুল ভের্ন**—ফরাসী সাহিত্যিক (1825-1905) সায়েন্স ফিকশান রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এঁর অনেক বই বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।

6. (পৃঃ ৭, **লিণ্ডবার্গ**—কর্ণেল চার্লস লিণ্ডবার্গ (1902-1974) ছিলেন এক দুঃসাহসিক মার্কিন বৈমানিক। 1927 সালে একটি প্লেন নিয়ে তিনি একা অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে বিশ্ব রেকর্ড করেন।

7. (পৃঃ ৮) **ডুবোজাহাজের জানলা**—স্থানাভাবে বিভিন্ন দৃশ্য একই ছবিতে আঁকতে বাধ্য হওয়ায় একই স্কেলে আঁকিনি কিন্তু। অর্থাৎ মানুষের দেহের তুলনায় জায়েণ্ট স্কুইড অনেক বড় আর সামুদ্রিক প্রাণী নটিলাস অনেক ছোট।

8. (পৃঃ ৮) **মহীসোপান**—সমুদ্র উপকূল থেকে প্রথম কয়েক শ কি. মি. পর্যন্ত সমুদ্রের গভীরতা খুব ধীরে ধীরে বাড়ে। দীঘা বা পুরীতে স্নান করতে গিয়ে এটা হয়তো তোমরা লক্ষ্য করেছ। কয়েক কিলোমিটার বা কয়েক শ কি.মি. পর্যন্ত এমনি অল্প ঢাল থাকে। তারপর হঠাৎ প্রায় যেন খাড়া-পাড়ের মতো গভীরতা অল্প দূরত্বে দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

উপকূলের নিকটবর্তী ঐ স্বল্প গভীরতার ধাপটাকে বলে 'মহীসোপান' ; ইংরাজিতে continental shelf.

9. (পৃ, ৯) **জায়েণ্ট ক্ল্যাম**—রাক্ষুসে ঝিনুক। আকারে প্রকাণ্ড হয়। ছবিতে জায়েণ্ট-ক্ল্যামটা যে ভাবে ডুবুরির হাত কামড়ে ধরেছে, তাতে বিনা সাহায্যে তার মুক্তি পাওয়া মুশকিল। কারণ ওদের কামড়ের জোরও মোক্ষম।

10. (পৃঃ ১৩) **আকাশগঙ্গা** – ইংরাজিতে বলে, milky way। আকাশে মাঝে মাঝে দেখা যায়, যেন একটা তারার নদী এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। তাকেই বলে 'আকাশগঙ্গা'। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা দেবার চেষ্টা করি—আমাদের নক্ষত্রজগৎ যেন মুখো-মুখি লাগানো দুটি গাম্‌লার মতো। আমাদের নক্ষত্র-জগতের সব নক্ষত্রই আছে ঐ গাম্‌লার ভিতর। এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে তার দৈর্ঘ্য প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ। আমাদের সৌরমণ্ডল আছে তার এক ধারে, যেমন দেখানো হয়েছে ছবিতে। যেহেতু পৃথিবী আছে ঐ সৌরমণ্ডলে, তাই যখন আমরা ঐ নক্ষত্রজগতের কেন্দ্রের দিকে তাকাই তখন নক্ষত্রগুলিকে ঘননিবদ্ধ অবস্থায় দেখতে পাই। তাকেই বলি আকাশগঙ্গা।



আমাদের নক্ষত্রজগৎ

11. (পৃঃ ১৩) **নক্ষত্রজগৎ**—যার ইংরাজি নাম galaxy। মহাশূন্যে নক্ষত্রগুলি যেন ঝাঁক বেঁধে থাকে। এক-একটা ঝাঁককে বলে এক-একটি নক্ষত্রজগৎ বা গ্যালাক্সি। আমাদের নক্ষত্রজগতের চেহারার কথা এখনি বলেছি। সবাই কিন্তু সে রকম নয়। এক একটির চেহারা এক এক রকম। দুটি নক্ষত্রজগতের মাঝখানে বিরাট ফাঁক। একটা তুলনা দিলে ব্যাপারটা হয়তো বোঝা যাবে। যেন বিরাট প্রান্তরের মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন গ্রাম। এখানে ঐ বিরাট প্রান্তরটা হচ্ছে মহাশূন্য। প্রতিটি গ্রাম হচ্ছে এক-একটি নক্ষত্র জগৎ। আবার প্রতিটি গ্রামের এক-একটি বাড়ি যেন এক-একটি নক্ষত্র। আরও বলতে পারি, প্রতিটি বাড়িতে যে চার-পাঁচটি ঘর তারা যেন সেই নক্ষত্রের বিভিন্ন গ্রহ। যেন 'সূর্য' নামক নক্ষত্র হচ্ছে নয়-কামরার বাড়ি। সবচেয়ে বড় 'ড্রইং-কাম-ডাইনিং হলটা হচ্ছে বৃহস্পতি গ্রহ। আর পুঁচকে পৃথিবী হচ্ছে—রুম নম্বর থ্রি!

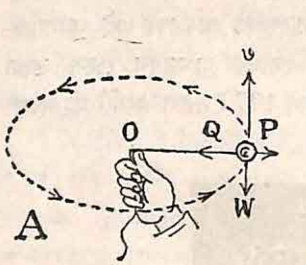
12. (পৃঃ ১৩) **পাইওনিয়ার টেন**—বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, সৌরজগতে না থাকলেও আমাদের এই গ্যালাক্সিতেই আছে বুদ্ধিমান জীব—হয়তো আমাদের চেয়ে তারা বিজ্ঞানে আরও অগ্রসর। তাই 1972 সালে একটি মহাকাশযানকে আকাশগঙ্গার দিকে, অর্থাৎ নক্ষত্র-জগতের কেন্দ্রের দিকে পাঠানো হয়েছে। তাতে নানান সঙ্কেত-চিহ্ন আছে, নানান বার্তা আছে—মানুষের (পুরুষ-স্ত্রীর) ছবিও আছে। বিজ্ঞানীদের আশা—ঐ অঞ্চলে কোন বুদ্ধিমান জীব থাকলে তারা আমাদের আমন্ত্রণলিপি পাবে। এতদিনে (1985) ঐ মহাকাশযান—পাইওনিয়ার টেন—সৌরমণ্ডলের দূরতম গ্রহ প্লুটোর এলাকাও পার হয়ে গেছে। এখনো তার পাঠানো বেতারবার্তা আমরা শুনতে পাচ্ছি। হয়তো তার সঙ্কেতবার্তায় আমরা অচিরেই জানতে পারব, প্লুটোর কাছাকাছি বা পিছনে আর কোন সৌরগ্রহ (planet X) আছে কি না!

13. (পৃঃ ১৩)—**নীল্‌স্ বোহ্‌র** : দিনেমার পণ্ডিত (1885-1962)। এ বছর তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উৎযাপিত হচ্ছে। নোব্‌ল-লরিয়েট অধ্যাপক বোহ্‌র পরমাণুর গঠন

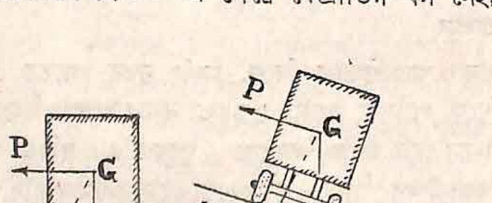
সম্বন্ধে মৌলিক কাজ করেন।

14. (পৃঃ ১৫) **আপেক্ষিক গতি** বা **relative velocity**—আমাদের গাড়ির বেগ ছিল ঘণ্টায় 50 কি. মি., আলোকবিন্দুগুলির উল্টোদিকে সরে যাবার গতিবেগ ঘণ্টায় 100 কি.মি.। ফলে গাড়ীর ভিতরে বসে যাত্রীর মনে হবে, তার নিজস্ব গতি ঘণ্টায় 150 কি.মি. ; কারণ তার ধারণায় মহাকাশের ঐ জ্যোতিষ্কগুলি মোটামুটি স্থির।

15. (পৃঃ ১৫) **কেন্দ্রাতিগ বল** (centrifugal force) একটা ঢিলে দড়ি বেঁধে আমরা যদি মাথার উপর ঘোরাই (চিত্র-A) তখন ঐ ঢিলটির উপর তিনটি 'বল' (force) কাজ করে। এক নম্বর, ঘূর্ণনের জন্য একটা কেন্দ্রাতিগ বল (centrifugal force —P) সেটা বাইরের দিকে। দু-নম্বর, দড়িতে টান পড়ায় একটা কেন্দ্রাভিমুখী কেন্দ্রাভিগ বল (centripetal force– Q)। তিন নম্বর, ঢিলটার নিজস্ব ওজন, পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে (W)। এই তিনটি বলের সম্মিলিত ফলে ঢিলটা শুধু বাঁই-বাঁই পাক খায়।



তেমনি যখন একটা চাকাওয়ালা গাড়ি চক্রাকার পথে চলে তখন তার উপর দুটি 'বল' কার্যকরী হয়। তার ওজন W ; আর কেন্দ্রাতিগ বল P। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রাভিগ বল নেই,



কারণ গাড়িটা কেন্দ্রের দিকে দড়ি দিয়ে টেনে বাঁধা নেই। এক্ষেত্রে ঐ দুটি বল, P এবং W-র মিলিত লব্ধিফল (resultant force) যদি হয় R, তাহলে আমাদের দেখতে হবে—R বল-রেখা কোথায় ভূমিকে স্পর্শ করছে। ভূমির (base-এর) বাইরে যদি **R** ভূস্পর্শ করে তাহলে গাড়িটা উল্টে যাবে। যেমন দেখছি চিত্র B-তে। এখানে G হচ্ছে ভরবিন্দু (C.G)। এজন্য বাঁকের মুখে একটু উঁচু করে দেওয়া হয়। রোড-ইঞ্জিনিয়াররা তাকে বলেন—**superelevation**। যেমন দেখা যাচ্ছে চিত্র C-তে। এখানে P এবং W-র লব্ধিফল R ভূমি (**base**)-র ভিতরেই ভূ-স্পর্শ করছে। ফলে গাড়ি উল্টে যাবে না।

16. (পৃঃ ১৫) **ডক্টর মার্শ'য়ান আই প্রিজিউম**—রসিকতাটার মর্মোদ্ধার করতে হলে তোমাদের একটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা জানতে হবে—বিখ্যাত ভূ-পর্যটক বিজ্ঞানী ডঃ ডেভিড লিভিংস্টোন (1813-73 (আফ্রিকার গভীর অরণ্যে অভিযান করতে গিয়ে একবার না-পাত্তা হয়ে যান। নিউ ইয়র্ক হেরল্ডের ব্যবস্থাপনায় স্যার স্ট্যান্‌লি



(1841-1904)তাঁকে খুঁজতে বের হন। দীর্ঘদিন অনুসন্ধানের পরে আফ্রিকার গভীর অরণ্যে তিনি অগ্রজপ্রতিম বৈজ্ঞানিকের সাক্ষাৎ পান (10. 11. 1871)। স্ট্যান্‌লি ইতিপূর্বে লিভিংস্টোনকে কখনো দেখেননি। কিন্তু সেই কালো কাফ্রী-দের গ্রামে শ্বেতকায় মানুষটাকে দেখামাত্র চিনতে পারেন। মিতভাষী ইংরাজের ভদ্রতায় বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে স্যার স্ট্যান্‌লি নাকি করমর্দনের জন্য হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "**Dr. Livingstone, I presume ?**"

এখানে সেই ঐতিহাসিক রসিকতাটির ইঙ্গিত ! মিকি-

মাউস তো মঙ্গলগ্রহের জীবদের কখনো চাক্ষুষ দেখেনি! কিন্তু দর্শনমাত্র বুঝে নিয়েছে, আগন্তুক দুজন 'মার্শিয়ান' কর্তা-গিন্নি! বলাবাহুল্য, এ চিত্র শিল্পীর কল্পনা। মঙ্গলে ও জাতীয়—শুধু ও জাতীয়ই বা কেন, কোন জীব নেই।

17. (পৃঃ ১৭) **জিওলজিক্যাল এজ**—আমাদের পৃথিবীর প্রায় পাঁচ শ' কোটি বছরের ভিতর মাত্র ষাট কোটি বছর সম্বন্ধে ভূতাত্ত্বিকেরা মোটামুটি ধারণা করতে পারেন। তাঁরা এই সময়কালকে বিভিন্ন যুগে ভাগ করেছেন। ডিজ্‌নেল্যাণ্ডে যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পটভূমি তা প্রধানত জুরেসিক যুগ এর। প্রায় আঠারো-বিশ কোটি বছর আগে তার আবির্ভাব, আর চলেছিল সাড়ে-চার কোটি বছর ধরে। কিছুটা আছে ক্রিটেশিয়ান যুগের প্রতিচ্ছবি, যা সাড়ে তের কোটি বছর আগে শুরু হয়েছিল এবং চলেছিল সাড়ে-ছয় কোটি বছর। এ দুটি যুগকে যৌথভাবে অতিকায় ডাইনসরদের যুগ বলা যায়। ক্রিটেশিয়ান যুগের মাঝামাঝি বিবর্তনের পথে প্রথম স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব।

মেইনস্ট্রীট ইউ. এস. এ. :

1. (পৃঃ ২১) **চার্লস ডারউইন** (1809–82)—বিশ্ববিশ্রুত জীববিজ্ঞানী। Evolution বা বিবর্তনবাদের প্রবক্তা। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বইটির নাম—The Origin of Species by Means of Natural Selections (1859)।

অ্যাড্‌ভেঞ্চারল্যাণ্ড :

1. (পৃঃ ২৭) **মার্কো পোলো** (1254—1324)—প্রখ্যাত ভেনিশীয় ভূ-পর্যটক। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মধ্য-এশিয়া ও চীন পরিভ্রমণ করেন। বাগদাদ, খোরাসান, পামীর, খোটান হয়ে তিনি মঙ্গোলিয়ায় চীন-সম্রাট কুবলাই খাঁ-র দরবারে উপস্থিত হন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তের মাধ্যমেই ইউরোপীয়-সভ্যতা এশিয়ার কথা ভাল ভাবে জানতে পারে।

2. (পৃঃ ২৭) **লিভিনস্টোন**—ভূপর্যটক। এঁর কথা আগেই বলেছি তোমাদের।

3. (পৃঃ ২৭) **কলম্বাস** (1461—1506)—পঞ্চদশ শতকে প্রায় শওয়া শ' অভিযাত্রীকে নিয়ে ইনি অতলান্তিক পার হয়ে নৌপথে ইয়োরোপ থেকে রওনা হন। পশ্চিমমুখো। উদ্দেশ্য—ভারতে পৌঁছানো। পৃথিবীটা যে গোল তা তার আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। উনি পৌঁছান ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দ্বীপে। তাঁকেই বলা হয় আমেরিকার আবিষ্কারক।

4. (পৃঃ ২৭) **বিজয়সিংহ**—কিংবদন্তী বলে, ইনি তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে সমুদ্রযাত্রা করে সিংহলে পৌঁছান এবং দেশটা জয় করেন। কবি সত্যেন দত্তের 'আমরা' কবিতায় এঁকে বাঙালী বলা হয়েছে। তার স্বপক্ষে কোন ঐতিহাসিক যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

5. (পৃঃ ২৯) **জোহান ডেভিড ভীস্**—(Johan David Wyss) এবং তাঁর পুত্র রুডল্‌ফ্ (1781–1830) যৌথভাবে রচনা করেছিলেন—'দ্য সুইস্ ফ্যামিলি রবিনসন'।

নিউ-অর্লিন্স স্কোয়ার :

1. (পৃঃ ৩২) **টলস্টয়** (1828—1910)—কাউণ্ট লিয় টলস্টয় রাশিয়ান লেখক। 'ওয়র অ্যাণ্ড পীস্', 'আনা কারেনিনা' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। তাঁর যে গ্রন্থটির প্রসঙ্গ এখানে তোলা হয়েছে, তার নাম: 'শিল্প কাকে বলি?' (ইংরাজী অনুবাদে পাওয়া যায়—'What is Art?')

2. (পৃঃ ৩২) **'বেথেলহেম'-এর তারা**—যীশুখ্রীষ্ট যখন ঘোড়ার আস্তাবলে জন্মগ্রহণ করেন তখন তিনজন প্রাচ্য দেশীয় মহাজ্ঞানী তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসেন। তাঁরা নাকি পূর্বেই দৈববাণীতে জেনেছিলেন, প্রভু যীশু জন্মগ্রহণ করতে যাচ্ছেন। ঐ তিনজন মহাজ্ঞানীকে বলে 'ম্যাজাই' (Magi)। তাঁরা বেথেলহেম্ (প্যালেস্টাইনের যে পল্লী-প্রান্তে প্রভুর জন্ম, তার নাম)-এর উপর নৈশাকাশে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখতে পান। অন্ধকারে সেই তারা দেখে দেখেই ওঁরা পথ চিনে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হতে পেরেছিলেন। বড়দিনের সময় ঐ তারার প্রতীকটিকে গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবে হয়তো দেখে থাকবে।

3. (পৃঃ ৩৩) **আঙ্কল টমস্ কেবিন** বা 'টম্ কাকার কুটীর'—হ্যারিয়েট বীচার স্টো (1811—96) নামের একজন মার্কিন মহিলা ঔপন্যাসিকের এই গ্রন্থটি (1852) বিশ্ব-সাহিত্যের এক সম্পদ। গ্রন্থটি আমেরিকায় দাসপ্রথা উচ্ছেদে প্রেরণা জোগায়। ঠিক যেমন প্রায় সমকালে রচিত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' আমাদের দেশে নীলচাষীদের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে কাজ করে।

4. (পৃঃ ৩৩) **ডোরিক স্তম্ভ**—গ্রীক-স্থাপত্যের একটি বিশেষ শৈলী। অপর দুটি প্রখ্যাত শৈলীর নাম—আইওনিক

ও কোরিন্থিয়ান।

5. (পৃঃ ৩৩) **ক্ষুধিত পাষাণ**—রবীন্দ্রনাথের একটি অতি বিখ্যাত ছোট গল্প। কী বল্‌লে? দেখেছ? না ভাই, ওটা দেখলে হবে না, পড়তে হবে।

6. (পৃঃ ৩৫) **ক্যাটাকুম্ব্‌** (catacomb)—ভূগর্ভস্থ মৃতদেহের আবাসস্থল। খ্রীষ্টান ও ইহুদিরা এগুলি তৈরী করাতেন মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য।

7. (পৃঃ ৩৫) **রিয়াল ইমেজ**—আয়নাতে আমরা যে প্রতিবিম্ব দেখি, তা থেকে বাস্তবে কোন আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় না। বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়ে আমাদের চোখে ফিরে আসে। তাকে বলি, অসদ্‌বিম্ব (virtual image)। আর অবতল দর্পণ (concave mirror) অথবা উত্তল লেন্স (convex lense)-এর সাহায্যে যে প্রতিবিম্ব রচনা করা হয়, যেমন সিনেমার স্ক্রীনে অথবা ক্যামেরার ফিল্‌মে—তাকে বলি সদ্‌বিম্ব বা real image।

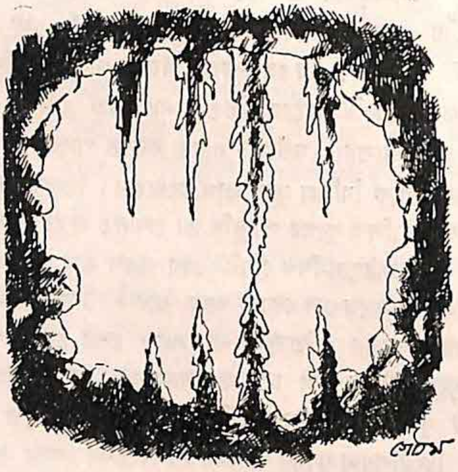
ফ্রণ্টিয়ার ল্যাণ্ড:

1. (পৃঃ ৩৬) **আবদুল গফ্‌ফুর খাঁ**—অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত মহাত্মা গান্ধীর প্রিয় শিষ্য। দীর্ঘকায় আবদুল গফ্‌ফুরের চলিত নাম – সীমান্ত গান্ধী। উনি এখন পাকিস্তানে থাকেন।

2. (পৃঃ ৩৬) **র‍্যাডক্লিফ**—ভারতবর্ষ বিভাগ করার আগে ইংরাজ-সরকার এঁকে ভারত-পাকিস্তান সীমানা নির্ধারণ করতে পাঠিয়েছিলেন।

3. (পৃঃ ৩৬) **ওয়াশিংটন ডি. সি.**—রাজধানী ছাড়াও আমেরিকায় ওয়াশিংটনের নামে একটি রাষ্ট্র বা State আছে। তাই রাজধানীর চৌহদ্দিকে বলা হয় 'ওয়াশিংটন, ডিস্ট্রিক্ট কলম্বিয়া,' বা সংক্ষেপে—ওয়াশিংটন ডি. সি.।

4. (পৃঃ ৩৮) **স্ট্যালাক্‌টাইট**—পাহাড়ী-গুহার ছাদে টপ্‌ টপ্‌ করে চুঁইয়ে-পড়া জলের সঙ্গে মিশ্রিত ক্যালশিয়াম কার্বোনেড পাহাড়ের গায়ে শত শত বছর ধরে জমতে থাকে। অবশেষে তা শঙ্কু (cone)-এর আকারে, অর্থাৎ কর্তিত মোচার আকারে ছাদ থেকে ঝুলতে থাকে। জলটা মেঝেতে যেখানে পড়ে সেখানেও অনুরূপ কাণ্ড ঘটে। অর্থাৎ ধীরে ধীরে ক্যালশিয়াম কার্বোনেড উই-ঢিবির মতো আকারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। উপর থেকে যেটি ঝোলে তাকে বলে 'স্ট্যালাক্‌টাইট', আর নিচে থেকে যেটা বাড়তে থাকে তাকে বলে 'স্ট্যালাক্‌মাইট'। কখনো কখনো প্রথমটা নিচের দিকে নামতে নামতে এবং দ্বিতীয়টা উপর দিকে উঠ্‌তে উঠ্‌তে পরস্পরকে ছুঁয়ে ফেলে। তখন তাকে একটা ডমরু-আকারের



স্তম্ভের মতো দেখতে হয়। ফ্রিজেডিয়ারে 'ডীপ-ফ্রীজ' চেম্বারে এ রকম উপর-থেকে-ঝুলন্ত 'আইসিকল্‌স্‌' থেকে থাকবে। বলা বাহুল্য, তা স্ট্যালেক্‌টাইট নয়, স্রেফ বরফের 'আইসিকল্‌স্‌'।

ফ্যাণ্টাসিল্যাণ্ড:

1. (পৃঃ ৪৪) **ভূত মরলে মার্বেল হয়**—এ তথ্যটা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (1847—1909) লেখা 'কঙ্কাবতী' গল্পে আছে।

2. (পৃঃ ৪৬) **কারারা মার্বেল**—ইতালীর বিখ্যাত শ্বেত মর্মর। এই সাদা মার্বেল পাথর দিয়েই 'ডেভিড, পীতা, মোজেস্‌' প্রভৃতি বানিয়েছিলেন মিকেলাঞ্জেলো।

3. (পৃঃ ৪৬) **গথিক স্টাইল**—দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে এই স্থাপত্য-শৈলী প্রচলিত ছিল। কলকাতায় বিড়লা তারামণ্ডলের পাশে সেণ্ট পল্‌স্‌ গীর্জা আর হাইকোর্ট এই স্থাপত্য-শৈলীতে নির্মিত।

4. (পৃঃ ৪৬) **গ্রিম ব্রাদার্স**—জ্যাকব আর উইলহেম দুই ভাই। জার্মান। শিশুসাহিত্য রচনায় তাঁরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁদের লেখা অনেক বই অনূদিত হয়েছে।

5. (পৃঃ ৪৮) **যোনহা**—বাইবেল-এর একটি চরিত্র। তাকে নাকি একটা তিমি আস্ত গিলে ফেলে। তিন দিন পরে তিমিটা যোনহাকে জ্যান্ত অবস্থায় উগরে দেয়। ডিজ্‌নে

তাই ঐ নামটা নিয়েছেন। বাস্তবে কিন্তু তিমি মানুষ খায় না, খেতে পারেই না। তার পেটের ভিতর বেঁচে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। অথচ এ বইয়ের সামনের দিকে দেখ, ডিজ্‌নে তাঁর ছবিতে ব্যাপারটা কী সুন্দর বিশ্বাসযোগ্য ভাবে উপস্থিত করেছেন!

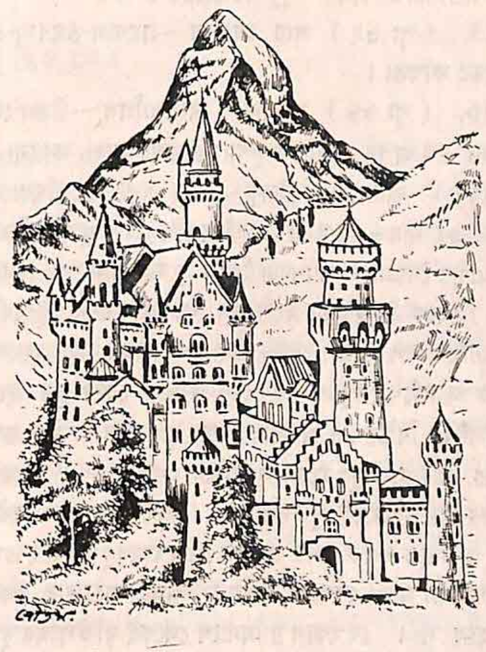
6. (পৃঃ ৫০) **নাইট** (knight)—মধ্যযুগে সম্ভ্রান্ত ঘরানা-ঘরের রাজপুরুষ। এঁরা হতেন যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, অসম সাহসী আর প্রভুর জন্য নিবেদিতপ্রাণ!

7. (পৃঃ ৫৪) **সোমনামফ্লায়ার**—শব্দটা কিন্তু অভিধান-সম্মত নয়, তা আগেই বলে রাখছি। ইংরাজী শব্দ 'Somnumbulist' শব্দটির আদলে এই শব্দটি তৈরী করা। ল্যাটিনে somnus মানে ঘুম, আর ambulate মানে হাঁটা। ফলে, somnumbulate মানে 'ঘুমের-মধ্যে-হাঁটা'। আমরা এখানে 'ধড়ে-মুড়ে-সন্ধি'র সুকুমারী-আইনে ল্যাটিন শব্দ 'somnus'-এর সঙ্গে ইংরাজি শব্দ 'fly'-কে জুড়ে এই শব্দটি পয়দা করেছি।

8. (পৃঃ ৫৮) **সাঙ্কোপাঞ্জা**—স্প্যানিশ লেখক Cervantes Saavendra (1547—1616) রচিত অমর-গ্রন্থ Don Quixote-এর একটি ব্যঙ্গ চরিত্র! সে ছিল নায়কের ভৃত্য।

9. (পৃঃ ৫৮) **মেহেরালি**—আগেই তো পড়তে বললাম! এখনো পড়া হয়নি? রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'? সেখানেই বর্ণনা আছে, পাগ্‌লা মেহেরালির সাবধান-বাণীর—তফাৎ যাও! সব ঝুট হ্যায়!

10. (পৃঃ ৫৯) **ম্যাটারহর্ন**—সুইজারল্যাণ্ডের একটি মনোমুগ্ধকর পর্বতশৃঙ্গ। আল্‌প্‌স্ পর্বতশ্রেণীর সর্বোচ্চশৃঙ্গ—বস্তুত গোটা ইউরোপের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মঁ-ব্লাঁ (Mont Blanc, উচ্চতা 4807 মি.) থেকে প্রায় শত-খানেক কি. মি. পূর্বে ম্যাটারহর্ন। ডিজ্‌নে ঐ পাহাড়কে পটভূমি করে একটি ছবি তৈরী করেছিলেন। তখনি বোধহয় ডিজ্‌নে ঐ ম্যাটার-হর্নকে ভালোবেসে ফেলেন। তাঁর স্বপ্নরাজ্যে গড়ে তোলেন ওর প্রতিমূর্তি। এখানে ছবিতে ব্যাভেরিয়ান স্থাপত্যশৈলীতে গড়া একটি প্রাচীন দুর্গের পশ্চাদ্‌পটে ঐ ম্যাটারহর্ন শৃঙ্গকে (4478 মি.) দেখা যাচ্ছে। ছবিটি একটা ফটো দেখে আঁকা। দুর্গের পশ্চাৎপটে আঁকা হয়েছে এই কারণে যে, ডিজ্‌নেল্যাণ্ডেও স্লিপিং-বিউটি দুর্গের পিছনে ম্যাটারহর্নকে ঠিক এই রকম দেখতে লাগে।



ম্যাটারহর্ন শৃঙ্গ

11. (পৃঃ ৫৯) **আইসিক্‌ল্‌স্** (icicles)—শীতের দেশে আবহাওয়া যখন শূন্য ডিগ্রির নিচে নেমে যায়, তখন বারান্দার প্রান্ত থেকে ঝরে পড়া জল কখনো কখনো জমে মোচাকৃতি শক্ত বরফের মতো ঝুলতে থাকে। ফ্রিজের ভিতর হয়তো তোমরা অনুরূপ ব্যাপার দেখেছ। অনেকটা ঐ 'স্ট্যালাকটাইট'-এর ছবিটার মতো।

12. (পৃঃ ৫৯) **ইয়াতি** (yati)—তুষার মানব। হিমালয়ের পাহাড়ীদের ধারণা—নির্জন তুষার-অঞ্চলে বাস করে এই দ্বিপদী বনমানুষের মতো জীব। তারা নাকি সোজা হয়ে মানুষের মতো হাঁটে, ডানে-বাঁয়ে মোড় ফেরে না; পথে কোন খাড়া পর্বতশৃঙ্গ পড়লে তাকে বেষ্টন করে না; সোজা পথে হেঁটে যায়। অনেক পর্বত-অভিযাত্রী ইয়াতির পায়ের ছাপের ফটো তুলে এনে দেখিয়েছেন। কিন্তু বিজ্ঞান এখনো ইয়াতির বাস্তব অস্তিত্ব মেনে নেয়নি।

13. (পৃঃ ৬০) **কঙ্কাবতী**—আগেই বলেছি, ত্রৈলোক্য-নাথের লেখা একটি অপূর্ব বই। আমরা ছেলেবেলায় পড়তুম। তোমরা পড়েছ কি?

14. (পৃঃ ৬০) হ-য-ব-র-ল—এর পরিচয় নিশ্চয়ই দিতে হবে না। তোমরাও পড়েছ, আমরাও পড়েছি, তোমাদের নাতি-নাতনিরাও পড়বে—সুকুমার রায়ের কল্প-গল্প!

15. (পৃঃ ৬২) আয় যেখানে—আবোল-তাবোল-এর মুখবন্ধের কবিতা।

16. (পৃঃ ৬৪) অরোরা বোরিওলিস্—উত্তর-মেরু অঞ্চলের এক অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। প্রায়শই সাদা, কখনো বা বিচিত্রবর্ণা। আকাশে ঝিলিক্ দিয়ে ওঠে। দক্ষিণমেরু অঞ্চলে এর নাম—'অরোরা অস্ট্রেলিওসিস্'। খুদে পণ্ডিত-দের এবার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা দিইঃ সূর্যের সান-স্পট (sun-spot) থেকে বিচ্ছুরিত ইলেকট্রন কণিকা যখন পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসে, তখন উত্তর ও দক্ষিণ মেরু-অঞ্চলের চৌম্বক আকর্ষণে সেগুলি দুই মেরু-অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়। সেগুলিই ঐ বিচিত্রবর্ণা আলোকগুচ্ছের রূপ নেয়। মনে রাখা দরকার, এটি রামধনুর মতো সূর্যরশ্মির বর্ণালী নয়। রামধনু দর্শকের আপেক্ষিকেই শুধু দৃশ্যমান। অর্থাৎ পাঁচ-দশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত দর্শকদলের একদল যখন রামধনু দেখছে তখন অপরদল তা নাও দেখতে পারে। অথচ অরোরার ক্ষেত্রে তা হবে না। যে-কোন দ্রাঘিমাংশ থেকেই দৃষ্টিপথের দূরত্ব অতিক্রম না করলে সকলেই ঐ বর্ণবৈচিত্র দেখতে পাবে।

17. (পৃঃ ৬৪) মধ্যরাত্রির সূর্য (midnight-sun) পৃথিবীর মেরুদণ্ড যে-হেতু সূর্য-প্রদক্ষিণ পথের সঙ্গে $23\frac{1}{2}°$ বেঁকে আছে, তাই মেরু-অঞ্চলে দিন-রাত্রির সময়কালের ব্যবধান বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা হয় যে, জুন মাসের শেষাশেষি উত্তরমেরুতে এবং ডিসেম্বরের শেষাশেষি দক্ষিণমেরুতে—মানে ঐ ঐ স্থানের গ্রীষ্মকালের চূড়ান্ত পর্যায়ে, মধ্যরাত্রেও আকাশে সূর্য দেখা যায়। যেন রঙিন চাঁদের মতো ম্লান। তাকেই বলে—'মধ্যরাত্রির সূর্য'।

18. (পৃঃ ৬৪) ইগ্‌লু (igloo)—চাপ-চাপ বরফের ব্লক দিয়ে বানানো এস্কিমোদের বাড়ি। যদিও বরফের, তবু শীতকালে আরামপ্রদ। কারণ বাইরে আবহাওয়া যখন শূন্য ডিগ্রির অনেক নিচে, আর বাইরে চলছে তুষার ঝটিকা তখন বরফ-বাড়ির ভিতরে উত্তাপ শূন্য ডিগ্রির কাছাকাছি।

19. (পৃঃ ৬৫) গাইসা (geisha)—জাপানী নর্তকী। এরা নানান বিদ্যায় পারদর্শিনী। সাহিত্য-কাব্য, নাচ-গান, রঙ্গ রসিকতায় অতিথিকে আনন্দদান করে।

20. (পৃঃ ৬৫) সাম-ওয়াক্তের নামাজ—সন্ধ্যাকালে মস্‌জিদ থেকে ভেসে-আসা আজানধ্বনি।

21. (পৃঃ ৬৫) কিলিমাঞ্জেরো—আফ্রিকার টাঙ্গানাইকা অঞ্চলের একটি চির-তুষার-মৌলী পর্বতশৃঙ্গ। এই পাহাড় নিয়েই হেমিংওয়ের গ্রন্থ—Snows of Kilimanjero.

22. (পৃঃ ৬৬) অ্যাণ্ডিজ—দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত, উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি পর্বত শ্রেণী।



পরিশিষ্ট—খ

॥ ওয়াল্টার এলিয়াস্ ডিজ্‌নে ॥

পিতৃদত্ত নামের আদ্য-অক্ষরগুলি দিয়ে যে শব্দটা তৈরী করা যায়, তা হল W. E. D। অভিধান বলছেন, Wed একটি ক্রিয়াপদ, যার সরল অর্থ বিবাহিত হওয়া এবং তির্যক অর্থ—কোন লক্ষ্য বা সংকল্পে অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ থাকা [firmly attached to a pursuit or pledge]

দুটি অর্থেই ওয়াল্ট এলিয়াস্ ডিজ্‌নে সার্থকনামা !

যে হলিউডে 'ডিভোর্স' নরনারীর জীবনে একটা নিতান্ত সাধারণ ঘটনা —বারে বারে ঘুরে-ফিরে আসে, সেই হলিউডে যৌবনকাল থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ওয়াল্ট-ডিজ্‌নে একপত্নী নিয়ে ঘর করেছেন এবং দ্বিতীয় অর্থে W. E. D. was wedded to ecstasy—'ওয়েড' ছিলেন লক্ষ্য-ভেদী অর্জুনের মতো স্থিরদৃষ্টি—সে লক্ষ্য : আনন্দ।

জন্ম 1901 খ্রীষ্টাব্দে। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে। শিকাগোতে। ওঁরা পাঁচ ভাই-বোন—হার্বাট, রেমণ্ড, রয়, রুথ আর কনিষ্ঠতম—ওয়াল্ট। তার ভিতর 'সেজদা', রয়-এর সঙ্গেই ওঁর আজীবন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

শহুরে জীবন পছন্দ না হওয়ায় ওঁর বাবা এলিয়াস একটি গ্রামে খামারবাড়ি তৈরী করে চাষবাস, আর পশুপালনে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাই ওয়াল্টের জীবনের প্রথম সাতটা বছর কেটেছে সেই খোলা-মেলা প্রকৃতির কোলে, পোষা জীব-জন্তুদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে।

কাছে-পিঠে ইস্কুল নেই। অক্ষর পরিচয় হল মা 'ফ্লোরা'-র কাছে। কিন্তু ওয়াল্টের মন পড়ে থাকত—খামার-বাড়ির পোষা জীবজন্তুগুলোর দিকে—টাট্টুঘোড়া, গরু, ভেড়া, ছাগল, শুয়োর, হাঁস-মুরগীদের দিকে। বোধকরি ওঁর স্কেচ-খাতার সেই খোকা-খরগোশের মত বারে বারে উনি নিজেও বলতেন, 'মা ! পড়া তৈরী হয়ে গেছে, এবার খেল্‌তে যাই ?'

এছাড়া ছিল মুক্ত প্রকৃতির হাতছানি। কত কত বন্য প্রাণী—হরিণ, স্কাংক, বীভার, খরগোশ, শেয়াল, কাঠবিড়ালী আর পাখি-পাখি-পাখি ! যেন 'টিকিটিকি'-র আসর ! পড়াশুনা বিশেষ হয় না। কিন্তু ছবি আঁকায় দারুণ হাত ! নিতান্ত ছেলেবেলা থেকেই। দিবারাত্র ছবি আঁকত ওয়াল্ট।

ওর বয়স যখন সাত বছর, তখন ওর বাবা খামারবাড়ির সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে শহরে চলে আসতে বাধ্য হলেন। সেদিন কান্নায় বুক ভাসিয়েছিল বাচ্চা ছেলেটা ! ওর আদরের পোষা জীব-জন্তু সব স—ব বিক্রি হয়ে গেল।

এবার ওর বাবা কানসাস্-সিটি শহরে একটি খবরের কাগজের ডিলারশিপের কাজ নিলেন। রাত তিনটেয় তিনি প্রতিদিন ঘুম থেকে টেনে তুলতেন রয় আর ওয়াল্টকে। দু-ভাই দুটি সাইকেল নিয়ে বাড়ি-বাড়ি কাগজ বিলি করে আসত সেই ভোর রাত্রে। কিন্তু এ ব্যবসাও বেশিদিন চল্‌ল না। এলিয়াস সপরিবারে আবার ফিরে এলেন শিকাগোতে। চাকরি নিলেন একটি কারখানায়। এই প্রথম, আট বছর বয়সে, ওয়াল্ট ভর্তি হল স্কুলে। কিন্তু ওর পড়াশুনা হল না। মাত্র বছর-খানেকের মধ্যেই স্কুল থেকে তাকে ছাড়িয়ে আনা হল। বোধকরি অর্থাভাবে !

ওয়াল্ট তারপর তার পকেট-মানির সঞ্চয় থেকে ভর্তি হল শিকাগো ফাইন-আর্টস্ আকাদেমীর একটি নৈশ-বিদ্যালয়ে। সপ্তাহে তিন দিন যেত রাত্রের ক্লাসে 'কার্টুন-আঁকা' শিখতে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হল, তখন ওর বয়স সতের। এই প্রথম চাকরি নিল। কাজটা ভাল ; 'রেডক্রস'-এ অ্যাম্বুলেন্স-ড্রাইভারের চাকরি। ঐ সুবাদে তাকে যেতে হল যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ফ্রান্সে। সেই তার প্রথম বিদেশ যাত্রা। ফিরে এল বছরখানেক বাদে। তখন তার সঞ্চয় প্রায় ছয় শ' ডলার। আমেরিকায় ফিরে এসে কাজ পেল একটা বিজ্ঞাপন-সংস্থায়। ছবি-আঁকার চাকরি। মাসে পঞ্চাশ ডলার মাহিনা। এখানেই ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব হল উব্-এর (Ub Iwerks)—যে হয়েছিল তাঁর আজীবনের সঙ্গী। সেও আর্টিস্ট—কার্টুন-আঁকায় দড়।

সিনেমা-শিল্প তখন 'হাঁটি-হাঁটি পা-পা' যুগে। Animated picture বা হাতে-আঁকা কার্টুন ছবি তখনো বাজারে আসেনি। ডিজ্‌নেই বস্তুত তার আবিষ্কারক। উনি প্রথম পরীক্ষা করেছিলেন একটি ফুটবল 'কিক-করা' নিয়ে।

পায়ের বিভিন্ন অবস্থার কুড়িখানা ছবি এঁকে, ফটো তুলে, পরপর সাজিয়ে যেই দেওয়ালে প্রজেক্ট করলেন অমনি ধাঁই করে বলটা 'কিক্‌ড্' হয়ে গেল। দুই বন্ধু, ওয়াল্ট আর উব্ আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে। দুজনেই বুঝতে পারে, কী প্রচণ্ড সম্ভাবনাময় আবিষ্কার করে বসেছে ওরা দুজন।

দুজনে একটি ছোট্ট কোম্পানি খুলে বসল। নাম দিল : 'লাফ-ও-গ্রাম্‌স্ ইনকরপোরেশন' (Laugh-O-Gram Inc.)।

ওদের প্রথম ছবি সাত মিনিটের—'রেড রাইডিং হুড'। তারপর 'পুশ্ ইন দ্য বুট্‌স্' আর 'জ্যাক অ্যাণ্ড দ্য বীনস্টক'। পাঁচ-সাত মিনিটের কার্টুন-ছবি। কিন্তু সেজন্য ওদের আঁকতে হয়েছে কয়েক হাজার ছবি।

নিউ ইয়র্কের কয়েকজন ডিস্ট্রিবুটারকে ছবিগুলি দেখানো হল। অধিকাংশই নির্লিপ্ত ; একজন রাজী হল কিনতে। ছবিগুলির সম্ভাবনা তো জানা নেই, তাই শর্ত হল, যদি ছয়মাস কাল চলে তবেই ওরা পাবে ছবি পিছু চার হাজার ডলার করে। চার—হাজার ডলার! সে তো অনেক-অনেক ডলার! দু বন্ধু খুশিতে ডগমগ!

কিন্তু বাস্তবে ফল হল উল্টোরকম। ছয় মাস অপেক্ষা করার মত অবস্থা ওদের নয়! দেনার দায়ে 'লাফ-ও-গ্রাম' কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গেল! ছয়মাস পরে টাকাটা নেবে কে? কোম্পানি তো নেই! ফলে কিছুই পেল না ওরা!

এরপর ওয়াল্ট তৈরী করে আর একখানি ছবি, 'অ্যালিস্ ইন কার্টুনল্যাণ্ড'। খুবই প্রশংসা হল ; কিন্তু লোকসান গেল।

1923-এ ওয়াল্টের জীবনে ঘটে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ও স্থির করল, সিনেমা করতে হলে ওকে হলিউডে যেতে হবে। যে কথা সেই কাজ! একটা আধভাঙা সুটকেস, পকেটে গোনাগুন্তি চল্লিশ ডলার আর বুক-ভরা আশা নিয়ে ওয়াল্ট চলে এল হলিউডে।

ভাড়া নিল একটা মটোর-গ্যারেজ। সেটাই ওর মাথা-গোঁজার আশ্রয়, ল্যাবরেটারী তথা স্টুডিও। সেজদা, রয় কিছু অর্থ সাহায্য করল ; আর দু-নম্বর পাগল উব্ এসে জুটল।

তখন ওদের কর্মীসংখ্যা মাত্র দশজন।

তার ভিতর ছিল একটি কিশোরী। ফুটফুটে দেখতে, একমাথা ঘনকালো চুল—যা আমেরিকায় দুর্লভ ; ঘন নীল স্বপ্নালু দুটি চোখ। সে ছিল কোম্পানীর স্টেনোগ্রাফার। ছিপছিপে সুন্দরী লিলিয়ান। অফিস ছুটির পরেও সে ওদের সাহায্য করত। ওভারটাইম নেই জেনেও।

একদিন সেজদা, রয় এসে ওয়াল্টকে জনান্তিকে বললে, একটা ব্যাপার হয়েছে, লিলিয়ানকে পর পর তিন হপ্তায় যে 'চেক' দিয়েছি, ও তা ক্যাশ করেনি!

—কেন?—জানতে চাইল ওয়াল্ট।

—যীসাস্ জানেন! তুই জিজ্ঞাসা করে দেখিস্ তো।

ওয়াল্ট সেদিন ছুটির পরে মেয়েটিকে প্রশ্ন করল সেই মর্মে। লিলিয়ান বললে, তোমাদের এখন খুব টানাটানি চলছে তো...মানে, ইয়ে...আমার চলে যাচ্ছে...

—তাই বলে তুমি তোমার পারিশ্রমিক নেবে না?

মেয়েটি চোখ নিচু করে হাসল!

এই মেয়েটিকেই ওয়াল্ট ডিজ্‌নে বিবাহ করেছিলেন। তখনো তিনি নিতান্ত অখ্যাত। তা হোক, লিলিয়ান ওর চোখের দৃষ্টিতে দেখেছিল অসীম সম্ভাবনা। মিসেস্ লিলিয়ান ডিজ্‌নে ওঁর আজীবনের সহকর্মী ও ধর্মপত্নী।

এরপর ওয়াল্ট তৈরী করল একপ্রস্থ ছবি। তার নায়ক 'অস্‌ওয়াল্ড', একটি হাসিখুশি পুঁচকে খরগোশ। প্রথম ছবি—'অস্‌ওয়াল্ড, দ্য লাকি র‍্যাবিট্'।

নিউ-ইয়র্কের এক ধুরন্ধর ফিল্‌ম ডিস্ট্রিব্যুটার উৎসাহ দেখালো। ওয়াল্ট চুক্তিবদ্ধ হল ঐ ফিল্‌ম কোম্পানীর ম্যানেজার চার্লস্ মিন্টজ্-এর সঙ্গে।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ওয়াল্ট বুঝতে পারল, তার আইনজ্ঞানের অভাবের সুযোগে ঐ ম্যানেজার ভদ্রলোক ওকে ফাঁকি দিয়ে অস্‌ওয়াল্ডের কপিরাইট হাতিয়ে নিয়েছে।

এমন অবস্থায় কে না ভেঙে পড়ে? উব্ তার মাথার চুল ছিঁড়তে বসে, লিলি মর্মাহতা। কিন্তু ওয়াল্টের উৎসাহ অদম্য। বললে, আরে, তোমরা এমন করছ কেন? আমার মাথা, চোখ আর হাতজোড়ার কপিরাইট তো বেহাৎ হয়নি!

ষোলই মার্চ 1928 তারিখে ওয়াল্ট নিউ ইয়র্ক থেকে ট্রেনে চেপে সস্ত্রীক ফিরে চলল লস্ অ্যাঞ্জেলেস্-এ, মানে হলিউডের সেই গ্যারেজ-বাসায়। দীর্ঘ ট্রেন যাত্রা, আমেরিকার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। ঐ রেলগাড়ির কামরাতে বসেই ডিজ্‌নের মাথায় 'মিকি-মাউস'-এর পরিকল্পনা প্রথম আসে।

এখানে তোমাদের একটা কৈফিয়ৎ দিতে হবে। এখন আমি ওয়াল্ট ডিজ্‌নের জীবনী লিখছি। তথ্য-নির্ভর সত্য ঘটনা। এর আগে মিকি-মাউস্-এর জন্মকথা যেটা বলেছি, সেটা ওঁর নামে প্রচলিত গল্প মাত্র। বাস্তবে মিকি-মাউস্-এর পরিকল্পনা উনি ট্রেনের কামরাতেই করেন, আর মিনি-মাউস্-

এর পরিকল্পনাটা লিলিয়ানের। স্ত্রীর অনুরোধেই ওয়াল্ট মিনি-মাউস্‌কে ঢুকেন। মিকির সঙ্গী হিসাবে।

হলিউডে পৌঁছেই শুরু হয়ে গেল নতুন কাজ। মিকি-মিনির ছবি। সময়টা বুঝে নেওয়া দরকার —

আগের বছর 1927-এ সিনেমায় মানুষের কণ্ঠস্বর প্রথম শোনা গেছে। অর্থাৎ প্রথম সবাক চিত্র : The Jazz Singer। পরের বছর জুলাই মাসে নিউ-ইয়র্কে মুক্তি পেয়েছে প্রথম পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের সবাক চলচ্চিত্র—'লাইট্‌স্ অব নিউ ইয়র্ক'।

প্রায় সমকালেই ওয়াল্ট বানিয়ে ফেল্‌ল তার প্রথম পূর্ণ-সবাক কার্টুন ছবি—'স্টীম বোট উইলি' (Steamboat Willie)। তার নায়ক হচ্ছে মিকি-মাউস্। মিকির কণ্ঠস্বর স্বয়ং ওয়াল্টের। পর পর আঠারোখানা ছবিতে ওয়াল্ট ডিজ্‌নে মিকির চরিত্রে কণ্ঠস্বর দিয়েছেন।

মুক্তি পাওয়া মাত্র ছবিটি দারুণ সাড়া জাগালো। এ সময় ওয়াল্ট দৈনিক প্রায় হাজারখানা চিঠি পেতেন, সারা বিশ্বের মিকি-ফ্যানদের কাছ থেকে। মিকি-মাউসেরও রাতারাতি শতনাম হয়ে গেল—

ইতালী রাখিল নাম—'টোপোলিনো'-ভাই।
'মিকি-কুচি' নাম রাখে জাপানে সবাই ॥

মায়, মাদাম তুসোঁর প্রদর্শনীশালায় বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তিদের মাঝখানে স্থান পেল—মিকি-মিনি।

1932-এ কে. ক্যামেন নামে এক ধুরন্ধর ইম্প্রেশারিও এসে ওয়াল্ট-এর সঙ্গে প্রচার বিষয়ে একটি চুক্তি করলেন। আশাতিরিক্ত ফল হল তাতে। মিকি-মিনির বিশ্ববিখ্যাত হতে যেটুকু বাকি ছিল, তাও হয়ে গেল রাতারাতি।

তার আগের বছর 1931-এ মুক্তি পেয়েছে ওঁর প্রথম টেক্‌নিকালার কার্টুন ছবি—'দ্য থ্রি পিগ্‌স্।' ডোনাল ডাক্-এর জন্ম 1934-এ। ধীরে ধীরে নয়, ধাপে ধাপেও নয়, গুণোত্তর-শ্রেণীর অঙ্কের রাশির মতো উল্কার বেগে খ্যাতির গৌরীশৃঙ্গে উন্নীত হয়ে গেলেন ওয়াল্ট ডিজ্‌নে।

বিস্তারিত লিখতে হলে আর একখানা বই লিখতে হবে। একটি তথ্যই যথেষ্ট : ওয়াল্ট ডিজ্‌নে—সেই যিনি চল্লিশ ডলারের পুঁজি নিয়ে হলিউডে এসে গ্যারেজ ভাড়া করে-ছিলেন, তিনি এমন একটি বিশ্বরেকর্ড করে রেখেছেন যা কেউ কোনদিন ভাঙতে পারবেন কিনা সন্দেহ। এক জীবনে তিনি সতের বার অস্কার পেয়েছেন। হ্যাঁ, সতের বার!

ওঁর জীবনের মাত্র দুটি ঘটনার তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ দিয়ে বক্তব্য শেষ করি, তাহলেই এই অমর-শিল্পীর সম্যক পরিচয় পাবে তোমরা —

ওয়াল্ট-এর একটি শিল্পীজনোচিত 'গোঁয়াতুর্মি' ছিল। তাঁর অসমাপ্ত কাজ বাইরের কাউকে দেখাতে চাইতেন না। শিল্পটি নিখুঁতভাবে সমাপ্ত হবার আগে ওঁর নিজস্ব ইউ-নিটের বাইরে কাউকে কিছু দেখতে দিতেন না। ওঁর জীবনী ঘেঁটে দেখেছি, দুটিমাত্র ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। দুটি ঘটনাই মর্মস্পর্শী। একটি কৌতুকের, একটি বেদনার। একে একে বলি—

1937 সালের একটি দিন। ডিজ্‌নের ছবি 'অ্যালিস্ ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড,' তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ওর সেজদা রয়—যে তখন ব্যবসার দিকটা দেখে—সে এসে বলল, একটা মুশকিল হয়েছে, ছবিটা শেষ করতে আরও অন্তত আড়াই লক্ষ ডলার লাগবে।

ওয়াল্ট বলে, টাকাটা কেউ ধার দিতে রাজী হবে না?

—দিতে পারে, তুই যদি গোঁয়াতুর্মি না করিস্।

—মানে? আমি কি তোর মত গোঁয়াড় নাকি?

—আমি 'ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকার' ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট জো রোজেনবার্গ-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি। তিনি ধার দিতে সম্মত, কিন্তু তাঁকে অসমাপ্ত ছবি, মানে যতটা তোলা হয়েছে, তা দেখাতে হবে।

ওয়াল্ট বললে, অসম্ভব! আমি রাজী নই!

সেজদা বলে, আমি জানতুম! তুই কেন গোঁয়াড় হবি?

কাটল আরও কয়েকমাস। এরপর আবার একদিন রয় এসে হাজির। বললে, তুই যখন রাজি হচ্ছিস না, তখন দেউলিয়া হবার জন্য দরখাস্ত করে দিই? কি বলিস?

ওয়াল্ট বলে, বুঝেছি! ন্যাকামো করতে হবে না। চল, ঐ রোজেনবার্গ সাহেবকে আধ-খ্যাঁচড়া ছবিটাই দেখিয়ে আনা যাক। আমি তো তোর মত গোঁয়াড় নই।

রয়ের ব্যবস্থাপনায় ওরাল্ট এসে হাজির হল নিউইয়র্কে। তার অসমাপ্ত ছবির 'রাশ্-প্রিণ্ট' নিয়ে, মানে আধা-খ্যাঁচড়া ছবির ফিল্‌ম্ নিয়ে। ঠিক যেমন একদিন সত্যজিৎ রায় দেখিয়ে ছিলেন 'পথের পাঁচালীর' অসমাপ্ত কাজ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়কে।

অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে মাত্র দুজন দর্শক। জো রোজেনবার্গ আর রয় ডিজ্‌নে। শুরু হল ছবি। মাঝে মাঝে ছবি থামিয়ে ওয়াল্টকে বক্তৃতা দিতে হচ্ছিল, অভিনয় করে দেখা-তেও হচ্ছিল, "এর পরের সিকোয়েন্সটা তোলা হয়নি।

গল্পটা যাতে বুঝতে পারেন তাই বলে রাখি, এরপর সাত বামনেরা এমনি করে নাচতে নাচতে ফিরে আসবে।"

রোজেনবার্গ নির্লিপ্ত। আর ওয়াল্ট সাতবামনের অঙ্গ-ভঙ্গি নকল করে দেখাতে থাকে। সারা ছবিতে রোজেনবার্গ একবারও হাসেননি, একটি মাত্রও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি। পরবর্তীকালের অস্কার-বিজয়ী গান দুটি 'Whis le While You Work' (কাজ কর গান গেয়ে) অথবা 'Some Day My Prince Will Come' (আমার রাজপুত্তুর একদিন আসবে, নিশ্চয়ই আসবে) শুনতে শুনতে উনি হাই তুললেন।

ছবিটা যখন শেষ হল, ওয়াল্ট তখন হতাশায় ভেঙে পড়েছে। আলো জলে উঠতে রোজেনবার্গ উঠে দাঁড়ান। আড়ামোড়া ভেঙে বলেন, ঠাণ্ডাটা বেশ জবর পড়েছে, নয়?

ওয়াল্ট দাঁতে দাঁত দিয়ে রইল। বলল না, আজ্ঞে হ্যাঁ রামগরুড়-তনয় মহাশয়। আমার শিরদাঁড়া পর্যন্ত জমে বরফ!

তবে ব্যাঙ্ক অব আমেরিকার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট বলে কথা! দুই-ভাই নিচে নেমে এল ওঁকে গাড়িতে উঠিয়ে দিতে। রোজেনবার্গ গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেবার আগে বললেন, চলি তাহলে? ও ভাল কথা, কাল ব্যাঙ্কে একবার দেখা করবেন। 'লোন'-এর কাগজপত্র তৈরী থাকবে।

দুই-ভাই স্তম্ভিত। রয় আমতা-আমতা করে বলে, মানে? ঋণটা মঞ্জুর হবে তাহলে?

—হবে না? এ ছবি দারুণ হিট্ করবে! এর পর আর তোমাকে কোনদিন অর্থকৃচ্ছ্রতায় ভুগতে হবে না, ওয়াল্ট! তুমি দেখে নিও!

রোজেনবার্গের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছিল।

ঐ ছবিতে ওদের লাভ হয়েছিল পৌনে তিন কোটি ডলার, ওয়াল্ট ডিজ্‌নে পেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের সম্মান: 'ফুল-অস্কার'; এছাড়া সাত-সাতটি বিভাগীয় অস্কার।

রোজেনবার্গ নাকি পরে বলেছিলেন, 'সেদিন আমার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার অবকাশ ছিল না, কারণ আমি সেদিন ছবিটার অর্থনৈতিক দিকটাই বিচার করছিলাম। প্রিমিয়ার শো-তে প্রাণখুলে হাসবার অবকাশ প্রথম পেলাম।'

দ্বিতীয় ঘটনাটি 1955 সালের।

ওয়াল্ট ডিজ্‌নে তখন বিশ্ববিখ্যাত। বহু বহু ছবি তৈরী করে কোটিপতি। সে সময় মেতেছেন 'ডিজ্‌নেল্যাণ্ড' নিয়ে। কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ডিজ্‌নেল্যাণ্ড-এর উদ্বোধন হয় ঐ বছর সতেরই জুলাই। ইতিমধ্যে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি—দুজন মার্কিন সেনেটার, একজন অ্যাম্বাসাডার, একজন বিদেশী রাজা, ডিজ্‌নেকে ব্যক্তিগত পত্র লিখে অসমাপ্ত 'ডিজ্‌নেল্যাণ্ড' দেখবার সুযোগ পাননি। প্রতিবারই ওয়াল্ট ডিজ্‌নে সবিনয়ে তাঁদের জানিয়েছিলেন, 'অসমাপ্ত শিল্পকর্ম প্রদর্শন নীতি-বিরুদ্ধ। উদ্বোধনের পরে আপনি যখন আসবেন আমাকে জানাবেন, আমি নিজে উপস্থিত থেকে আপনাকে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাব।'

যে ঘটনার কথা এখন লিখতে যাচ্ছি তা ঐ পঞ্চান্ন সালের এপ্রিল মাসের। ওয়াল্ট ডিজ্‌নে সেদিন তাঁর বিভাগীয় কর্মীদের একটা জরুরী মিটিঙে ডেকে পাঠালেন। সবাই সমবেত হলে তিনি বললেন, "কমরেড্‌স্, তোমরা জান, আর মাস-তিনেকের ভিতরেই ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের উদ্বোধন হবে, এবং এ কথাও জান যে, কয়েকজন বিখ্যাত প্রভাবশালী ব্যক্তিকে আমি অসমাপ্ত 'ডিজ্‌নেল্যাণ্ড' দেখতে দিইনি! বস্তুত কোন শিল্পীই চায় না তার অসমাপ্ত শিল্প-কর্ম বাইরের দর্শককে দেখাতে। আমিও তা চাই না। জীবনে একবারই আমি সে নীতি লঙ্ঘন করেছি—'অ্যালিস্ ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড'-এর ক্ষেত্রে। আমি তোমাদের ডেকেছি এ কথা জানাতে যে, আমি দ্বিতীয়বার ঐ নীতি লঙ্ঘন করব বলে মনস্থ করেছি। আগামী শনিবার একজন বিশেষ অতিথি আসবেন। এই কয়দিনে যদ্দুর সম্ভব সব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখ। সব যেন টিপ্‌টপ্ থাকে! আমার ঐ ভি. আই. পি. গেস্ট যেন খুশি হন!"

সবাই অবাক। কিন্তু কারও হিম্মৎ হল না প্রশ্ন করে জেনে নিতে কে ঐ মহারাজকীয়-সম্মানযোগ্য মহান V.V.I.P!

সকলে নির্দেশ নিয়ে মিটিং-হল ত্যাগ করে চলে যাবার পর ওঁর আকৈশোরের সহচর উব্ বললে, ভূতের মুখে আজ হঠাৎ এই রামনাম? কি ব্যাপার?

ডিজ্‌নে একখানা খাম উব্-এর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, আজ সকালের ডাকে 'টেনেসি' থেকে এই চিঠিখানি পেয়েছি। ভদ্রমহিলাকে আমি লং-ডিস্টেন্স টেলিফোনে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ওঁরা শনিবার সকালের প্লেনে আসবেন। আমি নিজেই যাব রিসিভ করতে।

উব্ আর লিলি খাম থেকে চিঠি বার করে পড়ল। খামের ভিতর ছিল দুটি পত্র। প্রথমটির লেখক বব্। তার

বয়স এগারো। লিখেছে, "আঙ্কল ডিজ্‌নে, আমি একজন মিকি-ফ্যান। তোমার সব কয়খানি ছবিই আমি দেখেছি। হয় সিনেমাস্ক্রীনে অথবা টি. ভি. তে। এখন আমার অসুখ, তাই স্কুলে যাই না। শুনেছি, জুলাই মাসে 'ডিজ্‌নেল্যাণ্ড'-এর উদ্বোধন হবে। আমি সেদিন উপস্থিত থাকতে চাই। এখানে বসে উদ্বোধন-দিবসের টিকিট কিভাবে কাটতে হবে তা আমাকে জানিও। মা কথা দিয়েছে, আমাকে নিয়ে যাবে! ইতি তোমার ছোট্ট বন্ধু বব্‌।"

ঐ সঙ্গে পিন্ দিয়ে গাঁথা আছে ববের মায়ের একটি ছোট্ট সংযোজন, "ডিয়ার মিস্টার ডিজ্‌নে, ববের ইচ্ছানুসারে এই পত্রটি পাঠালাম। ববের বাবা নেই, ও আমার একমাত্র সন্তান। তুমি ব্যস্ত হয়ো না। ববের নামে একটি আমন্ত্রণ-লিপি শুধু পাঠিয়ে দিও। কথা দিচ্ছি, তাকে নিয়ে আমি যাব না। কারণ তিন মাস পরে তার পক্ষে নড়াচড়া করা আর সম্ভবপর হবে না—ডাক্তারবাবুরা তাই বলেছেন। এখনো ও সে কথা জানে না। কারণ এখনো সে সুস্থ। হয়তো উদ্বোধনের আগেই…ও তোমাকে এখনো বলা হয়নি! বব্‌ লিউকেমিয়ায় ভুগ্‌ছে! ব্লাড-ক্যান্সার! আর তিন-চার মাস তার মেয়াদ! ইতি হতভাগিনী ববের মা।"

ওয়াল্ট, লিলি আর ওঁদের বাইশ বছরের মেয়ে ডায়না গিয়েছিল লস্‌ অ্যাঞ্জেলেস্‌ এয়ারপোর্টে—বব্‌ আর তার মাকে রিসিভ করে আনতে। গাড়িটা ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের প্রধান ফটকের সামনে এসে পৌঁছাতেই শুরু হয়ে গেল ব্যাণ্ড-পার্টির ভ্যাঁপোর-ভ্যাঁপো! বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের গ্র্যাণ্ড ব্যাণ্ড-মাস্টার কর্ণেল ভিসি ওয়াকার স্বয়ং ব্যাণ্ড-পার্টি পরিচালনা করছেন। বব্‌ আর তার মা তো তাজ্জব!

এমন সংবর্ধনার কথা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি।

মেইন-স্ট্রীট থেকে সেণ্ট্রাল প্লাজা রাস্তাটায় তখনো ট্রাম লাইন বসেনি, রেলরোড তৈরী হয়েছে আধাআধি। অধিকাংশ প্রদর্শনীই অবশ্য শেষ হয়ে গেছে। মেইন-স্ট্রীট স্টেশানে রেলগাড়িটা অপেক্ষা করছিল। ওয়াল্ট মটোর গাড়ি থেকে নামলেন। আর সকলে উঠ্‌ল সংলগ্ন বগিতে, শুধু ওয়াল্ট ডিজ্‌নে আর বব্‌ বসল এঞ্জিন ঘরে। ওয়াল্ট বললে, আমি সব তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, ট্রেনটা কিন্তু আজ তোমাকেই চালাতে হবে, বব্‌!

ডিজ্‌নের স্মৃতিকথায় কোলিয়ার এরপর লিখছেন (The Magical Kingdom of Walt Disney, by R. Collier, Reader's Digest, Oct'71.)

"For two full hours they rode the train, backing and switching along the completed portion of the track. At one point a member of Disney's staff saw the train halt far off on the skyline. Walt's left arm was tight around the child's shoulder, his right was gesturing into the distance. Across the underdeveloped acres, Disney's ideas were dancing like will-o'-the-wisps, as he talked of things unrealised on any drawing board—Rainbow Caverns, Tom Sawyers Island, the Haunted Mansion. Walt had chosen to share these dreams with a child who could never see them come true… That is how his friends remember him, the dreamer, the spinner of enchantment, in whose heart and mind there always lived the magical world of childhood!

"পুরো দু'টি ঘণ্টা ধরে ওঁরা ট্রেনটাকে চালালেন। কখনো এগোয়, কখনো পিছিয়ে আসে—রেলপথের যতটা তৈরী হয়েছে তা যেন চষে ফেলা হল। এক সময় বহুদূরে গিয়ে—সেই যেখানে আকাশ এসে মিতালী করেছে দিগন্তরেখার সঙ্গে—ট্রেনটা দাঁড়ালো। ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের একজন কর্মীর মনে আছে, সে দেখেছিল—ওয়াল্ট বাঁ-হাতে ঐ বাচ্চা ছেলেটাকে টেনে নিয়েছেন বুকে, আর ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছেন দিগন্তের দিকে। কোথায় কী তৈরী হওয়া বাকি আছে তা বব্‌কে উনি বুঝিয়ে বল্‌ছিলেন। অর্ধসমাপ্ত বিজন প্রান্তরে ওয়াল্টের স্বপ্নগুলি যেন পাখ্‌না মেলে আলেয়ার মতো নাচ-ছিল। যেসব পরিকল্পনা তখনো ড্রইং-বোর্ড-এর মুখ দেখেনি তারাও মূর্ত হয়ে উঠছিল কথাকোবিদের গল্পবলার ঢঙে—রামধনু গুহা, টমসয়ার দ্বীপ, ভূতালয়….ওয়াল্ট সেদিন সেই অজাত স্বপ্নগুলি ঐ ছেলেটির সঙ্গে ভাগাভাগি করে উপভোগ করছিলেন—ঐ যে ছেলেটা কোনদিনই দেখতে পাবে না এসব স্বপ্নকে বাস্তবায়িত হতে!….আমাদের স্মৃতিতে এভাবেই ওয়াল্ট আজও বেঁচে আছেন—আমরা চোখ বুজলে আজও তাঁকে দেখতে পাই: স্বপ্নবিলাসী, খেয়ালখুশির ঐন্দ্র-

জালিক, যাঁর অন্তরে নিতান্ত শৈশবকালের তালপাতার ভেঁপুটা কোনদিন তার বাজনা থামায়নি।”

ওয়াল্ট যখন বব্‌কে গোটা ডিজ্‌নেল্যাণ্ড ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন, তখন দূর থেকে ভেসে আসছিল গ্র্যাণ্ড ব্যাণ্ড-মাস্টার বৃদ্ধ কর্নেল ওয়াকারের সেই 'তালপাতার ভেঁপু'-র তান, যা অমর হয়ে আছে পিনোক্কিও ছায়াছবিতে :

> "When you wish upon a star,
> Makes no difference who you are,
> Anything your heart desires
> Will come to you"...

আগেই বলেছি, 'ইট্‌স্‌-এ স্মল ওয়ার্ল্ড',-এর উদ্বোধন হয়েছিল উনিশ শ' ছেষট্টি সালে। সে উদ্বোধনীর যে বর্ণনা ইতিপূর্বে দিয়েছি তা আদ্যন্ত বাস্তব—তাতে আমি কল্পনার রঙ মেশাইনি। তার কয়েক মাস পরেই উনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। নভেম্বরের সাত তারিখে তাঁর দেহে অপরেশন করা হল। একটু সামলে উঠেই উনি ছুটে গেলেন কাজ করতে। পারলেন না। ত্রিশে নভেম্বর আবার তাঁকে ভর্তি করা হল হাসপাতালে। মাত্র পনের দিন পরে, পনেরই ডিসেম্বর সকাল সওয়া নয়টায় তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ল।

সেদিন সকালেও কয়েক হাজার যাত্রী এসেছে 'ডিজ্‌নেল্যাণ্ড' দেখতে। সদ্যবিধবা মিসেস্ লিলিয়ান ডিজ্‌নে নির্দেশ পাঠালেন : ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের দরজা যেন খোলা থাকে! চেষ্টা করলেন, দুঃসংবাদটা যেন দর্শনার্থীরা না জানতে পারে!

প্রতিটি কর্মী কান্না চেপে যে যার কাজ করে গেল। একমাত্র ব্যতিক্রম অতি বৃদ্ধ গ্র্যাণ্ড ব্যাণ্ড-মাস্টার কর্নেল ওয়াকার। তিয়াত্তর বছর বয়স তখন তাঁর। বহু দিন অবসর নিয়েছেন। পেনশন ভোগী। কিন্তু সেদিন তাঁকে রোখা গেল না। তাঁর বহুদিনের অব্যবহৃত জোব্বা চড়িয়ে নিজেই এলেন স্বয়ং 'ইলেকট্রনিক প্যারেড' পরিচালনা করতে।

শোভাযাত্রায় যারা অংশ নিয়েছে তাদের তাল কাটছে না, কিন্তু সকলের গাল বেয়ে নেমেছে অশ্রুর ধারা। আর সবার আগে জরির জোব্বা পরে চলেছেন অতিবৃদ্ধ কর্নেল ওয়াকার। ডিজ্‌নেল্যাণ্ডের গ্র্যাণ্ড ব্যাণ্ড-মাস্টার। তাঁর 'তালপাতার ভেঁপু'তে চিরকালের মতো সেদিনও বাজছে 'পিনোক্কিও' ছায়াছবির সেই থামতে-না-জানা গানখানাই :

> তারার পানে চাইবি যখন, চাইবি রে তোর প্রাণ খুলে,
> 'তুই কে?'—সেটা তুচ্ছ তখন, যাস্‌নে যেন গান ভুলে।
> তারার কাছে হাত পেতেছে যে, সে
> পৌঁছে গেছে 'সব-পেয়েছি'-র দেশে॥

—o—





